উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত।

কলিকাতা,
৮১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, "পশুপতি প্রেসে"
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৪

মূল্য ১।॰ পাঁচসিকা।

অতুলগৌরবান্বিত, বিষমসমরবিজয়ী

শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ

রাধাকিশোর দেবমাণিক্য বাহাদূর

ত্রিপুরেশ্বর সমীপেষু

এ বনফুলের মালা কাহার গলায় পরাইব? কে এই অকিঞ্চিৎকর কুসুমাঞ্জলি সাদরে গ্রহণ করিবে? মহারাজ; আপনি ত্রিপুরেশ,—এ ফুল ত্রিপুরার। সুরভিসৌন্দর্য্যবিহীন হইলেও এ বন্য কুসুমচয় আপনার গ্রহণীয় বটে। আমি ভক্তি-চন্দনচর্চ্চিত করিয়া আপনারই উদ্দেশে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উৎসর্গিত করিলাম।

গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

নানা কারণে এত তাড়াতাড়ির ভিতর গ্রন্থখানি লিখিত ও প্রকাশিত হইল যে, অনেক সময়ে লিখিত কাপিগুলি দ্বিতীয়বার পাঠ করিয়া দেখিবারও অবসর পাই নাই। এজন্য কোথাও কোথাও ভ্রম-প্রমাদ থাকা নিতান্ত অসম্ভব নহে। পুস্তকের শেষভাগে দিল্লী-দর্শন অধ্যায়টী, সময়ের অল্পতাপ্রযুক্ত এবং স্থানের অকুলানবশতঃ অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যদি জনসাধারণের নিকট ভবিষ্যতে উৎসাহ পাই, এবং কোন কালে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বহির্গত হয়, তবে ভরসা আছে, সংশোধিতাকারে এবং পরিবর্দ্ধিতরূপে পুনঃ পাঠকসমাজে উপনীত হইব।

নূতন বিজ্ঞাপন।

"উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ" প্রকাশিত করিয়া সাধারণের নিকট হইতে আশাতীত উৎসাহ পাইয়াছি। কেহ কেহ ২।১টী ভ্রম-প্রমাদও প্রদর্শন করিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। সাধারণের সুবিধার জন্য, সেই সকল ভুল-প্রমাদগুলি একটু একটু সংশোধিত করিয়া এইবার গ্রন্থের কলেবর আর একটু বর্দ্ধিত করিলাম।

এইবার পুস্তকের শেষভাগে একটা "পরিশিষ্ট" সংযোজিত হইল। কলিকাতা হইতে বর্ণিত স্থানগুলির ভাড়া কত, সেই সেই স্থানের জল-বায়ুর অবস্থা কেমন, এবং পথিকগণের কোথায় কিরূপ থাকিবার সুবিধা আছে,—এই সমস্ত বিষয় এই পরিশিষ্ট ভাগে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেও পুস্তকের কোন কোন ভাগ পরিবর্ত্তিত করা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছি। আশা করি এইবার গ্রন্থখানি সাধারণের আরও উপকারে আসিবে।

কলিকাতা
১লা পৌষ, ১৩১৬। } গ্রন্থকার।

পরিশিষ্ট।

যাত্রিকদিগের সুবিধা অসুবিধার কথা ও কলিকাতা হইতে প্রত্যেক স্থানের ভাড়ার বিবরণ।

বারাণসী—ভাড়া তৃতীয় শ্রেণী ৪।৶৹, মধ্যম শ্রেণী ৭॥৹। যাত্রিক দিগকে আশ্রয় দিবার জন্য অনেক বাঙ্গালী এখানে ছত্র ও হাওলী খুলিয়াছেন (২১। পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এখানে গঙ্গার জল অতি উপকারী। লোকের বিশ্বাস এই জলে কলেরার কীটানু জীবিত থাকিতে পারেনা। স্বাস্থ্য মোটের উপর ভাল। তবে যাত্রিকের ভীড় বেশী হইলে কখনও কখনও মারীভয় উপস্থিত হয়। ঘৃত, দুগ্ধ, তরকারী প্রভৃতি খুব সস্তা। অল্প খরচে বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করা যায়। ৫।৬ টাকার বেশী খোরাকী লাগে না। বাড়ী ভাড়াও খুব সস্তা। মাসিক একটাকা ভাড়ায় কলিকাতার চারিটাকা ভাড়ার অনুরূপ একটী কুঠরি পাওয়া যায়।

মৃজাপুর—ভাড়া তৃ—৪॥৶৹, মধ্যম শ্রেণী ৭৸৶৹। স্বাস্থ্য ভাল। বাসাভাড়া সস্তা। নদীর তীরে বাড়ীগুলি বড় সুন্দর। শান্ত ভাগিরথীর উপরে সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলি অতুলনীয়। ধর্ম্মশালায় তিন দিন বিনা ভাড়ায় থাকা যায়।

চুণার—থাকিবার স্থানের সুবিধা নাই। মৃজাপুর কিম্বা বারাণসী হইতে আসিয়া দুর্গ দর্শন করিয়া সেই দিনই প্রত্যাবর্ত্তন করা যায়। ভাড়া তৃ—৪।৶১০ মধ্যম ৭।৵৫,

বিন্ধ্যাচল—ভাড়া তৃ—৪॥৵১০, মধ্যম ৮৲৫। এখানে পাণ্ডাদের নিকট আশ্রয় স্থান পাওয়া যায়। ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেই অসংখ্য পাণ্ডা আসিয়া টানা টানি করে। অষ্টভুজার বাটীর নিকটে পাহাড়ের উপর ধর্ম্মশালা আছে।

এলাহাবাদ বা প্রয়াগ—ভাড়া তৃ—৫৶০, মধ্যম ৮৸৴১৫। ষ্টেসনের নিকটে ধর্ম্মশালার বন্দোবস্ত বড় ভাল; ত্রিবেণীতে পাণ্ডার আলয়ে আশ্রয় লইলে অনেক অর্থদণ্ড দিতে হয়। ষ্টেসনের নিকটে ধর্ম্মশালায় বাসা লইয়া ত্রিবেণী দর্শন সুবিধা জনক। স্থানটী ভাল, স্থানটী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন।

ইটাওয়া—ভাড়া তৃ—৬॥৵১৫, মধ্যম ১২৲১০। স্থানটীর জল বায়ু বড় ভাল। অনেকে এখানে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে আসেন। দুগ্ধ, ঘৃত ও ভাল ভাল সন্দেস প্রভৃতি অতি সস্তা। বাড়ী ভাড়া ও খোরাকীও অতি সুলভ। সরাইয়ে যাত্রিকেরা থাকিতে পারেন, কিন্তু তাহা অতি কদর্য্য। বর্ত্তমানে একটী অতি উত্তম হিন্দু আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। তাহার বন্দোবস্ত ইংরেজদিগের আশ্রমের ন্যায় উৎকৃষ্ট। অথচ হিন্দু style. ইহাতে যাত্রিকেরা অতি আরামে বাস করিতে পারিবেন।

আগ্রা—ভাড়া তৃ—৭৶১৫, মধ্যম ১৩৵১০। থাকিবার জন্য ভাল ভাল সরাই আছে। ষ্টেসনে উপস্থিত হইলেই সরাই ওয়ালারা ধরিয়া লইয়া যায়। স্বাস্থ্য ও আহার্য্য সামগ্রী ভাল।

ফতেপুর-সিক্‌রি—(১০৩,১০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এখানে থাকিবার সুবিধা নাই। স্থানীয় লোকগুলি অশিক্ষিত ও দরিদ্র। স্থানটী দর্শন করিয়া সেই দিনই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। সম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাম্বু প্রভৃতি রাত্রি যাপনের সরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া যাইতে পারেন।

বৃন্দাবন, মথুরা, মহাবন, গোকুল, দাউজী—মথুরা পর্য্যন্ত ভাড়া তৃ—৭॥৵০, মধ্যম ১৩৸৵০। মথুরা হইতে বৃন্দাবন ৵০। মথুরা কি বৃন্দাবন ইহার যে কোন স্থানে পাণ্ডার আলয়ে ইচ্ছানুরূপ বাসা ভাড়া পাওয়া যাইয়া থাকে। পাণ্ডারা উৎপীড়ণ করে না। অতি ভদ্রতার সহিত যাত্রিকদিগকে নানারূপ সাহায্য করে। মহাবন গোকুল, দাউজী, রাধা কুণ্ড, শ্যাম কুণ্ড, গোবর্দ্ধন এই সকল স্থানে একাযোগে মথুরা হইতে যাইতে হয়। এইসকল প্রত্যেক স্থানেই পাণ্ডা আছে, এবং যাত্রিকেরা তাহাদের আশ্রয়ে থাকিতে পারে। কিন্তু এই সকল স্থানে একাযোগে যাইবার পথ নিরাপদ নহে। একা একা গমন করিলে মাঝে মাঝে ঠকের হাতে পড়িতে হয়। দুই কিম্বা ততোধিক লোক একত্রে গেলে কোনও আশঙ্কা নাই। ব্রজধামের সর্ব্বত্র মৎস্য, মাংস আহার নিষেধ। বৃন্দাবনে অল্পখরচে গোবিন্দ জীউর অন্ন-প্রসাদ পাওয়া যায়। মথুরায় আহার্য্য বেশ সস্তা।

রাজপুতনা—ইহার প্রায় সর্ব্বত্রই যাত্রিক দিগকে স্থানীয় বাঙ্গালীর আশ্রয়ে থাকিতে হয়। হোটেল, সরাই কিম্বা ধর্ম্মশালায় ভাল বন্দোবস্ত নাই। আজমীরে খুব ভাল সরাই আছে সেখানে যাত্রিকেরা বাসা গ্রহণ করিয়া পুষ্কর দর্শন করিতে পারেন। জয়পুরে ষ্টেসনের নিকটে চারি আনা, আট আনা, দৈনিক ভাড়ায় ঘর পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার বন্দোবস্ত ভাল নহে। কোনও রূপে থাকা যায় মাত্র। জয়পুরে অনেক বাঙ্গালী আছেন। তাঁহারা সাদরে পর্য্যটক দিগকে আশ্রয় দেন। রাজপুতনার স্বাস্থ্য খুব ভাল। প্রায় সর্ব্বত্রই আহার্য্য সামগ্রী সস্তা। দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস, মাংস, প্রভৃতি সুলভে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে মৎস্য, কেহ খায় না। মাংসের সের /১০ কি ৵০। আজমীরের স্বা[illegible] খুব ভাল, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যও অতুলনীয়। অল্প [illegible] বেশ স্বচ্ছন্দে থাকা যায়। ভাড়া ঢোলপুর তৃ—৭৷৵০, মধ্যম ১৩৷৵০ ; গোয়ালিয়র, তৃ—৮৷৵০, মধ্যম ১৫৲ ; জয়পুর তৃ—৮৸/০, মধ্যম ১৫৷/০ ; আজমীর তৃ—৯৷৶০, মধ্যম ১৬৸/০।

দিল্লী—এখানে খুব ভাল ভাল সরাই আছে। ষ্টেসনে নামিলেই সরাই ওয়ালারা যাত্রিক দিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যায়। এইসব সরাইয়ে থাকিবার খুব ভাল বন্দোবস্ত থাকিলেও যাত্রিক দিগের নৈতিক অবনতির বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সুতরাং পরিচিত বাঙ্গালী থাকিলে তাহাদের আশ্রয়ে থাকাই উচিত। দিল্লী

এখনও বিলাসের চরম নিকেতন। যে যেরূপ ভাবে ইচ্ছা থাকিতে পারে। ৮৲।১০৲ টাকা মাসিক ব্যয়েও থাকা যায়, আবার শতাধিক টাকাও মাসিক ব্যয়িত হইতে পারে। ভাড়া তৃ—৮/১০, মধ্যম ১৪৸৵৫।

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ

সম্বন্ধে মতামত।

Bengalee—14th May, 08.

There is a well-written narrative of the author Babu Surendra Nath Roy's travel in Northern India. The narrative is very interesting from beginning to end and repays perusal. It is written in plain Bengali and not being borrowed from other authors, is full of life. Such books on travel are rather rare in the Bengali language and we congratulate the author on his performance which is a valuable addition to the Bengali literature. The get up of the book is excellent.

The Indian Mirror—Feb 16, 08.

Those who intend to travel naturally want to know something about the places they are going to visit. The book be fore us supplies the intending visitors with information of various kinds about some of the principal places of the North-Western

Provinces. The description is so graphic that the reader almost feels as if he himself is enjoying the scenes. The style, in which the book is written, is exactly suited to the subject dealt with and is very pleasant reading from a literary point of view. The author is to be congratulated on the critical way in which he has acquitted himself.

Indian World—January 1909.

Uattar Paschim Bhraman (Travels in the North-West) is another Bengali book of conciderable merit. The style of the author is catching and the language elegant and homely. We have gone through the work with sustained interest and congratulate the author on his powers of descriptions and sense of proportion and discrimination. It is indeed an wel-come addition to the very limitable range of books of travels hither-to published in the Bengali language.

"মডার্ণ রিভিউ," "সাহিত্য" প্রভৃতি নানাবিধ সাময়িক পত্রের লেখক, নানাবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা ও সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সভ্য গৌহাটী কটন কলেজের ইতিহাস ও সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন,

বিজ্ঞবরেষু—

আপনার লিখিত "উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ" পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম। এতন্নিমিত্ত আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, এবং আশা করি আপনার গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র সাদরে পঠিত হইবে। আপনি যে সর্ব্বজন-সুপরিচিত নাটক, নভেল ও কবিতার পথে না চলিয়া অপেক্ষাকৃত অক্ষুণ্ণ ভ্রমণ বৃত্তান্তের বর্ত্মে সঞ্চরণ করিয়াছেন, ইহা বড় গৌরবের কথা। "দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন," কবিবর নবীন চন্দ্রের ভ্রমণ-কাহিনী প্রভৃতি অল্পসংখ্যক মাত্র ঈদৃশ পুস্তক বঙ্গ-সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি, আপনি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তদ্বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া এতাদৃশ গ্রন্থের সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিবেন।

জাহ্নবী—ভাদ্র ১৩১৬।

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায় প্রণীত, মূল্য ১।•। গ্রন্থকার কাশী, মৃজাপুর, চুণার, বিন্ধ্যাচল, প্রয়াগ, এটোয়া, আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রী, বৃন্দাবন, মথুরা, দিল্লী প্রভৃতি উত্তরপশ্চিমাঞ্চল এবং রাজপুতনার ঢোলপুর, জয়পুর, গোয়ালিয়র, অম্বর আজমীর, পুষ্কর ও চিতোর পর্যটন করিয়া এই পুস্তক খানিতে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের বর্ণনা কৌশলে পুস্তকখানি কৌতূহলপ্রদ ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। * * গ্রন্থকারের ভাষায় লালিত্য ও সরলতা আছে। পুস্তকখানি

হইতে দর্শনীয় স্থান সমূহের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। * *

পুস্তকের প্রারম্ভে সুলিখিত অবতরণিকাটি সকলেরই প্রণিধান-যোগ্য। দেশভ্রমণ ব্যতীত শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন পরিপুষ্টি লাভ যে অসম্ভব, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশভ্রমণকালে আমরা বিভিন্ন জাতির সামাজিক আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, শিক্ষাদীক্ষা ও সাম্প্রাদায়িক মত সকল জানিতে পারি। ঐতিহাসিক স্থান সমূহ অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আমাদিগকে কত না শিক্ষা দেয়। এই পুস্তকখানি পাঠে ভ্রমণেচ্ছা বর্দ্ধিত করে ও ভ্রমণেচ্ছু পাঠকের ইহা সহচর ও পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। পুস্তক খানির বহিঃসৌষ্ঠব মনোরম হইয়াছে।

ঢোলপুরের মহারাণার মেডিকেল এডভাইসার সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় মহাশয় লিখিতেছেন,

নাইনিতাল
১০।৬।০৮।

"উত্তর-পশ্চিম-ভ্রমণ" পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। বঙ্গ-ভাষায় ভ্রমণ-বৃত্তান্তের অভাব না থাকিলেও প্রাঞ্জল ও শ্রুতি-মধুর ভাষায় এইরূপ পুস্তক এই নূতন। পুস্তকের প্রতি ছত্রে লেখকের স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-প্রীতি প্রতিফলিত হইয়াছে। ইতিহাসানুরাগী নবীন লেখক সময়ে একজন কৃতী লেখক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায়।

বঙ্গ-বিজয় সম্বন্ধে অভিমত।

রাজসাহী সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয় গ্রন্থকারকে লিখিয়াছেন,—

সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা,

৫।১০।৯।

মহাশয়,

আপনার লিখিত "উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ" ও "বঙ্গবিজয়" পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। আনার লিপি-কৌশল অতিশয় প্রশংসনীয়। আপনার লিখিত গ্রন্থ দুইখানি পাঠ আরম্ভ করিলে, তাহা শেষ না করা পর্য্যন্ত আকাঙ্খা নিবৃত্ত হয় না। ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আপনার দ্বারা বঙ্গভাষার বিশেষ উন্নতির আশা করা যায়। আপনি নব্য লেখক হইলেও আপনার লিখাতে অনেক স্থানে বিশেষ ভূয়োদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতি—

স্থানাভাবে সকল মতামতাদি প্রকাশিত করা গেল না।

অবতরণিকা।

বাঙ্গালাসাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী অতি বিরল। কেবল ভ্রমণকাহিনী কেন—ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভৌগলিকতত্ত্ব কিছুরই তেমন প্রাচুর্য্য নাই। এমন কি, যদিও সংস্কৃত ভাষায় দর্শন, গণিত ও রসায়নশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তথাপি ঐ সকল বিষয়ে কোনই উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গ্রন্থ নাই। ইহার আপাততঃ দুইটী কারণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ, আমরা আজকাল সাহিত্যের দোহাই দিয়া কেবল নাটক, নভেল ও কবিতা লইয়াই ব্যস্ত থাকি। সাহিত্যের উন্নতি-কামনায় এরূপ পথ অবলম্বন করায় বাধা নাই। গ্রন্থকার স্বয়ং এ পথে বিচরণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। আমার বক্তব্য এই যে, কেবলমাত্র সাহিত্যের আলোচনাই জাতীয়-উন্নতি-সাধনের সোপান হইতে পারে না। যিনি যে বিষয়ে কৃতবিদ্য, তিনি সেই বিষয়েরই তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। সাহিত্যজগৎ অপরিচিত হইলেও নিশ্চিন্তমনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকার তাহার অধিকার নাই। এই কর্ত্তব্যজ্ঞানের অসদ্ভাব হেতু, যাহা সত্য, যাহা দ্বারা জ্ঞানলাভ হইতে পারে, তাহার দিকে আমাদের লক্ষ্য নাই। এজন্যই বিশেষ আলোচনা দ্বারা স্বীয় মস্তিষ্ক উর্ব্বরিত করিয়া, নূতন সত্যাবিষ্কার দূরে থাকুক, ভাষান্তর হইতে পূর্ব্বাবিষ্কৃত তথ্য উদ্ধার করিয়া, বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতেও কেহ চেষ্টিত হন না।

দ্বিতীয়তঃ, দর্শন, গণিত ও রসায়নাদি সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থরাশির যদিও জগতে তুলনা নাই, তথাপি সংস্কৃত মৃত-ভাষা (Dead-language) বলিয়া এবং বঙ্গভাষায় ঐ সকল গ্রন্থ অনূদিত হইলে, কেহ আর ঐ মৃতভাষাশিক্ষার্থ যত্নশীল হইবেন না এই আশঙ্কায়, অনেকেই ঐ পথে অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন।

যাহা হউক, এই দুই সিদ্ধান্তের ভাল মন্দ বিশদভাবে বিচার করা এ স্থলের উদ্দেশ্য নহে। তবে নিঃসঙ্কোচে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় কেবলমাত্র সাহিত্যের একচেটিয়া অধিকারের পরিবর্ত্তে নানাবিষয়িণী আলোচনার আবির্ভাব না হইবে, ততদিন বাঙ্গালীর জাতীয়উন্নতির আশা সুদূরপ্রক্ষিপ্ত।

ইহা বড়ই লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যতগুলি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই ইউরোপীয়পর্য্যটক-রচিত। যদিও দুই চারি জন বাঙ্গালী গ্রন্থকার এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তথাপি বৈদেশিক গ্রন্থাদির তুলনায় তাহাদের গ্রন্থ অতি অকিঞ্চিৎকর। ইউরোপীয়গণ সাতসমুদ্র তেরনদী উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া, এই সুদূর ভারতের তথ্যানুসন্ধান করিবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায় অবলম্বন করেন, আমাদের দেশীয় ভ্রাতাগণ তাহার শতাংশ অবলম্বন করিলেও কর্ত্তব্যজ্ঞানের সদ্ভাব রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া, আমরা স্পর্দ্ধা করিতে পারিতাম।

কেহ কেহ বলেন,—ইউরোপীয়গণের ন্যায় আমাদের সেরূপ ধনৈশ্বর্য্য নাই যে, নিশ্চিন্তমনে বসিয়া বসিয়া নানা তত্ত্বানুসন্ধানে

অভিনিবিষ্ট হইতে পারি। আমাদিগকে অন্নচিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়।

এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। সকলেই আর অন্নচিন্তাক্লিষ্ট নহেন। আমাদের ভিতর এমন সহস্র সহস্র যুবক আছেন, যাঁহারা ধনের প্রাচুর্য্য উপলব্ধি করিয়াও ইন্দ্রিয়াসক্তিতে মত্ত থাকিয়া ঐশ্বর্য্যের শ্রাদ্ধ করাকেই ব্যয়ের উপযুক্ত পথ বলিয়া জ্ঞান করেন। তারপর ইউরোপীয়গণের আয়ের তুলনায় আমাদের আয় যেমন অল্প, তাহাদের ব্যয়ের তুলনায় আমাদের ব্যয়ও তেমনি সংক্ষিপ্ত। বিশেষতঃ, আমরা অল্পায়াসে অল্পব্যয়ে স্বদেশের যেমন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি, সুদূর ইউরোপখণ্ড হইতে এদেশে আসিয়া কোন পর্য্যটকই তেমন সহজে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

যাহা হউক, আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ সে সকল গ্রন্থাভাব পূরণ-কল্পে প্রণীত হয় নাই। সে বিষয়ে আমার যোগ্যতার অভাব আছে। অথবা বঙ্গভাষায় ভ্রমণকাহিনীরচয়িতাগণের পথ-প্রদর্শক হইব, এমন স্পর্দ্ধাও আমার নাই। সৌভাগ্যবশতঃ কয়েকজন যোগ্যতর কৃতবিদ্য লেখক ইতিপূর্ব্বেই সেস্থান গ্রহণ করিয়াছেন।

বাঙ্গালী চিরকালই দেশভ্রমণে অনভ্যস্থ। বাষ্পীয়শকট ও পোতাবলী পথশ্রমের লাঘব করিলেও, আপনার শান্তিপূর্ণ কুটীর পরিত্যাগ করিয়া, প্রবাস পর্য্যটন করা তাহার অনভ্যাস। প্রবাসের ক্লেশময় পর্য্যটনে কি শান্তি নিহিত আছে, তাহার মর্ম্মোদ্ঘাটনে তিনি অসমর্থ।

দেশপর্য্যটন যে কেবল শান্তিপ্রদ, দেশভ্রমণে যে কেবলমাত্র

কৌতূহল চরিতার্থ হইয়া থাকে এমত নহে,—অশেষ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাও জন্মে। এ বিষয়ে মনস্বী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন ;—A visit to Northern India is an education which our schools do not impart ; it tells a history which our text-books do not record.

এই কথাকয়টী বর্ণে বর্ণে সত্য। এই জ্ঞান ও এই শিক্ষা নাই বলিয়াই, আজ বাঙ্গালী সাহসে, বিক্রমে, ব্যবসাবাণিজ্যে অন্যান্য জাতির সমকক্ষ নহে। নানাদেশীয় নানাবিষয়ের ও দর্শনীয় বস্তুর বর্ণনা পাঠে যদি তাহার দেশভ্রমণস্পৃহা বিন্দুমাত্রও বর্দ্ধিত হয়, সেই ভরসায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠকসমাজে প্রচারিত হইল।

সন ১৩১৪,
ইব্রাহিমপুর, ত্রিপুরা।

গ্রন্থকার।

সূচী।

বিষয়		পৃষ্ঠা
অবতরণিকা।		
যাত্রা	...	৫
বারাণসীর পথে	...	১১
বারাণসী	...	[illegible]
মির্জাপুর	...	৩২
চুনার	...	৪১
বিন্ধ্যাচল	...	৪৮
প্রয়াগ-তীর্থ	...	৫৫
ইটাওয়া	...	৬৬
আগ্রা	...	৭৮
ফতেপুর সিকরি	...	১০৪
বৃন্দাবন	...	১১৩
গোকুল	...	১৪৬
মহাবন	...	১৫২
দাউজী	...	১৫৪
মথুরা	...	১৫৫

রাজপুতনা।

রাজপুতনা	...	১৭১
ঢোলপুর	...	১৭২

বিষয় | | পৃষ্ঠা

গোয়ালিয়র ... ১৭৫

জয়পুর ... ১৮৭

অম্বর ... ২০২

আজমীর ... ২১০

পুষ্কর-তীর্থ ... ২১৬

চিতোর ... ২২১

পঞ্জাব।

পঞ্জাব ... ২৩৭

দিল্লীর পথে ... ২৩৯

দিল্লী ... ২৪৩

নূতন দিল্লী ... ২৪৪

পুরাতন দিল্লী ... ২৫০

লালকোট-দুর্গ ... ২৫১

ইন্দ্রপ্রস্থ ... ২৫৫

প্রত্যাবর্তন ... ২৫৮

পরিশিষ্ট ... ২৫৯

পঞ্জাব।

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।

পঞ্জাব।

দিল্লীর পথে।

আজমীরে জিনিসপত্র রাখিয়া আসিয়াছিলাম, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; সুতরাং আমাকে দিল্লীর পথে পুনরায় আজমীরে অবতরণ করিতে হইল। গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া আজমীরবাসী কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল; তিনি জেদ করিয়া এবার আমাকে তাঁহারই আলয়ে লইয়া গেলেন। পশ্চিমের সর্ব্বত্র বাঙ্গালীগণ এইরূপ স্বদেশবাৎসল্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। নানারূপ গল্পে স্বল্পে এবং তাঁহাদের আদর-অভ্যর্থনার ভিতর সেই রাত্রিটুকু কাটাইয়া দিয়া, পরদিন ১৩ই ফাল্গুন অপরাহ্নে, ডাকগাড়ীতে দিল্লী যাত্রা করিলাম।

এতকাল একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি; আজমীরে আসিয়া আমার সঙ্গে একটী স্বদেশীয় মুসলমান পরিব্রাজকের

সাক্ষাৎ হইয়াছিল; আমি যখন চিতোর যাই তখন তাঁহারই তত্ত্বাবধানে জিনিসপত্রগুলি ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম। এখন আমি দিল্লী যাইতেছি শ্রবণ করিয়া, তিনিও তথায়, যাইবার জন্য আমার সঙ্গ লইলেন। দু'জনে গল্পস্বল্প করিয়া, পথকষ্টের অনেকটা লাঘব করিলাম।

জয়পুর হইয়া, রাত্রি চারিঘটিকার সময় গাড়ী বান্দিকুঁই পৌঁছিল। আর, এম, আর লাইনে বান্দিকুঁই একটী বড় জংসন; আমরা এতক্ষণ যে গাড়ীতে আসিতেছিলাম, তাহা এইখান হইতে আগ্রাভিমুখে প্রস্থান করিল; আমরা অন্য গাড়ীতে আরোহণপূর্ব্বক দিল্লীর পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

পথে আলোয়ারের দৃশ্য বড় চমৎকার! এমন সুন্দর ও মনোরম স্থান আতপদগ্ধ রাজপুতনায় অতি বিরল। নীল-শোভাময়ী শিখিগণ পক্ষবিস্তারপূর্ব্বক নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেছে; চারিদিকে রাশি রাশি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া, হাসির প্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়াছে; আর প্রিয়দর্শন চারু অট্টালিকাগুলি মাঝে মাঝে মস্তকোত্তোলনপূর্ব্বক বৃক্ষপত্র-রাশির ভিতরে নীলবারিশোভিতা কুমুদিনীবৎ কেমন বিরাজ করিতেছে! দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়া গেলাম।

গাড়ী যতই দিল্লীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই শ্মশানের বিরাটদৃশ্য ক্রমে ক্রমে আমাদের নয়নসমক্ষে প্রকটিত হইতে লাগিল;—ততই ভগ্ন ইষ্টকালয়াদির সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। শত শত প্রাচীন দেবালয়, মসজিদ ও আবাস-ভবনের ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত অস্থিকঙ্কালের ভিতর দিয়া আমাদের গাড়ী চলিতে চলিতে, বেলা দুই ঘটিকার সময় দিল্লী পৌঁছিল।

হাওড়ার মত দিল্লীও অতি বৃহৎ ষ্টেসন। এখানে, 'ই আই আর', 'বি বি সি আই', 'আর এম আর', 'এন ডবলিউ আর', 'ও আর আর', ও 'জি আই পি আর' এর লাইনগুলি একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। বহুদূরবিস্তৃত ষ্টেসন-প্রাঙ্গণ ও অট্টালিকাগুলি অনেকটা হাওড়াষ্টেসনের মতই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমরা বাহিরে আসিয়া দিল্লীর রাজপথে পদার্পণ করিতেই চারিদিক হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে সরাইওয়ালাগণ আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল। আমার সরাইয়ে যাওয়ার বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না; এই নগরবাসী কোন একটী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নিকট একখানা পরিচয়-পত্র লইয়া আসিয়াছিলাম; তাঁহারই নিকট অবস্থান করিব, এমতই ঠিক হইয়াছিল। কিন্তু সঙ্গীয় লোকটীর কি হইবে, এবং এখন যাইয়াই বা হঠাৎ সেই কথিত লোকটীর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিব কি না, এসব কথা চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলাম, প্রথমে কোন সরাইয়ে আশ্রয় লওয়াই যুক্তিযুক্ত বটে।

এখানে ভাল ভাল সরাইয়ের অভাব নাই। বিলাসের চির-লীলানিকেতন দিল্লীতে আজও যে সৌখিনতার তরঙ্গ ও আরামস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। মনোহর বিপণিশ্রেণী, সুন্দর সুন্দর দেশীয় ও ইউরোপীয় হোটেল, নানারূপ আরামদায়ক প্রশস্ত সরাই ও চারু স্নানাগার (Turkish Bath) গুলি দিল্লীর অমূল্য সম্পত্তি। ষ্টেসনের বাহিরে কুইন্স গার্ডেন। কুইন্স গার্ডেনের এক পাশেই রাস্তার পারে কোন এক সরাইয়ে আমরা স্থান গ্রহণ করিলাম। সারাদিনের পরিশ্রমে

ও ক্ষুধায় মৃতপ্রায় অসাড় হইয়া পড়িয়াছিলাম; তাড়াতাড়ি স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া, সেদিনকার মত সেখানেই বিশ্রাম করিলাম—আর কোথাও বাহির হইলাম না।

এলাহাবাদের ধর্ম্মশালার মত এখানেও জলের কলের, এবং নানারূপ জিনিসপত্র ও ভৃত্যাদির বিশেষ সুবিধা আছে। পর দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেই একজন চাকর আসিয়া স্নান ও হাতমুখ প্রক্ষালনের জন্য গরম জল আনিয়া হাজির করিল। আমরা স্নান করিয়া দেখি, ভোজনেরও ষোলআনা রূপ আয়োজন হইয়াছে—ডাল, ভাত, রুটী, তরকারী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রস্তুত। সরাইয়ে যাত্রিদিগের সুবিধার্থ একজন পাচক ব্রাহ্মণ রক্ষিত হইয়া থাকে। যাত্রিগণ যখন যাহা ভোজন করিতে চাহে, উপযুক্ত মূল্যে তাহাই প্রস্তুত করিয়া দেওয়া তাহার ব্যবসা। আহার করিয়া আমরা সেই পূর্ব্ব-কথিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের আবাসগৃহের তল্লাসে বহির্গত হইলাম। ইনি দিল্লীর St. Stephens কলেজের একজন ফিলসফির অধ্যাপক; নাম—নিশিকান্ত সেন। বাসা চিনিয়া লইতে আমাদিগকে বড় বেশী বেগ পাইতে হইল না। দেখিলাম, নিশিবাবু বড়ই অমায়িক লোক; অল্প বয়স, বেশ হাসিখুসী চেহারা, দিব্যি আলাপী-সালাপী। তিনি আমাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং আমার সঙ্গীয় মুসলমান পরিব্রাজকটীকেও স্বালয়ে রাখিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ততটা কষ্ট দিবার ইচ্ছা না থাকিলেও আমরা তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না। বন্ধুটী অগত্যা অন্যত্র আহারের বন্দোবস্ত করিয়া তথায় বাসাগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। আমরা অতঃপর দিল্লীতে যতদিন বাস

করিয়াছিলাম, নিশিবাবুর সোদরপ্রতিম যত্নে প্রবাসের যাতনা ও ক্লেশ আমাদিগকে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই।

দিল্লী।

যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ—রাজপুত, পাঠান ও মোগলের শত শত বৎসরব্যাপী রাজধানী এই দিল্লীনগরী—ইহাদের প্রাচীনত্বের কথা পাঠককে আর নূতন করিয়া কিছুই বলিতে হইবেনা। অতি পুরাতনকাল হইতেই এই স্থান ভারতের ইতিহাসাঙ্কে চিত্রিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের বিলোপ সাধিত হইলে, খৃষ্টের জন্মের প্রায় সমসাময়িককালে, দিলু নামক কোন মৌর্য্যবংশীয় নরপতি সর্ব্বপ্রথম এই ভগ্নাবশেষের নিকট আপন রাজধানী স্থাপন করেন এবং স্বীয় নামানুযায়ী ইহাকে দিল্লী নামে অভিহিত করেন। কিন্তু দুর্দ্দান্ত শত্রুদিগের আক্রমণে অবিলম্বেই এই ক্ষুদ্র নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল; সেই অবধি সাত শত বৎসর পর্য্যন্ত আর ইহার কথা শ্রুত হয় নাই! ৭৩৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থান 'তোমার' বংশীয় অনঙ্গপালের রাজধানীতে পরিণত হয়। বর্ত্তমান কুতুব মিনারের নিম্নে এই রাজধানীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। অনঙ্গপালের বহু পরে চৌহানবংশোদ্ভব পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও আজমীরের যুক্তসিংহাসন অধিকার করিয়া,এই স্থানেই একটী দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে থাকেন। সেই জন্য ইহার নাম "রায় পৃথেরো-দুর্গ" হইয়াছে। ইহার পর পৃথ্বীরাজের পরোলোকান্তে, ভারতে পাঠানসাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইল। পাঠানেরা প্রাচীন রাজধানীর অদূরে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

আপনাপন দুর্গাদি নির্ম্মিত করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাহাদের ভগ্নাবশেষ আজিও পুরাতন দিল্লীর পৃথক্ পৃথক্ অংশ-বিশেষরূপে ইতস্ততঃ পতিত আছে। পাঠানদিগের অন্তে মোগল-রাজধানী কতকালের জন্য আগ্রায় স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু তখনও বাদসাহগণ দিল্লীকে অবহেলার চক্ষে দর্শন করেন নাই। বাবর, আকবর ও জাহাঙ্গীর ইহার সংস্রব একরূপ পরিত্যাগ করিলেও দিল্লীর সমৃদ্ধি ম্লান হয় নাই। হুমায়ুন, শের সা ও তদীয় বংশধরগণের রচিত প্রাসাদাবলীর ধ্বংসাবশেষ ইন্দ্রপ্রস্থভূমে আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাহজাহান ভূপতির রাজত্বকালে রাজ-ধানী পুনরায় দিল্লীতে আনীত হইল। তদ্‌গঠিত প্রাচীরপরিখা-বেষ্টিত দুর্গপ্রাসাদসম্বলিত সাজাহানাবাদই আজ কাল নূতন-দিল্লী নামে সর্ব্বত্র পরিচিত—আর বহুক্রোশব্যাপী অন্যান্য পুরাতন রাজধানীর সমষ্টিগুলিই পুরাতন দিল্লী নামে কথিত হইয়া থাকে। যুগযুগান্তরের বার্ত্তাবাহী এই সকল ভগ্নস্তূপ-রাশির ভিতর, যে শতসহস্র দর্শনীয় সামগ্রী লুকায়িত রহিয়াছে, তিন চারি দিনে তাহা সম্যক্ পরিদর্শন করা অসম্ভব। আমরা একরূপ আহারনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি মাত্র দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম; পাঠক পাঠিকাদিগকে তাহাদেরই কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এই আখ্যায়িকা সমাধা করিব।

নূতন দিল্লী।

পৃথ্বীরাজের রাজধানীর এগার মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, বালুকা-সৈকতনিবদ্ধা নীলশোভাময়ী যমুনার পশ্চিমতটে, ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে

সাহজাহান বাদসাহ এই নূতন নগরী স্থাপিত করেন। দৃঢ়-প্রাচীরবদ্ধ ও গভীরপরিখাযুক্ত এই সহরে দশটী উন্নত ফটকপথে প্রবেশ করিতে হয়।

১৫ই ফাল্গুন, দু'প্রহর। নিশিবাবু আমাদিগকে লইয়া সহর দেখাইতে বাহির হইলেন। প্রথমেই আমরা প্রাচীনরাজপ্রাসাদ-মালা দেখিবার জন্য দুর্গাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

নগরীর এক অংশে, নদীতটে, সাহজাহাননির্ম্মিত সুন্দর দুর্গ আজও যেন সম্পূর্ণ নূতন রহিয়াছে। লোহিতপ্রস্তরবিনি-র্ম্মিত প্রাচীরগুলির গঠনপ্রণালী অনেকটা আগ্রাদুর্গেরই অনুরূপ, তবে ততটা উন্নত নহে। দুইটী মাত্র দ্বারপথে এই দুর্গে প্রবেশ করা যায়। তাহাদের নাম—লাহোর-দরজা ও দিল্লী-দরজা। তন্মধ্যে লাহোর-দরজাই বিশেষ উন্নত ও সুপ্রসিদ্ধ। আমরা কেণ্টনমেণ্ট মাজিষ্টারের নিকট হইতে 'পাস'গ্রহণ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ৩২০০ ফিট দীর্ঘ, ১৬০০ ফিট প্রস্থ, এই দুর্গে সাহজাহান ও আউরঙ্গজেবের অমরালয়তুল্য রাজপ্রাসাদমালা এখনও কতক কতক দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। লোহিতস্তম্ভমালা-শোভিত প্রশস্ত আমদরবারগৃহ, নানারূপ রত্নালঙ্কারচিত্রিত ভুবনবিখ্যাত দেওয়ানীখাস, বিলাসিতার চিরনিকেতন, সরসী-মালাসিক্ত হামাম বা স্নানাগার, পারিবারিক ভজনালয় আউরঙ্গ-জেবনির্ম্মিত ক্ষুদ্র মতি-মসজিদ্ ও বেগমগণের আবাসভবন রঙ্গমহলের চারু অট্টালিকাগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিস।

লাহোর-দরজাপথে দুর্গ প্রবেশ করিলেই সম্মুখে নক্করখানা। ফটক হইতে এই অট্টালিকার ভিতর দিয়া একটী সোজা রাস্তা বরাবর আমদরবারে উপস্থিত হইয়াছে। প্রবেশমাত্রই বহুদূরে

দরবারগৃহের সিংহাসনমঞ্চ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে বাদসাহ সিংহাসনোপবিষ্ট হইলে, দুর্গপ্রবেশার্থীদিগকে এইখান হইতেই তসলীম ঠুকিতে ঠুকিতে রাজসদনে উপস্থিত হইতে হইত; আবার প্রত্যাবর্ত্তনকালেও তাহারা এই ভাবেই ক্রমাগত অভিবাদনের সঙ্গে পশ্চাৎপদ হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন। আমদরবারের সে শোভাসম্পদ এখন আর নাই। বর্ণিয়ারকথিত-স্বর্ণালঙ্কারভূষিত চিত্রাদি অনেক দিন লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে; শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত সিংহাসনমঞ্চে এখন আর উজ্জ্বলজ্যোতিঃ ময়ূর-সিংহাসন রূপের শিখা প্রকটিত করে না; সে রাজদরবারও এখন আর নাই; কেবল সারি সারি স্তম্ভগুলি অতীতের সাক্ষীস্বরূপ নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান আছে।

দেওয়ানীআমের পশ্চাতেই রঙ্গমহাল, রঙ্গমহালের উত্তরে বাদসাহের শয়নগৃহ বা খোয়াবগা। এইখানে যে একটী উৎকৃষ্ট মর্ম্মর প্রস্তরজাল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অপূর্ব্বকারুকার্য্যের তুলনা কোথাও নাই। ইহারই উত্তরে ভুবনবিখ্যাত দেওয়ানীখাস। চারিদিক উন্মুক্ত এই রত্নাদিখচিত মর্ম্মরগৃহ ভারতে অদ্বিতীয়। আগ্রার খাসমহলের অনুকরণে নানাবহুমূল্যপ্রস্তরে ইহার ছাদ ও দেওয়ালগুলি অতি আশ্চর্য্যকৌশলে চিত্রিত করা হইয়াছে। মেজের মধ্যস্থলে একটী শুভ্রপ্রস্তরাসন। প্রাচীন মুক্তাপ্রবালাদি বহুকাল অপহৃত হইলেও, এই অপূর্ব্বসৌধ এখনও উজ্জ্বলপ্রভায় চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া রহিয়াছে। কবি সত্যই ইহার একাংশে লিখিয়া গিয়াছেন—"পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে, তবে এই।" ইহার প্রাচীন সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে, একথা একবারে অর্থহীন বিবেচিত হইবে

না। দেওয়ানীখাসের উত্তরপার্শ্বে হামাম বা স্নানাগার। এই-খানে বাদসাহের পুরমহিলাগণ মর্ম্মরসলিলাধারের সুরভিস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া সুখের তরঙ্গে চিরনিমজ্জিত হইতেন। তিনটী সুন্দর সুন্দর শিল্পময় প্রকোষ্ঠে, কত কত ক্ষুদ্র উৎসরাজি নির্ম্মল মেজের উপর বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহাদের কোনটী হইতে উষ্ণ, কোনটী হইতে শীতল জলের ঊর্দ্ধধারা বাহির হইয়া জলাধারগুলি প্লাবিত করিত। আবার আর একটী সঙ্কীর্ণমর্ম্মরপথে যমুনার পূতবারি—অন্তঃসলিলারূপে রঙ্গমহাল ও দেওয়ানীখাসের ভিতর দিয়া এইস্থানে আনীত হইত। সে স্রোত এখন আর নাই—কতকাল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে !

ইহারই পশ্চিমে একটী আলগা ভূমিখণ্ডে মতিমসজিদ্। আগ্রার মতিমসজিদ্ অপেক্ষা ইহার আকৃতি অনেক ক্ষুদ্র। কারু-কার্য্যও তেমন উৎকৃষ্ট নহে। এই ক্ষুদ্রমন্দিরও আমূল শ্বেত-প্রস্তরবিনির্ম্মিত। উপরে তিনটী উৎকৃষ্ট গম্বুজ শোভা পাইতেছে। দুর্গস্থ কুলললনাগণের উপাসনার জন্য আউরঙ্গজেব বাদসা এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এই সব দেখিয়া আমরা দুর্গ হইতে বহির্গত হইলাম। দুর্গ-প্রাচীরের বাহিরে প্রশস্ত উন্নতভূমির উপর বৃহৎ জুম্মামসজিদ্ আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান আছে ; উচ্চ মিনারদ্বয় যেন কোনও বিজয়ী সেনাপতির হস্তদ্বয়স্বরূপ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া সকল নগরবাসিগণকে আশ্বস্ত ও উৎসাহিত করিতেছে। অত্যুচ্চ বেদীর উপর অত্যুচ্চ ফটকশোভিত এই উপাসনামন্দির সাহজা-হান ভূপতি ১৫ লক্ষ মুদ্রাব্যয়ে পূর্ণপঞ্চদশ বৎসরে নির্ম্মিত করেন। হিন্দুগণ 'পাস' ব্যতীত এই মন্দিরে প্রবেশ করিতে পায়

না। নিকটেই 'পাস' মিলিয়া থাকে। আমরা পাস-গ্রহণান্তর মন্দিরপ্রবিষ্ট হইয়া মিনারারোহণপূর্ব্বক চারিদিকের শোভা দর্শন করিলাম; তারপর বৃহৎ ভজনালয়ের সম্মুখস্থ প্রশস্ত আঙ্গিনার সরোবরতীরে ক্ষণকাল উপবেশন করিয়া সন্ধ্যায় প্রজ্বলিত দীপালোকের সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর চিরপ্রসিদ্ধ রাজবর্ত্ম চাঁদ্নীচকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

চাঁদ্নীচকের প্রাচীনগৌরব আজিও একেবারে ম্লান হইয়া যায় নাই। প্রশস্ত রাস্তার দুইধারে উৎকৃষ্ট বিপণীশ্রেণী; সড়কের মধ্যস্থলে উচ্চবেদীর উপর ব্যাপারীগণ নানা মনোমুগ্ধকর সামগ্রী সাজাইয়া রাখিয়া বসিয়া আছে। রজনীর দীপালোকে তাহাদের যে উজ্জ্বলচিত্র প্রকটিত হয়, তাহা দর্শন করিলে অজ্ঞাতসারে কেমন সেই এককালের একখানি অস্পষ্ট আলেখ্য ধীরে ধীরে কল্পনারাজ্যে জাগিয়া উঠে। উচ্চ ক্লক-টাওয়ার ও উৎসাদিশোভিত এই ঐতিহাসিক পথের একপার্শ্বে রোসেনউদ্দৌলার প্রাচীন মঠ "সোনালী মস্‌জিদ্।" কথিত আছে, ইহারই উপর হইতে ক্রূরমতি নাদের সা দিল্লীধ্বংসের আদেশ প্রচারিত করিয়াছিলেন।

সহরের উত্তর দিকে কাশ্মীর-দরজা। পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে এইদ্বারমুখে যে সকল বীভৎস কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। সে সকল কিছু কিছু চিহ্ন অদ্যাপিও এ স্থলে বর্ত্তমান আছে। এইখানেই ইংরেজসেনাপতি জেনারেল নিকলসন্ অতুলবিক্রমে শত্রুসৈন্য বিনাশ করিতে করিতে বিদ্রোহীদের হস্তে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। এই বীরত্বপূর্ণকাহিনী সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ দরজার বাহিরে একটী

উৎসধারাপরিবেষ্টিত সুন্দর উপবনভূমি নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে তদীয় বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহারই কিয়দ্দূরে ফতেগড়ের উন্নতভূমির উপর, অন্যান্য মৃতসৈন্যগণের স্মরণচিহ্নস্বরূপ দ্বিতীয় আর একটী সুদৃশ্য মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। এই সুন্দর মন্দিরটী ছোট হইলেও, উন্নত স্থানে স্থাপিত বলিয়া বহুদূর হইতে সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অন্যান্য মিনারের মত, ইহার ভিতরেও সিঁড়ি আছে—তদবলম্বনে উপরের দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হওয়া যায়।

নিকলসন্‌পার্কের সন্নিকটেই আমেদ সা-জননী কুদ্‌সিবেগমনির্ম্মিত কুদ্‌সিয়া বাগান। এখানে বহুতর ফলমূলের বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারই আর এক পার্শ্বে সাহেবদের কবরখানা। শত শত শ্বেতাঙ্গের সুদৃশ্য কবরশ্রেণী বৃক্ষের শ্যামলস্নিগ্ধছায়ায় চিরবিশ্রামলাভ করিতেছে। নীরব, নিস্তব্ধ, মৃদুবায়ুসঞ্চালিত এই সমাধিকানন বড়ই গম্ভীরভাবব্যঞ্জক। সহরের ভিতরে ষ্টেসনের নিকটেই কুইন্স গার্ডেন। কুইন্সগার্ডেনের মধ্যস্থলে একটী মনোহর প্রস্তরাট্টালিকায় দিল্লীর টাউনহল, পাব্লিক লাইব্রেরী, মিউনিসিপাল আফিস ও মিউজিয়াম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচীনকালের কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র এবং নানাশিল্পখচিত বহুতর প্রস্তরমূরত্তি ও প্রস্তরপাত্রাদি ব্যতীত এই ক্ষুদ্র মিউজিয়ামের ভিতর অন্য আর তেমন কিছুই দেখিবার সামগ্রী নাই। এতদ্ব্যতীত, দিল্লীতে আরো কয়েকটী সুন্দর সুন্দর মস্‌জিদ্ ও অট্টালিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্থানাভাবে সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করিলাম। নগরে কয়েকটি সূতার কল এবং বিস্কুট প্রভৃতি অপরাপর দ্রব্যের ফেক্টরী স্থাপিত হইয়াছে।

স্বর্ণ রৌপ্য ও গজদন্তের অতি সূক্ষ্মকারুকার্য্যের জন্য দিল্লী বিশেষ প্রসিদ্ধ। ১৯০১ সালের সেন্‌সাসে ইহার লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক দুইলক্ষ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

পুরাতন দিল্লী।

কখনও নূতন ভাল, কখনও পুরাতন ভাল! নূতনদিল্লী অপেক্ষা চূর্ণবিচূর্ণিত পুরাতনদিল্লী আমার নিকট অধিকতর দর্শনযোগ্য মনে হইয়াছিল।

১৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাড়াতাড়ি স্নানাহারসমাপনপূর্ব্বক আমরা এই কীর্ত্তিসমাধি পুরাতন নগরী দর্শনার্থ যাত্রা করিলাম। আজমীর-দ্বারপথ অতিক্রম করিতেই আমাদের অশ্বশকট ভগ্নস্তূপমালাপরিবেষ্টিত এই শ্মশানপ্রান্তরের একপ্রান্তে পড়িয়া কেমন মিলিয়া গেল। ৪৫ বর্গমাইলব্যাপী এই ভীষণ মহাশ্মশানের তুলনা জগতে আর দ্বিতীয় নাই। দূরদূরান্তরে যতদূর দৃষ্টি যায় চাহিয়া দেখিলাম, কেবলই শ্মশান, কেবলই ভগ্নাট্টালিকারাশি! মৃত্যুর করাল ছায়া তাহাদের চারিদিকেই যেন নৃত্য করিতেছে। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে প্রাচীনসহরগুলি লুপ্তপ্রায়প্রাচীরবেষ্টিত হইয়া [illegible]বিনষ্টকলেবরে দূরে দূরে লক্ষিত হইতেছে। শত শত প্রাচীন অট্টালিকার কোনটী স্বল্পক্ষতিগ্রস্থ, কোনটী অর্দ্ধভগ্ন, কোনটী বা একবারেই ধূলিস্যাৎ হইয়া গিয়াছে। কোথাও দশটী, কোথাও পাঁচটী, কোথাও বা একটীই একাকী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাতাসের সন্‌ সন্‌ শব্দে হৃদয়ের চিরবেদনা করুণস্বরে ধ্বনিত করি-

তেছে। হায়! কত কীর্ত্তি, কত কাহিনী, কত ঐশ্বর্য্যসম্পদ এইখানে ধূলিরাশিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিবে! কত রাজা, মহারাজা, নবাব ও বাদ্‌সা এই মৃত্তিকারাশির ভিতর লোপ পাইয়াছে, তাহা কে জানে! যাঁহারা এককালে পৃথিবীপতি ছিলেন, যাঁহাদের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে চরাচর কম্পিত হইত, যাঁহাদের কীর্ত্তিময়ধ্বজ একদিন সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহারাই আজ কত ক্ষুদ্র, কত সামান্য!—হয়ত অনেকে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। কোথায় আজ কুতবুদ্দীন, কোথায় বুলবন, কোথায় রিজিয়া?—কোথায় তোগলক, কোথায় ফিরোজ সা, কোথায় হুমায়ুন? হায়, সকলই আজ এই একই মহাশ্মশানের বিভিন্ন অঙ্কে চিরনিদ্রায় চিরশায়িত! চারিদিকে কেবল অনন্ত চিতার 'ধূ ধূ' বহ্নি অনন্ত শিখারাশি উদ্গীরণ করিতেছে। কীর্ত্তির এ মহাশ্মশানে দাঁড়াইয়া এমন কে আছেন, যিনি একটুকুমাত্রও বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন—একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ না করেন?

ভগ্নহৃদয় পুরাতনদিল্লীবক্ষে যেসকল ঐতিহাসিকচিত্র অঙ্কিত আছে, তাহার পূর্ণবর্ণনা করিতে হইলে দু' একদিনে সে কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে না। আমরা সারাদিন অক্লান্তপরিশ্রমপূর্ব্বক যে সকল স্থান দর্শন করিলাম, তাহাদেরই সংক্ষিপ্তবিবরণ পাঠকপাঠিকাকে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

লালকোট দুর্গ।

আজমীর-গেট হইতে দুই মাইল দক্ষিণে 'যন্তর-মন্তর' নামক মানমন্দির। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে সোয়াই জয়সিংহ ইহা নির্ম্মাণ করিয়া-

ছিলেন, এখন ইহা সম্পূর্ণ ভগ্ন ও অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে। ইহারই সম্মুখে কিয়দ্দূরে উৎকৃষ্ট সফদরজঙ্গ-সমাধিসৌধ। কেহ কেহ বলেন, আওরঙ্গজেবদুহিতার সমাধির উপর স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ এই মন্দির ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সমগ্র দিল্লীতে ইহা একটী উত্তম দর্শনীয় বস্তু। শ্বেতপ্রস্তরের বৃহৎ গম্বুজবিশিষ্ট এই স্মরণমন্দিরের আকার অনেকটা তাজেরই অনুরূপ। ইহার অন্যান্য অংশ লোহিতপ্রস্তরনির্ম্মিত,—তবে মধ্যে মধ্যে সাদা প্লাষ্টারের প্রলেপ আছে।

এই সকল দর্শন করিয়া আমরা প্রায় ৯ টার সময় কুতুব-মিনারের সমীপবর্ত্তী হইলাম। দূর হইতে নীলগগনপটে যে একবার এই উন্নতস্তম্ভের স্বপ্নময় প্রতিমূর্ত্তিখানি দর্শন করিয়াছে, সে আর ইহজীবনে এ দৃশ্য ভুলিতে পারিবে না। জগতে কত কত উচ্চস্থান আছে, কিন্তু এমন সুন্দর স্তম্ভ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।*

পৃথিবীতে যদি অষ্টম আশ্চর্য্য বলিয়া এত দিন একটা পদার্থ থাকিত, তবে কুতুবমিনার সে স্থানাধিকারের জন্য ন্যায়তঃ দাবী করিতে পারিত। ২৩৮ ফিট উচ্চ এই স্তম্ভ পাঁচটী তলে বিভক্ত। প্রতিতলে একটী করিয়া সুদৃশ্য প্রস্তরবারান্দা গেলারীর মত স্তম্ভের চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কোন্ প্রাচীনকালে কোন্ মহাপুরুষ এই আশ্চর্য্যকীর্ত্তি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, মুসলমানগণই ইহার

---

* It is probably not too much to assert that the Kutub Minar is the most beautiful example of its class known to exist anywhere.—*Fergusson.*

সৃষ্টিকর্ত্তা ; অপর দলের মতে ইহা আরও প্রাচীনতর কালে কোন হিন্দু নরপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতদুভয়ের মধ্যে আর একটা তৃতীয় দল আছে। তাহাদের কথা এই যে, পুরাকালে হিন্দুগণই এ স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে মুসলমান ভূপতি কুতুবুদ্দীন উহা সংস্কৃত করিয়া নবভাবে গঠনপূর্ব্বক আপনার নামে পরিচিত করিয়াছেন। আমিও অনেকটা এই শেষোক্ত মতেরই পক্ষপাতী। লালপ্রস্তরনির্ম্মিত কুতুবমিনারের উপরের তল দুইটী একরূপ শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত। কোন পরবর্ত্তী সময়ে ফিরোজ সা এই তল দুইটীকে পুনর্গঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। শুনিয়াছিলাম, এই স্তম্ভপৃষ্ঠে প্রাচীন দেবনাগরী ভাষায় অস্পষ্টাক্ষরে কয়েকটী কথা মুদ্রিত ছিল ; কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছু চিহ্ন কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই। পরন্তু কুতুবুদ্দীনের কালে যে এই মন্দির সংস্কৃত হইয়াছিল, সে বিষয়ের অনেক নিদর্শন আজও ইহার গাত্র-চিত্রিত আরবী অক্ষরমালা হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে।

আমরা ক্রমে ক্রমে এই বিশাল স্তম্ভের তলদেশে উপনীত হইলাম। সারি সারি সোপানাবলী স্তম্ভের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে ; ৩৭৯টী প্রশস্ত সিঁড়ি অতিক্রমপূর্ব্বক আমাদিগকে চূড়ারোহণ করিতে হইল।

অভ্রভেদী কুতুবশিখর হইতে চারিদিকের শোভা বড়ই মনোরম, বড়ই মহান্। চারিদিকের বিকট শ্মশানদৃশ্যের মধ্যে, দূরে সাজাহানাবাদের জুম্মা-মস্‌জিদ্ যেন কোন সুরসুন্দরীর মত শান্তির ডালা হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কুতুবমিনারের অদূরেই প্রসিদ্ধ লালকোট দুর্গ। পৃথ্বীরাজ-

নির্ম্মিত ইহার একাংশ এখনও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কত যুগযুগান্তরের স্মৃতি-চিহ্ন এই সকল ভগ্ন প্রাচীর ও লুপ্তপ্রায় কক্ষগুলি দর্শন করিলে, হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়, প্রাণে কেমন বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়া উঠে। স্তম্ভনিম্নে এতদ্ব্যতীত আরও অনেক হিন্দুরাজত্বকালের অদ্ভুত অদ্ভুত নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এখানে যে অপূর্ব্বভাস্করশিল্পখচিত প্রাসাদাবলির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়; জগতের অন্য কোথাও তাহার তুলনা নাই। কুতুব-মস্‌জিদ্‌, আড়াই দরজা, সামসুদ্দীন আল্‌তামাসের সমাধিমন্দির প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে বিশেষ দর্শনযোগ্য। প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের ভগ্নপ্রস্তরখণ্ড দ্বারাই এই সকল অট্টালিকাগুলি পরে মহম্মদীয় আদর্শে রচিত হইয়াছিল ; তাই তাহাদের মস্‌জিদাকার-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। চারিদিকের বহুসংখ্যক উৎকৃষ্টকারুকার্য্য-খচিত স্তম্ভাবলি হইতে এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত করা যাইতে পারে।

ইহাদেরই এক পার্শ্বে একটী বৃহৎ ফটকের নিকটে ২৪ ফিট উচ্চ, একটী নিরেট লৌহস্তম্ভ। দিল্লীতে এতদপেক্ষা প্রাচীন কীর্ত্তি আর কোথাও বর্ত্তমান নাই। ইহার গাত্রে অস্পষ্টাক্ষরে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা পাঠে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে, খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে চন্দ্র নামক কোন হিন্দু রাজাকর্তৃক এই স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল। কেহ কেহ "চন্দ্র"কে "বভ" বা "ভব" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল নামের কোনটীরই কোন ঐতিহাসিক পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এতকাল লোকের বিশ্বাস ছিল, এই স্তম্ভটী একরূপ অতলস্পর্শ—ধরিত্রীগর্ভে বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার মূলদেশ বিস্তৃত

হইয়াছে। কিন্তু এখন আর সে ভ্রমের স্থান নাই। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহার ভূগর্ভপ্রোথিতাংশের পরিমাণ তিন ফিটের অধিক নহে।

এই স্থানেরই অদূরে পৃথ্বীরাজের প্রাচীন নগরী পুরাতন দিল্লী দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার অবস্থা সম্প্রতি বড়ই শোচনীয়। চারিদিকে কেবল ভগ্নপ্রস্তরশ্রেণী, আবর্জ্জনারাশি ও বিভীষিকা-মাখা এক 'খা খা' ভাব লক্ষিত হইতেছে। আমরা এই স্থানে আরও অনেকানেক প্রাচীন অট্টালিকা দর্শনান্তর ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

ইন্দ্রপ্রস্থ।

পথে আমরা নিজামুদ্দীন আউলিয়ার প্রসিদ্ধ দরগা ও হুমায়ুন সমাধিমন্দির দর্শন করিলাম। নিজামুদ্দীনচিস্তির কবর আজমীরের মৈমুদ্দীন চিস্তির সমাধিমন্দিরের ন্যায় ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের আর একটী অতি পবিত্র স্থান। এখানেও নানাবিধ উৎকৃষ্ট হর্ম্ম্যরাজি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে, এই ফকিরের সমাধিমন্দির ও জামালখানা মস্‌জিদই আমার নিকট বিশেষ ভাল লাগিয়াছিল। সমাধিস্থল হইতে কিয়দ্দূরে, চৌষট্টি-খাম্বা নামক আর একটী সুন্দর মার্ব্বলসৌধ বিশেষ দ্রষ্টব্য। নিজামুদ্দৌলায়, মহম্মদ সা, জাহানারা বেগম, কবি আমীরখসরু প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত নরনারীর সমাধিস্থল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দিল্লীতে হুমায়ুন-সমাধি একটী অচিন্ত্য ও অভাবনীয় কীর্ত্তি। মৃতপতির কবরের উপর পনর লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া সতীসাধ্বী

হামিদাবানু বেগম দীর্ঘ ষোড়শবৎসরের উপর্য্যুপরি পরিশ্রমে এই মন্দির নির্ম্মিত করিয়া গিয়াছেন। বহু বৎসর পর আগ্রায়, ইহারই চারু আদর্শে বিশ্বমোহিনী তাজমহল গঠিত হইয়াছিল। এই প্রকাণ্ড মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে তাজমহলের ন্যায় সেরূপ অপরূপ ঔজ্জ্বল্যরাশি ও রত্নাদিখচিত চিত্র অঙ্কিত না থাকিলেও শিল্প-জগতে ইহার স্থান কম নহে। দূর হইতে ইহার বিশাল কলেবর প্রত্যক্ষ করিলে স্বতঃই কেমন এক মহান্ ও গম্ভীর ভাবে হৃদয়-মন অভিভূত হইয়া যায়। এ দৃশ্য না দেখিলে পাঠকের কখনও স্বরূপ বোধগম্য হইবে না।

বেলা ৫ ঘটিকার সময় আমরা ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলাম। হায়, যুধিষ্ঠিরের সে ইন্দ্রপ্রস্থ এখন কোথায়! দিল্লীর অন্যান্য অংশের ন্যায় এখানেও মহম্মদীয় অট্টালিকাশ্রেণীর ভগ্নস্তূপরাশি পড়িয়া আছে। হুমায়ুন বাদসাহ ও শের সা এইখানেই একদিন আপনা-পন রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন; প্রাচীন শেরগড় দুর্গ অদ্যাপি তাহার নিদর্শন প্রদান করিতেছে। আমরা স্তূপের পর স্তূপরাশি অতিক্রম করিয়া শেরসাহনির্ম্মিত বৃহৎ কিল্লাকোণা মস্‌জিদ্ ও শেরমন্দির নামক ক্ষুদ্র অষ্টকোণ অট্টালিকা দর্শন করিলাম। কথিত আছে, এই ক্ষুদ্র গৃহেই কোনকালে হুমায়ুন বাদসাহের প্রাচীন পাঠাগার স্থাপিত ছিল এবং ইহারই না'* সোপানশ্রেণী হইতে এই পরাক্রান্ত সম্রাট ভূপতিত হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন। একশ্রেণী অপ্রশস্ত সিঁড়ি প্রদর্শন করিয়া, আমাদের গাইড তাহাদিগেরই কোনও স্থলে সম্রাটের পতনস্থান নির্দ্দেশ করিল। তাহার সেকথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে না পারিলেও, কেন জানি না, কেমন এক

বিষাদময় স্মৃতি লইয়া আমরা দুর্গমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিলাম।

পাঠানবীর শের সাহ যে একজন বিশেষ শিল্পানুরাগী পুরুষ ছিলেন, তাহা তদীয় নির্ম্মিত এই কিল্লাকোণা মস্‌জিদ্ হইতেই পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। ইহার প্রাচীরাঙ্কিত নানারূপ সুদৃশ্য চিত্রাবলি অতিশয় নয়নরঞ্জন ও স্থাপত্যোৎকর্ষের পরিচায়ক। শের সাহের রাজধানী বলিয়া ইন্দ্রপ্রস্থের বর্ত্তমান নাম শেরগড় হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে পুরাণা কিল্লা বলিয়াও অভিহিত করেন।

ইন্দ্রপ্রস্থের অদূরে দিল্লী-ফটকের সন্নিকটেই ফিরোজ সাহের রাজধানী ফিরোজাবাদের প্রসিদ্ধ কিল্লা ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে। ফিরোজ সা মিরাট হইতে দুইটী অশোক-স্তম্ভ আনয়ন করিয়া, দিল্লীতে স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহার একটী ফতেগড় মনুমেন্ট সমীপে দেখিতে পাওয়া যায়; অপরটী এইখানে কোনও অর্দ্ধভগ্ন উচ্চপ্রাসাদশিখরে প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্দেশবাসিগণ ইহাকে ফিরোজ সাহের 'লাট' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। আমরা এই সকল দর্শনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যালোকের সহিত দিল্লী-দরজা পথে দিল্লীতে পুনঃপ্রবিষ্ট হইলাম।

প্রত্যাবর্ত্তন।

এইখানে আমার ভ্রমণকাহিনী সমাপ্ত হইল। আজ ১৬ই ফাল্গুন,—আমার পশ্চিমভ্রমণের শেষ দিন। বাসায় যাইয়া আহারাদির পর সহৃদয় আশ্রয়দাতার নিকটে বিদায় গ্রহণ করি-

লাম। তারপর ষ্টেসনে আসিয়া রাত্রি সাড়ে আটটার গাড়ীতে আরোহণপূর্ব্বক বেনারস অভিমুখে ছুটিয়া চলিলাম। পর দিবস অপরাহ্নে গাড়ী বারাণসী পৌঁছিল। সেখানে একরাত্রি মাত্র বিশ্রামলাভান্তর তৃতীয় দিবসেই পুনরায় কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে হইল। গ্রাণ্ডকর্ড লাইনে, বারাণসী হইতে গয়ার পথে শোণনদের উপর আড়াইমাইল-ব্যাপী দীর্ঘ লৌহসেতু একটী বিশেষ দেখিবার সামগ্রী বটে। আয়তনে এই পুল সমগ্র ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। তখন সবে মাত্র এই লাইন নূতন খোলা হইয়াছে; পর্ব্বতের পর পর্ব্বতমালাবেষ্টিত প্রান্তরের মধ্য দিয়া বহুতর সুদীর্ঘ টনেল ও সেতুবন্ধ অতিক্রম পূর্ব্বক ১৯ শে ফাল্গুন বেলা সাতঘটিকার সময় গাড়ী হাবড়া পৌঁছিল।

চিরাতপসন্তপ্ত উপলখণ্ডময় পশ্চিমপ্রদেশভ্রমণান্তে, বহু দিন পর সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির বৃক্ষপল্লবাদিশোভিত শ্যামল-কান্তির শীতলছায়াময়ভাব বড়ই শান্তিস্নিগ্ধ বোধ হইতেছিল।
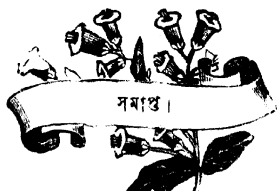
উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।

যাত্রা।

অতীত গৌরবের লীলাভূমি উত্তরভারত পর্য্যটন করিতে, বাঙ্গালীমাত্রেরই প্রাণ ব্যাকুলিত হইয়া উঠে। যে আর্য্যগৌরব-শিখা এককালে এসিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপখণ্ডকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা আজ নির্ব্বাণোন্মুখ। কিন্তু তবু সেই নির্ব্বাপিতপ্রায় বহ্নির উজ্জ্বল প্রভায় দিগন্তোদ্ভাসিত। সে দীপ্তিতে আজিও ভারতবাসী একবারে তমসাচ্ছাদিত হইয়া যায় নাই। কৈশোরের বিজড়িত-স্মৃতির তমোময় গহ্বর হইতে বাহির হইয়া, যেইদিন আলোক-পুলকিত জ্ঞান-রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছি, সেইদিন হইতেই হিন্দুস্থানের প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের লুপ্তপ্রায় চিহ্নগুলির দর্শনস্পৃহা আমার মানস-পটে একটু একটু করিয়া জাগিয়া উঠিতেছিল। সুযোগ ও অবসরের অভাবে এতদিন সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই।

বাং ১৩১৩ সনের ১৩ই মাঘ আমার জীবনেতিহাসের এক চিরস্মরণীয় দিন। চিরপোষিতবাঞ্ছাপরিতৃপ্তিকল্পে আজ আমি সকল বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রহণপূর্ব্বক সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে হাবড়ার পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মাঘমাস, পশ্চিমে এ সময় দুরন্ত শীত। কিন্তু আমার উৎসাহ-তরঙ্গে সে সব চিন্তা চূর্ণীকৃত হইয়া কোথায় ভাসিয়া গেল। কলিকাতায় আজ তেমন শীত বোধ হইতেছে না; বরং কিছু কিছু গ্রীষ্মানুভব হইতেছে। আমি হাবড়ার পুলের উপর আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর বক্ষে অসংখ্য পোতাবলীর উপর শত সহস্র আলোকমালা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। নাবিকগণ তরণী লইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিতেছে; আর পুলের উপর দিয়া লোকশ্রেণী সারাদিনের পরিশ্রমের পর পিপীলিকাপালের ন্যায় ষ্টেসনের দিকে উর্দ্ধমুখে ধাইয়া ছুটিয়াছে। বিশ পাঁচশ টাকা মাহিয়ানার কেরাণীবৃন্দ, এই সারাদিনব্যাপী হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর যখন সেতুবন্ধের উপর দিয়া, এই সন্ধ্যাশীকরাসিক্ত প্রাগাগতবসন্ত-মলয়স্পর্শে ললাটের ঘর্ম্মবিন্দু অপনোদন করিতে করিতে, ভাগীরথীর নীলবক্ষে ফুল্লকমলদলসদৃশ অসংখ্য পোতাবলীর মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন দূরপল্লীবাসিনী পরিবারবর্গের প্রিয়মুখচ্ছবি স্মরণ করিয়া, তাহারা কি আরাম ও আনন্দই অনুভব করিতেছিলেন, তাহা কে বলিবে? দূরে—পশ্চাতে কলিকাতার অসংখ্য নররাশির গম্ভীরকল্লোল উত্থিত হইতেছিল। মনে হইল, যেন মানবের কোলাহল ছাড়িয়া, কোন এক অনির্দ্দিষ্ট শান্তি-রাজ্যে ছুটিয়া চলিয়াছি।

হাবড়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। এখানকার নূতন ষ্টেসন-গৃহটী একটী বিরাট-ব্যাপার। এত বড় গৃহ আর কোথাও দেখি নাই। এই তড়িল্লতাবিভূষিত, বহুলোককণ্ঠকূজিত, বিভিন্নপ্রদেশাগতজনপদদলিত গৃহ-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলে, যাত্রীর মনে কি অপূর্ব্ব ভাবেরই উদয় হইয়া থাকে!

আমার প্রথম গন্তব্য স্থান বেনারস। সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ। ৬ নং প্লাটফরমে বোম্বে মেল(Bombay mail,দাঁড়াইয়া বুক ফুলাইয়া, 'ফুস্ ফুস্' রবে সময়ের সংক্ষিপ্ততা জ্ঞাপন করিতেছে। আমি তাড়াতাড়ি টিকিট লইয়া, মাল 'বুক' করিতে গেলাম। কিন্তু হাওড়া ষ্টেশনে মালবুক এক বিরাটকাণ্ড। সামান্য কুলি হইতে আরম্ভ করিয়া Booking clerk পর্য্যন্ত সকলকেই কিছু কিছু দক্ষিণা না দিলে, নিরাপদে মাল 'বুক' করা দুঃসাধ্য। এই সব গোলমালে আমার গাড়ী 'মিস্' হইয়া গেল। আধঘণ্টা পর Umbala Express ছুটিয়া যাইবে। কিন্তু এ সময় যাত্রীকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। দু'দিন পর চন্দ্রগ্রহণউপলক্ষে ৺কাশীধামে স্নান করিয়া পাপপ্রক্ষালন ও পুণ্যার্জ্জন করিতে, সহস্র সহস্র লোক প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়াছে। আমি Express ট্রেণেও স্থান পাইলাম না। অগত্যা আমাকে Punjab mailএর জন্য অপেক্ষা করিতে হইল। পঞ্জাব মেলে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী নাই। আমি অতিরিক্ত মাশুল দিয়া Inter class এর জন্য একখানা Excess fare receipt লইলাম।

তখনও পঞ্জাব মেল ছাড়িতে দুই ঘণ্টা বাকী। কিন্তু গাড়ী প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি ধীরে ধীরে আসিয়া গেটে দাঁড়াইতেই একটী হ্যাটকোটমণ্ডিত কৃষ্ণাঙ্গপুরুষ আমার

হাত হইতে টিকিটখানা ও Excess fare receipt খানা টানিয়া লইল। তারপর প্রভুত্বসূচকস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমি তোমাকে ঢুকিতে দিব না।" আমি একটু অবাক্ হইয়া, ব্যাপারটা কি জানিতে চাহিলাম।

তিনি এবার তাহার প্রভুত্বের মাত্রা ষোলআনারূপ আমাকে বিদিত করিয়া দিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, আমার খুসী।"

আমার ভয়ঙ্কর রাগ হইল; কহিলাম, "তোমার এমত ইচ্ছা হইতে পারে না। দেখিতেছ না আমি মধ্যমশ্রেণীর টিকিট লইয়াছি। পথ ছাড়—ঢুকিতে দাও।"

লোকটা এবার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। আমার সঙ্গে আমার এক ভাইপো ষ্টেসন পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সে কহিল, 'ঘুষি চালান।' আমি একটু অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। লোকটা দেখিতে শুনিতে তেমন বর্ব্বর মূর্খ নহে; অথচ কারণ না দর্শাইয়া কেন এরূপ অসঙ্গত ব্যবহার করিতেছে, কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না। আমি তাহার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা বৃথা মনে করিয়া, ষ্টেসনমাষ্টারের নিকট আসিয়া সকল বিষয় ব্যক্ত করিলাম। ষ্টেসনমাষ্টার খাঁটি সাহেব; তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "ইহার অবশ্য কারণ থাকিবে, বোধ হয় স্থানাভাব হইয়াছে।"

আমি কহিলাম—"সাহেব, এমত হইতে পারে না। এখনও গাড়ী ছাড়িতে অন্যূন দেড় ঘণ্টা বাকী—সমস্ত গাড়ী খালি পড়িয়া রহিয়াছে। তুমি আমাকে একখানা written order দাও।"

সাহেব বলিল,—তাহা আমি সঙ্গত মনে করি না। সে তাহার Duty করিতেছে, আমি কেন Interfere করিব। তুমি যাও, আমার কথা কহিও, নিশ্চয়ই ঢুকিতে দিবে।

আমি সাহেবের এই মৌখিক অনুমতি লইয়া আসিয়া,চেকার সাহেবের নিকট জ্ঞাপন করিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! লোকটা এবারও দৃঢ়স্বরে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিল, "I want written order ; this won't do."

আমার ভাইপো জোর প্রকাশ করিতে বলিল। আমার যেমন রাগ হইয়াছিল, তেমনি কৌতূহলও জন্মিয়াছিল। বিশেষ, এস্থলে জোর প্রকাশ মূর্খতা। আমি পুনরায় আসিয়া সাহেবকে কহিলাম, "The same thing sir, he wants written order."

সাহেব রাগিয়া চটিয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন, "But I won't give you a written order." তারপর লাফাইয়া উঠিয়া হাঁকিলেন "কোন্ হ্যায়।" দরজার নিকট হইতে একটা চাপরাসি আসিয়া হাজির হইল। সাহেব হুকুম দিলেন, "বোলাও তো টিকিট চেকারকো।" চাপরাসি আজ্ঞা লইয়া দৌড়িয়া যাইয়া, লোকটাকে আনিয়া হাজির করিল। চেকারসাহেব দর্পভরে ঘরে ঢুকিয়া, দক্ষিণহস্তে টুপি খুলিয়া সাহেবকে সম্মান প্রদর্শন করিতে করিতে বামহস্তে অতি তাচ্ছিল্যের সহিত আমার হাত হইতে টিকিটখানা লইয়া বলিল, "You see sir, the babu has got a third-class ticket, surely he cannot travel by the Punjab mail train."

এতক্ষণে ব্যাপার কি কিঞ্চিৎ বোধগম্য হইল। আমি Ex

cess fare এর রসিদখানা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"But what do you say to this?"

চেকারসাহেব বোধ হয় সবে মাত্র কার্য্যে ভর্ত্তি হইয়াছেন; তাহার অভিজ্ঞতায় Excess-fare receipt বোধ হয় এই নূতন। তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেলেন, অথচ কিছু বুঝিতে পারিলেন এমত বোধ হইল না। সাহেব তাহাকে "Stupid, nonsense" বলিয়া অনেক গালি দিলেন; তারপর বলিলেন, "Take care for future, you cause trouble to the passengers simply fornothing, you shall have to pay heavily for your conduct if you go on in this way."

মুখচোক চূণ করিয়া, চেকার সাহেব বাহিরে আসিলেন। এবার আর গেটের দিকে না যাইয়া, অন্যত্র কোথায় উধাও হইয়া চলিয়া গেলেন। বোধ হয়, পরাজয়টা বড়ই প্রাণে বাজিয়াছিল।

এদিকে দরজা বন্ধ; তাহাকে আসিয়া খুলিতেই হইবে,—উপায় নাই। আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছু পরে তিনি অন্য দিক দিয়া আর দু'জন সাহেব জুটাইয়া লইয়া আসিয়া হাজির হইলেন। যেন ভুলটা বড়ই নূতন রকমের; যেন ইহাতে এখনও সন্দেহ থাকিতে পারে, এই ভাবে সাহেবদ্বয়কে আমাদের টিকিট দেখিতে অনুরোধ করিলেন। আমি সহাস্যবদনে ঐ সাহেবদের নিকটে তাহার বিজ্ঞতার পূর্ণ পরিচয় দিতে দিতে যাইয়া প্লাটফরমে ঢুকিলাম। আমার ভাইপো সেইখান হইতে বাসাভিমুখে প্রস্থান করিল।

বারাণসীর পথে।

প্লাটফরমে ঢুকিয়াই দেখিলাম, বাঁ'দিকে পঞ্জাব মেল প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পঞ্জাব মেলে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী থাকে না। মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীও উর্দ্ধসংখ্যায় দু'খানা দেওয়া হইয়া থাকে। বাকী পাঁচ সাতখানা গাড়ীর সকলই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী। ইহাদেরই কোন একটীতে 'মেলকার' নির্দ্দিষ্ট আছে। আমি যখন মধ্যম শ্রেণীর একটী কামরা খুলিয়া প্রবিষ্ট হইলাম, তখন প্রায় সকল গাড়ীগুলিই শূন্য। আমি আমার আসবাবপত্রগুলি কুলির মাথা হইতে নামাইয়া, একখানা বেঞ্চির উপর রক্ষা করিলাম; তারপর তার পয়সা চুকাইয়া দিয়া, উপরের একটা হেঙ্গিংবেড নামাইয়া, তথায় শয্যা রচনা করিলাম। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীগুলি অন্যান্য রেলওয়ের প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর তুল্য। এক একটা কামরা নয়, যেন এক একটা বৈঠকখানা ঘর। ঠিক প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীর সেলুনের আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীগুলিও আজকাল এই ধরণে প্রস্তুত করা হইতেছে; তবে মধ্যম শ্রেণীর মত তথায় গদী আঁটা নাই। প্রত্যেক কামরায় আটখানি করিয়া বেঞ্চি; তদ্ব্যতীত চারি কোণে চারিখানা Hanging bed দেওয়া আছে। আমি ইহারই একটীর উপর আমার শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম, কারণ, এই সব বেঞ্চিতে একবার উঠিয়া গা রক্ষা করিতে পারিলে, প্রায়ই ভিড়ের সময়েও যাত্রিকগণের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

আমি শয্যা রচনা করিলাম বটে, কিন্তু শয়ন করিলাম না। ভ্রমণপিপাসা আমার হৃদয়ে এতই বলবতী হইয়াছিল যে, হাবড়া হইতে বেনারস পর্য্যন্ত এই সুদূর পথের তাবৎ দর্শনীয় বস্তুই যতদূর সম্ভব দেখিয়া লইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। গাড়ী ছাড়িবার এখনও একঘণ্টা বিলম্ব আছে। আমি বসিয়া আলোকমালাপরিশোভিত, বহুবিস্তৃত ষ্টেসন-প্রাঙ্গণের চারিদিকে লোকের ব্যস্তসমস্ত ছুটাছুটি দেখিতে লাগিলাম। এমন সময় আর দুটী ভদ্রলোক আসিয়া কামরায় প্রবেশ করিলেন। ইঁহাদের একজন আমারই সমবয়স্ক, বয়স ২৪।২৫ হইবে। ইনি কার্য্যোপলক্ষে দ্বারভাঙ্গা যাইতেছেন। দ্বিতীয়ের বয়স চল্লিশ বৎসরের ন্যূন নহে। ইনি ব্যবসা-উপলক্ষে সীতারামপুর যাইতেছেন। কলিকাতা বাগবাজারে ইঁহার বড় কারবার আছে।

একা একা বসিয়াছিলাম; দু'জন ভদ্রলোক পাইয়া, বেশ গল্পসল্প জুড়িয়া দেওয়া গেল। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই পরস্পরের ভিতর বেশ সৌহৃদ্য স্থাপিত হইল। বয়স্ক ভদ্রলোকটী তাম্বূলদ্বারা আমাদের সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

রাত্রি ৯॥০ ঘটিকার সময় গভীর রোলে চরাচর কম্পিত করিয়া, পঞ্জাব মেল সদর্পে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিল। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও পঞ্জাবমেলে চাপি নাই। বেঞ্চিতে বসিয়া গবাক্ষপথে মস্তক বাহির করিয়া, চারিদিকের শোভা দেখিতে লাগিলাম। ঝঞ্ঝাবাতোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশির মত চারিদিক হইতে আবর্জ্জনারাশি আসিয়া নাকে মুখে পড়িতে লাগিল। কর্ণপটহে বায়ুরাশি প্রবলবেগে আঘাত করিতে লাগিল; মধ্যে মধ্যে

ইঞ্জিনের ধূমরাশি হইতে কয়লার কণিকাসমূহ আসিয়া, চোখে মুখে পড়িতে আরম্ভ করিল। এরূপভাবে আর বসিয়া থাকা বিশেষ নিরাপদ নহে মনে করিয়া, আমি মাথা ভিতরে টানিয়া একটু সরিয়া বসিলাম এবং সঙ্গীগণের সহিত গল্প আরম্ভ করিলাম। রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় গাড়ী একবারে আসিয়া বর্দ্ধমান পৌঁছিল। কখন কোন্ ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া আসিল, তাহা কিছুমাত্র অনুমান করিতে পারিলাম না।

গাড়ী বর্দ্ধমান ছাড়িয়া, পুনরায় আসানসোল অভিমুখে যাত্রা করিল। নিদ্রাদেবী আসিয়া, তাহার কোমলকরস্পর্শে অলক্ষ্যে আমার নয়নদ্বয় চাপিয়া ধরিতেছিলেন। আমিও আর অপেক্ষা না করিয়া, শয্যায় উঠিয়া গা রক্ষা করিলাম এবং নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম লইলাম।

রাত্রি ১টার সময় গাড়ী সীতারামপুর ষ্টেসনে পৌঁছিল। প্রৌঢ় লোকটী নামিয়া গেলেন। প্রৌঢ় বলায় আমার উপর চল্লিশ বৎসরের কেহ রাগ করিবেন না। আজকাল অনেকে এই বয়সে বৃদ্ধত্বে পদার্পণ করেন। আমি ঘুমের ঘোরে তাহাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে পারিলাম না।

গাড়ী যখন মধুপুর পৌঁছিল, তখন জমাদারপ্রবরের তারস্বরে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। জমাদার প্রভু, বৃষভনিন্দিতকণ্ঠে যাত্রিগণকে মধুপুর ষ্টেসনে আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছিলেন। যাহা হউক, আমি উঠিলাম। আমি পথিক; দেশ দেখিতে বাহির হইয়াছি। ঘুমাইয়া যতক্ষণ কাটাইব, ততক্ষণ হয়ত অনেক দেখিয়া শুনিয়া লইতে পারিব, এই মনে করিয়া নামিলাম। দেখিলাম, আমার সঙ্গীয় লোকটী নাক

ডাকাইয়া ঘুমাইতেছেন এবং আরও দু'তিনটী অপরিচিত লোকের ইতিমধ্যে শুভাগমন হইয়াছে। আমি চোখমুখ রগড়াইয়া, একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। এমন সময় একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসিয়া, দরজা ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমি সরিয়া বসিলে, ভদ্রলোকটী যেমন ভিতরে প্রবেশ করিলেন, অমনি কোথা হইতে এক ভীষণ দুর্গন্ধ আসিয়া একবারে আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ভদ্র-লোকটীর বয়স আনুমানিক ৬০ বৎসর। দিব্য লম্বা চৌড়া চেহারা—দেখিলে বাঙ্গালী কি পশ্চিমে বুঝিবার সাধ্য নাই। মাথায় কাল 'ক্যাপ',গায়ে লম্বা কোট,পায়ে চটিজুতা। দেখিলাম, পায়ে এক ভীষণ ক্ষত; তাহাতে 'আইডফরম' মাখান। তথা হইতেই এই দুর্গন্ধ নিঃসারিত হইতেছে। মনটা বড়ই দমিয়া গেল, ভদ্রলোকটী আসিয়াই আমার বিপরীতদিকস্থ স্লিপিং বেড্‌টী দখল করিয়া বসিলেন। এদিকে গাড়িও ছাড়িয়া দিল।

আমি কাপড়ে নাসিকা মণ্ডিত করিয়া,পুনরায় প্রকৃতির নিশীথ-শোভা দর্শনাভিলাষে গবাক্ষপথে মস্তক বাহির করিয়া বসিলাম। ষ্টেসন ছাড়িয়া গাড়ী 'হু হু' শব্দে চন্দ্রকরপ্রদীপ্ত কচিৎশালতরু-চিহ্নিত সাঁওতালের অনুর্ব্বর প্রদেশ অতিক্রম করিয়া চলিল। ভদ্রলোকটী মধ্যে মধ্যে উঠিয়া আবার নূতন করিয়া ক্ষতস্থানে 'আইডফরম' মাখাইয়া দিতে লাগিলেন। সে উৎকট দুর্গন্ধে আমি একবারে জ্বালাতন হইয়া গেলাম।

গাড়ী বৈদ্যনাথ ষ্টেসনে ধরে না। তথাপি গতিশীল গাড়ী হইতে বৈদ্যনাথের শোভা যতদূর দেখিতে পাইলাম, তাহাতে বড়ই মনোরম বোধ হইল। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়,

মধ্যে মধ্যে প্রশস্ত উপত্যকাভূমি—যেন স্বাস্থ্য সশরীরে এখানে ক্রীড়া করিতেছেন। যখন গাড়ী ঝাঝা ষ্টেসনে পৌছিল, তখন জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীতে প্রকৃতির এক বিরাটদৃশ্য নয়ন-সমক্ষে প্রতিফলিত হইল। রাত্রিতে ঝাঝার শোভা অতি মনোহর—অতি গম্ভীরভাবব্যঞ্জক। ষ্টেসনটী একটী তুঙ্গ পর্ব্বতমূলে স্থাপিত। যতদূর বুঝা গেল, ইহা একটী সমৃদ্ধিশালী ষ্টেশন। পর্ব্বতমূলে ষ্টেসনের ঘরবাড়ীগুলি কেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষিত হইতেছিল; তাহা না দেখিলে ঠিক হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। সমস্ত পাহাড়টা যেন একটা প্রকাণ্ড নিদ্রিতা রাক্ষসীর মত উবু থাইয়া পড়িয়া আছে। ঝাঝা হইতে গাড়ী ছাড়িলে, আমি আবার আসিয়া শয়ন করিলাম।

রাত্রি ৫টার সময় মোকামায় গাড়ী পৌছিলে, আমার দ্বিতীয় বন্ধুটীও নামিয়া গেলেন। তাঁহাকে এখানে নামিয়া, B. N. W. Ry. ধরিতে হইবে। যাইবার সময় তিনি আমাকে ঘুমাইতে দেখিয়া, আমার কর্ত্তব্যকার্য্যে ক্রটী হইতেছে বিবেচনায়, বোধ হয় একটু ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন; তাই খুব জোরে হঠাৎ একটা ধাক্কা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'উঠুন মহাশয়, আমি চলিয়া যাইতেছি।' কিন্তু তখন আমার চক্ষু ঢুলু ঢুলু করিতেছিল, ভদ্রতা রক্ষা করার বা খাতির আঁটিবার সময় ছিল না—আমি নিমীলিতচক্ষে তাঁহাকে কোনরূপ বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া পুনরায় চক্ষু মুদিলাম।

প্রভাতে ৭ ঘটিকার সময় যখন গাড়ী পাটনা পৌছিল, তখন উঠিয়া নীচে বসিলাম। এখান হইতে বাঙ্গালার সাদৃশ্য দূর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আর সেই শ্যামলবৃক্ষরাজিপরিশোভিত

গ্রাম দৃষ্ট হয় না। চারিদিকে কেবল মৃত্তিকাময় গৃহসমষ্টি লক্ষিত হইতেছে। হরিৎবর্ণের ধান্যক্ষেত্রের পরিবর্ত্তে যব, গোধূম ও অরহর বৃক্ষসকল ইতস্ততঃ বায়ুভরে একটু একটু দুলিতেছে।

পাটনা সহরটী তেমন প্রশস্ত নহে, তবে খুব লম্বা বটে। পাটনা, দানাপুর ও বাঁকিপুর, একই লাইনে একত্র গ্রথিত তিনটী সহর। দানাপুর ষ্টেসনে গাড়ী পৌঁছিলে, দলে দলে জমাদারগন বাল্তি ভরিয়া জল আনিয়া, যাত্রীদিগকে হাত মুখ ধোয়াইতে লাগিল। একটী বৃদ্ধ আসিয়া বড়ই আগ্রহের সহিত আমাকে নামিয়া হাতমুখ ধুইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। আমি প্রথমতঃ কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম; কিন্তু পরে যখন স্পর্শ করিয়া বুঝিলাম এ শীতল নহে, গরমজল এবং যখন জমাদার-প্রবর আরও কিছু অতিরিক্ত আগ্রহসহকারে একটী দাঁতন পর্য্যন্ত আমার হস্তে তুলিয়া দিলেন, তখন বুঝিলাম এ অযাচিত ভদ্রতার পরিবর্ত্তে আমাকে কিছু দক্ষিণা দিতে হইবে। আমি উত্তমরূপে হাতমুখ ধুইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম ও তাহাকে একটী পয়সা বক্সিস্ দিলাম। সে হাত তুলিয়া আমাকে মহারাজ উপাধিতে বিভূষিত করিয়া, অন্যত্র চলিয়া গেল।

এইরূপ অযাচিত ভদ্রতা পশ্চিমের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় অসহায় লোকগুলি যদিও এইরূপ নানা ফন্দীতে আমাদের নিকট হইতে পয়সা বাহির করিয়া লইতে চেষ্টিত হয়, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এজন্য যাত্রিগণ অনেক অসুবিধার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। সামান্য ২।১ পয়সা ব্যয়ে, সময় সময় এমত মহৎ উপকার সাধিত হয় যে,

তখন এক পয়সার পরিবর্ত্তে সন্তুষ্টচিত্তে কেহ কেহ বেশী দিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না।

গাড়ী আরা ও বক্সার হইয়া দিবা ১০ ঘটিকার সময় মোগলসরাই পৌছিল। বক্সার একটী ঐতিহাসিক স্থান। এইখানে বাঙ্গালার শেষ নবাব মীরকাশিম আলি খাঁ শ্বেতাঙ্গ বণিকের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। সে রণস্থলদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

মোগলসরাই ষ্টেসনে আমাদিগকে গাড়ী বদলাইয়া আউড্ রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে চাপিতে হইবে। গাড়ীতে আসিতে আসিতে এতক্ষণ যাহা দেখিতে পাইয়াছি, তাহাতে বেশ অনুমিত হইল যে, এ অঞ্চলে জলকষ্ট অতি প্রবল। পুষ্করিণী কিম্বা সরোবর ক্বচিৎ কোথাও দৃষ্ট হয়। লোকেরা সাধারণতঃ কূপের জল ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রান্তরের ভিতর এই সকল কূপ খনন করা হয়। এক একটী কূপের জলে হয়ত এক একটী পল্লীগ্রামের প্রাণরক্ষা হইয়া থাকে। কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য সাধারণতঃ দুই রকম কল ব্যবহৃত হয়। কোথাও বা কূপের দড়ির সঙ্গে গরু জুড়িয়া তদ্দ্বারা টানিয়া তোলা হয়; কোথাও বা একটী বৃক্ষের শাখার উপরে একটী বাঁশ, লিভারের মত স্থাপন করিয়া, তাহার মাথায় দড়ি সংলগ্ন করিয়া, তাহাতে বাল্তি জুড়িয়া দেওয়া হয়। এদেশে লোকে বহুল পরিমাণে গরু ও মহিষ পালন করিয়া থাকে, এবং এখান হইতেই কামিনীগণের অবগুণ্ঠনসীমা অনেকটা খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে। শস্যের মধ্যে মটর, গোধূম ও অরহরই অধিক।

মোগলসরাই নামিয়া, বেনারসের গাড়ীতে উঠিলাম। এখান হইতে বেনারস মাত্র ৯ মাইল দূরবর্ত্তী। আর কতক্ষণ পরেই হয়ত আমার চক্ষের সম্মুখে হঠাৎ কি এক স্বর্গীয় শোভা ফুটিয়া উঠিবে। হিন্দুর পবিত্রতীর্থ কাশীধাম যেমনি পবিত্র স্থান, তেমনি মনোরম সহর। আমি আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলাম। কতদিনের আশা আজ ফলবতী হইবে!

গাড়ী ছুটিয়া চলিল। আমি উৎসুকনেত্রে সম্মুখদিকে নেত্রপাত করিয়া রহিলাম। কতক্ষণ পরে হঠাৎ শ্যামল বিটপিশ্রেণীর ভিতর দিয়া দূরে 'অগ্নিশিখার মত কি এক অপূর্ব্ব' শোভা ফুটিয়া উঠিল! হায়, এ শোভা যে না দেখিয়াছে, তাহার পৃথিবীতে কিছুই দেখা হয় নাই;—যিনি এ শোভা দর্শন করিয়াছেন, তিনি স্বর্গ-শোভা দর্শন করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

ক্রমে আমাদের গাড়ী ডফ্‌রিন ব্রিজের উপর আসিয়া আরোহণ করিল। এখান হইতে ৺কাশীর শোভা অপূর্ব্ব। সে উজ্জ্বল ছবি চিত্রকরতূলিকারঞ্জিত কল্পনারাজ্যবৎ অপরূপ সৌন্দর্য্যপ্রভাসমন্বিত। কবির কল্পনা এখানে মূক। ভাষায় এ সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতে পারা যায় না। নীচে স্বচ্ছসলিলা নীলাম্বরা ভাগীরথী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে এই পবিত্র পুরীর প[illegible]ধৌত করিতে করিতে প্রবাহিতা হইতেছেন; ঊর্দ্ধে নীল[illegible]র শত সহস্র দেবালয়ের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া ন্যস্ত হইয়াছে। সকলের উপর কোন মসজিদের মিনারদ্বয় সগর্ব্বে আকাশ ভেদ করিয়া, হিন্দুতীর্থে মহম্মদীয় ভূপতির অত্যাচারের পরিচয় দিতেছে। ইতস্ততঃ নবোদিত ভানুর তরুণকিরণমালা পতিত হইয়া,

কোথাও 'চিকিমিকি' কোথাও 'ঝিকিমিকি' করিতেছে; আর প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চসৌধমালার ধবলচ্ছবি, সে আলোকতরঙ্গে কি অপার্থিব উজ্জ্বল্য ধারণ করিয়াছে, তাহা আমি কিরূপে বর্ণনা করিব!—যেন সাগরজলে কে একখানা রৌপ্যময়ী দেবী-প্রতিমা সাজাইয়া রাখিয়াছে। আমি ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিলাম।

পুল পার হইয়া কাশী ষ্টেসন। এতদ্ব্যতীত কাশীধামে দ্বিতীয় আর একটী ষ্টেসন আছে, তাহার নাম বেনারস-কেণ্টনমেণ্ট। আমি কেণ্টনমেণ্টে আসিয়া নামিলাম। কেণ্টন-মেণ্ট ষ্টেসন খুব বড় ষ্টেসন। এখানে মিটারগজের বি, এন্, ডবলিউ রেলওয়ে আসিয়া যোগ হইয়াছে। ষ্টেসনের একধারে আউড রোহিলখণ্ড ও অন্যধারে বি, এন্, ডবলিউ, আর, অপেক্ষা করিয়া থাকে। লাইনের উপর দিয়া অতি প্রশস্ত ও বৃহৎ একটী সেতু (over-bridge) নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সেতু পার হইয়া, আমরা যখন আসিয়া রাস্তায় পড়িলাম, তখন এক অভি-নব দৃশ্য আমার নয়ন-সম্মুখে পতিত হইল।

বাঙ্গালায় যেমন ঘোড়ার পাল্কীগাড়ী প্রচলিত আছে, পশ্চিমে সেরূপ নহে। তথায় সর্ব্বত্র একাগাড়ী প্রচলিত। পাল্কীগাড়ী বা অন্যরূপ ভাল গাড়ীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। একটীমাত্র ঘোড়ার পশ্চাতে কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ডসম্মিলনে একটী মঞ্চাকার গাড়ীর আবির্ভাব আমার চক্ষে এই নূতন। পূর্ব্বে অনেকবার একাগাড়ীর নাম শুনিয়াছি; কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আর কখন তাহাদের রূপরাশি চক্ষে প্রত্যক্ষ করি নাই। অদ্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। বলিতে কি, এই প্রচণ্ড রৌদ্রে কি করিয়া লোক-

নগরীর মধ্য দিয়া এই অদ্ভুত-রথে আরোহণ করিয়া যাইব, তাহা ভাবিয়া বড়ই বিব্রত হইলাম। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটী ছোট মঞ্চের উপর চারি কোণে চারিটী দণ্ড রক্ষিত হইয়াছে। সেই দণ্ড-চতুষ্টয়ের উপর দেড় হাত দীর্ঘ ও এক হাত প্রশস্ত একটী চাঁদোয়া, তন্নিম্নে কাষ্ঠাসনের উপর ময়লা কাপড়ের একটী গদী ও গাড়ীর পিছনে একটী ছোট পর্দ্দা বিরাজ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত একার আর বিশেষ কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই। বলা বাহুল্য, আমি কিছুতেই এ হেন মঞ্চে আরোহণ করিয়া সহরে প্রবেশ করিতে সাহসী হই নাই। অগত্যা আটআনা দিয়া একটী অর্দ্ধভগ্ন পাল্কীগাড়ী ভাড়া করিয়া, আমাদের দেশীয় কোন ভদ্র-লোকের বাসায় পৌঁছিলাম।

বারাণসী।

বরণা ও অসি নদী, কাশীর পূর্ব্ব পশ্চিম দুই প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়া, ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে; ইহা হইতেই বারাণসীনামের উৎপত্তি। বারাণসী অতি প্রাচীন তীর্থ স্থান। কথিত আছে, অতি পুরাকালে এই নগরী শিবের ত্রিশূলের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ নানারূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, তিনসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে যখন আর্য্যজাতি প্রথম এদেশে আসেন, সেই সময় বারাণসী তাঁহাদের কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। তাহা হইলে হরিশ্চন্দ্র রাজার সময় দূরে থাকুক, পাণ্ডবদিগের সময়ও ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয়। আমি যাঁহার বাসায়

উপস্থিত হইলাম, তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তবে আমার জ্যেঠা মহাশয় এখানে কতকদিন বাস করিয়াছিলেন; তদ্দ্বারাই আমরা উভয়ের নিকট উভয়ে পরিচিত। কাশীতে অনেক ছত্র আছে। এই সকল ছত্রে গরীবলোকদিগের আহারের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। নানাদেশীয় দয়াশীল সমর্থ ব্যক্তিগণ, এই ছত্রগুলির প্রতিষ্ঠাতা। এই ছত্রগুলি ব্যতীত যাত্রীদিগের সুবিধার্থ আর কতকগুলি হাওলী আছে। যাঁহারা এই সকল হাওলীর মালিক, তাঁহারা সর্ব্বদা এস্থানে বাস করেন না। যাহাতে যাত্রিগণ নিজ নিজ পয়সা ব্যয় করিয়াও থাকিবার স্থান পায়, তাহার জন্য তাঁহারা কোনও ব্রাহ্মণের তত্ত্বাবধানে এই সকল বাড়ী রক্ষা করিয়া থাকেন।

আমি যাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, তাঁহার নাম নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল। ঘোষাল মহাশয় এই শ্রেণীর একজন তত্ত্বাবধায়ক। যাত্রী গ্রহণ করিয়া তিনি বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, এবং এই উপায়ে বেশ সঙ্গতিও করিয়াছেন।

আমি যখন তাঁহার বাসায় উপস্থিত হই, তৎপূর্ব্বে এই হাওলীসম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা ছিল, বাসায় পৌঁছিয়া তেমন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। জ্যেঠা মহাশয় গল্প করিতেন, 'অতি সুন্দর বাটী, যেন শান্তিধাম; নানারূপ সুবিধা রহিয়াছে, কোন কিছুর জন্য নীচে নামিতে হয় না।' এই সকল গল্পশ্রবণান্তর অন্ধকারময়, নানাআবর্জ্জনাপূর্ণ, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোঠাসমন্বিত একটী অর্দ্ধভগ্ন বাটী, আমার চক্ষে বড়ই অপ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল।

যাহা হউক, দোতালার উপর উঠিয়া একটু হাঁফ ছাড়া

গেল। বাটীর এই অংশটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। ঘোষাল মহাশয় বোধ হয়, আমার এই বিষাদময় ভাব দেখিয়াই, আমাকে একবারে তেতালায় লইয়া গেলেন। অতি সঙ্কীর্ণ জীর্ণশীর্ণ সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিবার সময়, আমার বড়ই আশঙ্কা হইতেছিল। ত্রিতলে উঠিয়া দেখি, তথায় দুইটী ঘর। ঘর দুইটী অল্প পরিসর হইলেও বেশ পরিষ্কার; চারিদিকে হাওয়া খেলিতেছে। তবে বড় গরম,—প্রচণ্ড ভাস্করকরে উত্তপ্ত—যেন চারিদিকে আগুন ছুটিতেছে। শীতকাল বলিয়া, আমি উহা তত গ্রাহ্য না করিয়া, একটী ঘর দখল করিয়া বসিলাম। ঘরের সম্মুখে দোতালার ছাদ; বেশ একটু খোলা খোলা বোধ হইতে লাগিল।

ঘোষাল মহাশয়ের পরিবারের মধ্যে ৪।৫টী লোক। এতদ্ব্যতীত ২।৪ জন দাসদাসী আছে। ঘোষাল মহাশয়ের কন্যা 'পুঁটী' যেন একখণ্ড ভস্মাচ্ছাদিত জলন্ত অঙ্গারখণ্ড। তাহার বয়স দশবৎসর হইবে। কিছুমাত্র গাম্ভীর্য্য নাই—কিন্তু বড় দয়াবতী। সে প্রথমতঃ আমাকে দেখিয়া একটু এদিক ওদিক করিল; কিন্তু যেই আমি তাহাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, অমনি সে আসিয়া আমার সঙ্গে কত গল্প জুড়িয়া দিল। তাহার গল্প শুনিতে শুনিতে আমি ঝালাপালা হইয়া গেলাম। অবশেষে সে আমার সঙ্গে পিসি-ভাইপো সম্পর্ক পাতাইয়া, আমার স্নানের জন্য তৈল আনিতে প্রস্থান করিল। কলের জলে আজ বাসায়ই স্নান করিলাম।

স্নানান্তে দিব্য চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া, বিশ্রামার্থ শয্যালাভ করিলাম। রাস্তার পরিশ্রমে আজ আর বিশেষ

কিছু দর্শনলাভ ঘটিয়া উঠিল না। সুর্য্যাস্তের পর একবার মাত্র বাহির হইয়া অদূরেই কোন বাসায় দু'একটি আত্মীয়-লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম। কাশীর রাস্তাগুলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অপরিসর; আর এমন গোলমেলে যে, এই একটু-খানি আসিতে যাইতেই আমাকে যথেষ্ট ঘুরিতে হইয়াছিল। আমি এখানে প্রায় ৭।৮ দিন বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু কখনও রাস্তা ভালরূপ চিনিতে পারি নাই। একদিন অপরাহ্নে ভ্রমণ করিতে করিতে এমন দিশাহারা হইয়া গিয়াছিলাম যে, অনেক জিজ্ঞাসা-বাদ করিয়াও বাসা বাহির করিতে পারি নাই। পরে কোন বাঙ্গালীযুবকের অপরিসীম যত্ন ও চেষ্টায় কোনরূপে বাসায় পৌঁছিয়াছিলাম; এমন নাকাল কখনও হইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

সহরের ভিতর সবেমাত্র ৭।৮টি ভাল প্রশস্ত রাস্তা আছে। এতদ্ব্যতীত প্রায়ই ছোট ছোট গলি—কোথাও নীচু হইয়া গিয়াছে, কোথাও পাহাড়ের মত উপরে উঠিয়াছে; কোথাও কতদূর সরল-ভাবে চলিয়াছে, আবার স্থানে স্থানে আঁকিয়া বাঁকিয়া, দু'তিনটা একত্র মিশিয়া পথিককে দিশাহারা করিয়া দিতেছে। রাস্তা গুলি প্রায়ই প্রস্তরমণ্ডিত; তাহার দুইধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অতি উচ্চ অথচ অন্ধকারাচ্ছন্ন পাষাণমণ্ডিত সৌধাবলি গগন ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও গলির উপর পথিকের মাথার উপর দিয়া ছাদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক দু'ধারের ঘরগুলি সম্মিলিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অদ্য মঙ্গলবার, ১৫ই মাঘ। প্রাতে উঠিয়াই দেখি, বহুযাত্রীর সমাগম হইয়াছে। ঘোষাল মহাশয়, রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই

ষ্টেসনে যাইয়া, বহু যাত্রী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। অদ্য গ্রহণ। কাশীধামে লোক ধরে না; প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, লোক স্নান করিতে আসিয়াছে। আমি আজ কয়েক-জন যাত্রিকের সঙ্গে মিশিয়া গেলাম। বেলা ৯টা বাজিতে না বাজিতে, একজন পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগকে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া গেল। কাশীতে মণিকর্ণিকা সর্ব্বপ্রধান ঘাট। এখানে প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক অবগাহন করিয়া থাকেন; গ্রহণের সময় ত কথাই নাই। অদ্য এমন জনতা হইয়াছে যে, ধাক্কার চোটে কোথাও একটু হাঁফ্ ছাড়িবার অবসর নাই। এই ঘাটের নামের ইতিহাস সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, মহাদেব যখন সতীদেহ বহন করিয়া উন্মত্তাবস্থায় ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছিলেন, তখন ভগবান্ বিষ্ণু আপনার চক্রদ্বারা মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিলে পর, এইখানে সতীর কর্ণাভরণ কুণ্ডল পতিত হইয়াছিল। তাহা হইতে মণিকর্ণিকানামের সৃষ্টি হইয়াছে। কাহারও মতে গল্পটী অন্যরূপ। দেবাদিদেব মহাদেব, আপনার ত্রিশূলোপরি কাশীধাম স্থাপন করিলে পর নারায়ণ এইখানে মহাদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভাগীরথী তখন ত্রিদিবধামে; জলের অসদ্ভাবহেতু তিনি আপন চক্রদ্বারা মৃত্তিকাখননপূর্ব্বক জলোত্তোলন করেন। উহা হইতে নিকটবর্ত্তী চক্রতীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার তপে শিব সন্তুষ্ট হইয়া বর দিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে, বিষ্ণু এই প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যেন সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে অবস্থান করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া মহাদেব এত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন যে, একবারে নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হওয়াতে অকস্মাৎ কর্ণের মণিময় কুণ্ডল ছুটিয়া পড়িয়া যায়। তাহা হইতেই এ স্থানকে মণিকর্ণিকা বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। কোন্ গল্পটী সত্য, পাঠক বিচার করিয়া লইবেন।

আমরা মণিকর্ণিকায় অবগাহন করিয়া, পাণ্ডা মহাশয়দের অর্দ্ধোচ্চারিত অস্পষ্ট মন্ত্রাদি যথাসম্ভব উচ্চারিত করিয়া, উপরে উঠিলাম। এখানে একস্থানে বিষ্ণুর শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত পাদুকাচিহ্ন রক্ষিত হইয়াছে। সন্নিকটেই তারকনাথের মন্দির ও চক্রতীর্থ। তারকনাথের অর্দ্ধাঙ্গ সলিলমগ্ন। চক্রতীর্থ একটী প্রকাণ্ড কুণ্ড। চারিদিকে পাড় বাঁধান; চারিধার হইতেই সিঁড়ি নামিয়া, সলিল স্পর্শ করিয়াছে। একদিকের পাড় এত উচ্চ যে, পাহাড় বলিয়া ভ্রম হয়।

উচ্চ পাড়ের উপর দুর্গপ্রাচীরের মত প্রাচীররক্ষিত বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। নদীর দিকে পাড় নীচু। আমরা এইদিক দিয়া প্রবেশ করিলাম। নিম্নে অতিনিম্নে জল; সে জল এত ঘোলা যে, সলিলমিশ্রিত পাঁক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহার উপর রাশি রাশি ফুল, বেলপাতা নিত্য পতিত হইয়া পচিতেছে। ধন্য হিন্দু নরনারী! এই কর্দ্দমদ্রবের মধ্যে কে অগ্রে স্নান করিবে, তাহা লইয়াই প্রাণপণ করিতেছে। এমন ধর্ম্মপ্রাণ লোক আর কোথায় দেখিয়াছ? আমরা এখানে পুনরায় অবগাহন করিয়া যথাকর্ত্তব্য সমাপনান্তে বিশ্বেশ্বরদর্শনাভিলাষে ছুটিয়া চলিলাম।

কাশীধামে বিশ্বেশ্বর সর্ব্বপ্রধান শিবলিঙ্গ। আজ গ্রহণ, বিশ্বেশ্বরদর্শন আজ বড় সহজ ব্যাপার নহে। তথাপি সাহসে ভর

করিয়া চলিলাম। রাস্তায় লোকের ভিড়ে অগ্রসর হওয়া এক-রূপ অসম্ভব। পথের দু'ধারে রমণীগণ পুষ্পরাশি লইয়া বিক্রয় করিতেছে। ফুলের উপর ফুল—চারিদিকে কেবল ফুল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি ফুলের মালা গ্রথিত করিয়া, এক পয়সা দু'পয়সা বলিয়া' চীৎকার করিতেছে; কখনও আসিয়া যাত্রি-গণকে নানারূপ অনুরোধ করিতেছে। রাস্তার দু'ধারের কোঠাগুলিতে দোকানীরা নানারূপ পণ্যদ্রব্য সাজাইয়া বসিয়া আছে। যেন আনন্দ-বাজার' বসিয়াছে। আমরা বিশ্বেশ্বরের বাটীর নিকট পৌছিয়া, আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিলাম না। এখানে লোকগুলি উন্মত্তের মত ঠেলাঠেলি করিতেছে। অনেকে আহত হইতেছে। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক ছিল। পাণ্ডা আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহে না। আমরা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, ফিরিয়া যাইব মনস্থ করিতেছি, এমন সময় কোন্ পুণ্যফলে জানি না, হঠাৎ আমাদের সম্মুখের ভিড় একদম কমিয়া গেল। অমনি আমরা এক লম্বা দৌড়ে আসিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলাম।

বিশ্বেশ্বরের মন্দির তেমন বড় নহে। মন্দিরপ্রাঙ্গণও অতি ছোট। তবে চারিদিক শ্বেতপ্রস্তরে সজ্জিত। কোথাও কোথাও মেজেতে রৌপ্যমুদ্রা বসাইয়া রাখা হইয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে তিনটী মন্দির। মধ্যস্থিত মন্দিরটীর চারিদিক মুক্ত; ইহারই ডানধারে একটী ছোট মন্দিরে কনকমণ্ডিত বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গ বিরাজ করিতেছে। এই দু'টী মন্দিরের উপরিভাগই সুবর্ণমণ্ডিত। পঞ্জাবসিংহ রণজিৎ এই মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া যান। বিশ্বে-শ্বরের মন্দির, ইন্দোরের প্রাতঃস্মরণীয় অহল্যা বাই কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

হইয়াছিল। লোকে জল, ফুল, বেলপাতা দিয়া লিঙ্গমূর্ত্তি এক-বারে অদৃশ্য করিয়া ফেলিয়াছে। এক কোণে একটী সুগন্ধ প্রদীপ সর্ব্বদাই প্রজ্জলিত। এতদ্ব্যতীত প্রাঙ্গণের চারিদিকে ছোট ছোট ঘরে আরও অনেক দেবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। যাত্রিকেরা উন্মাদের মত উর্দ্ধশ্বাসে এক মন্দির হইতে অন্য মন্দিরে ছুটিয়া যাইতেছে; আর এক একটী দেবতার নিকট উপস্থিত হইয়া, মুহূর্ত্তের ভিতর কতবার মস্তক ঠুকিতেছে, আর একশ্বাসে হয়ত শতসহস্র কামনা ভিক্ষা করিয়া লইতেছে। আমরা সমস্ত প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া, অন্নপূর্ণাদর্শনে গমন করিলাম। অন্নপূর্ণার মন্দির এখান হইতে অতি নিকট। ইহা কাশীর অন্যতম প্রসিদ্ধ দেবমন্দির। বিশ্বেশ্বরের পরে ইহার মত মাহাত্ম্য কাহারও নাই। কাশীতে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা দর্শনই প্রধান কার্য্য।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের প্রাঙ্গণ অপেক্ষাকৃত কিছু বড়। প্রাঙ্গ-ণের একপার্শ্বে ছোট মন্দির, এবং মন্দিরের সম্মুখেই একটী অনতিবৃহৎ নাটমন্দিরগৃহ। এখানে স্তূপাকারে তণ্ডুলাদি জমা হইতেছে। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিক উচ্চ প্রাচীরদ্বারা উত্তমরূপরক্ষিত। প্রাচীরগুলি চিত্রিত; নানারূপ লতা, পাতা ও মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে বৃহৎ গোশালা। এখানে উত্তম উত্তম গাভীসকল পালিত হইতেছে। এই মন্দির বাজিরাও পেশোয়া ১৭২১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত করেন। মন্দিরের ভিতর মা বিশ্বপালিনী অন্নপূর্ণা বিরাজমানা। কিন্তু এ মূর্ত্তি পটচিত্রিত অন্নবিতরণব্যাপৃতা প্রহ্লাদিনীমূর্ত্তি নয়;—এ সুবর্ণমণ্ডিতবদনা প্রস্তরময়ী—ভিন্নরূপিণী।

সেইখান হইতে আমরা বাসায় প্রত্যাগত হইলাম। বাসায় আসিয়া আমাকে কিছু পিতৃকৃত্য সমাপন করিতে হইল।

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ভাগীরথী অভিমুখে অসংখ্য জনস্রোত ধাবিত হইল। চারিদিকে ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে বুঝিয়া, আমরাও বাসা হইতে বাহির হইয়া, সেই জনস্রোতের মধ্যে মিশিয়া গেলাম। সে কি দৃশ্য! তোয়ালে ঘাড়ে ফেলিয়া, নগ্নপদলোকবৃন্দ ঠেলাঠেলি করিতে করিতে, চারিদিকে ভাগীরথীর উদ্দেশে চলিয়াছে। ইতস্ততঃ শঙ্খ ও ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে। সমস্তটা সহরে যেন একটা জয়-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। আতুর, অন্ধ, খোঁড়া, গরীব, দুঃখী সকলে একটী একটী ধামা হাতে করিয়া চাল, পয়সা, সিকিপয়সার উদ্দেশে, পাগলের মত "দে দে" রব তুলিয়া দিয়াছে। এই সব দেখিতে দেখিতে আমরা ভাগীরথীর কূলে পৌছিলাম।

এখানে আর এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। কত দেশবিদেশাগত লোকবৃন্দ পিপীলিকাশ্রেণীবৎ আগাগোড়া সমস্তটা তীর দখল করিয়া রহিয়াছে ও নামিয়া অবগাহন করিতেছে। চারিদিকে জয় জয় রব উঠিয়াছে। পাণ্ডাদের উচ্চকণ্ঠোচ্চারিত মন্ত্রধ্বনি, শঙ্খ ও ঘণ্টানিনাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া, কি অপূর্ব্ব ভাবেরই সমাবেশ করিয়া তুলিয়াছে! অসংখ্য আলোকমালা তারার মত 'নিবু নিবু' করিয়া ইতস্ততঃ জ্বলিতেছে; আর তাহাদের ক্ষীণ রশ্মিগুলি অবগাহনতাড়িত সলিলরাশির তরঙ্গভঙ্গে মুক্তারাশির সৃষ্টি করিতেছে।

আমরা স্নান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি, এক মহাব্যাপার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যাত্রিকগণ বস্ত্র, তণ্ডুল ও

টাকাপয়সায় দানের ডালা সাজাইয়া, সারি সারি বসিয়া গিয়াছে ও ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন।

কতক্ষণ পর গ্রহণত্যাগ হইলে, পুনরায় মুক্তিস্নান করিয়া, আহারাদিপূর্ব্বক আমরা সেদিনকার মত নিশ্চিন্ত হইলাম।

১৬ই মাঘ বুধবার রাত্রিপ্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, একা একাই সহর দেখিতে বহির্গত হইলাম। প্রথমে নদীতীরে যাইয়া হাজির। ইতিপূর্ব্বে পাঠককে এস্থান সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি। নদী হইতে পাড় এত উঁচু যে, মনে হয় কোন পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীতীরে পাহাড়ের উপর এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। তীরের সর্ব্বত্র পাষাণনির্ম্মিত সিঁড়ি। ঘাটের উপর ঘাট,—একটু স্থান ফাঁক পড়িয়া নাই। কাশীতে অন্যূন ৬৪ চৌষট্টিটী ঘাট আছে। তন্মধ্যে মণিকর্ণিকা, দশাশ্বমেধ, পঞ্চগঙ্গাঘাট, রাজঘাট ও অসিঘাটই প্রসিদ্ধ। দশাশ্বমেধঘাটে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই ইহার নাম দশাশ্বমেধ হইয়াছে। পঞ্চগঙ্গাঘাট পাঁচটী নদীর সম্মিলনস্থান বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহাদের নাম যমুনা, সরস্বতী, গঙ্গা, ধূতপাপা ও কীর্ণা। গঙ্গা ব্যতীত বাকী চারিটীই অন্তঃসলিলা। এই ঘাটের উপরই বিন্দুমাধবের প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল। আওরঙ্গজেব সে মন্দির ভগ্ন করিয়া, সে স্থলে এক বৃহৎ মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া যান। মসজিদের মিনার বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই আওরঙ্গজেবই বিশ্বেশ্বরের পুরাতন মন্দির ভগ্ন করিয়া, তন্নিকটে আর একটী মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সে মসজিদ এখনও বর্ত্তমান আছে। আমরা বিন্দুমাধবের ধ্বজায় (পাণ্ডাগণ মসজিদের মিনারদ্বয়কে বিন্দুমাধবের

ধ্বজা বলিয়া শান্তিলাভ করে) আরোহণ করিয়া, এই মসজিদ দেখিতে আসিলাম। ইহারই সম্মুখে জ্ঞানব্যাপী কূপ। হিন্দুগণ এই কূপের জলকে অতি পবিত্র বলিয়া গ্রহণ করে। কথিত আছে, মুসলমানের ভয়ে পাণ্ডাগণ পুরাতন বিশ্বেশ্বরকে এই কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা চলিয়া গেলে পর, স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া,কোন পাণ্ডা নর্ম্মদাকূল হইতে বিশ্বেশ্বরকে উদ্ধার করিয়া, বর্ত্তমান মন্দিরে স্থাপিত করেন। এই মন্দির পুরাতন মন্দিরের অতি নিকট। এই কূপের উপর লোহার তার দিয়া, একটী ছাদ তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অসিসঙ্গমঘাটে ভাগীরথী আসিয়া, অসিনদীর সহিত মিলিতা হইয়াছেন। এইরূপ বরণা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলকে বরণাসঙ্গম ঘাট বলিয়া অভিহিত করা হয়। শিবালয়ঘাটের উপর মহারাজা চৈৎসিংহের বাসভবন ছিল। সে ভবন আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। হেষ্টিংসের অত্যাচারে মহারাজ যে ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে গবাক্ষপথ আজও নষ্ট হইয়া যায় নাই। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আবার একখানা খোদিত প্রস্তর (Tablet) দেওয়ালে সন্নিবিষ্ট করিয়া, সে অত্যাচারের স্মৃতি চিরজাগরিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল দর্শন করিয়া আমি সেদিনকার মত প্রত্যাগমন করিলাম।

কাশীতে দেবমন্দির ও দেবতার সংখ্যা এত অধিক যে, তাহার বিবরণ সবিস্তার বর্ণনা করিতে গেলে, পাঠক বা লেখক কাহারই ধৈর্য্য থাকিবে না। ইঁহাদের মধ্যে বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা, কেদারেশ্বর, বটুকভৈরব, বৈদ্যনাথ, কামাখ্যা, কালভৈরব, দণ্ডপাণি, তিলভাণ্ডেশ্বর, সঙ্কটা ও শনিদেব এই সকলই প্রধান

এখানকার দুর্গাবাড়ী, রাণী ভবানীর স্থাপিত। কাশীতে রাণী ভবানীর অসংখ্য কীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এমন দয়াশীলা ও পুণ্যশীলা রমণী ভারতে বিরল। এখানকার লোকেরা তাঁহাকে মহামায়ার অংশসম্ভবা বলিয়া মনে করে। দুর্গাবাড়ীতে প্রত্যহ ছাগ বলি হইয়া থাকে। কাশীর অন্যত্র কুত্রাপি বলি হইতে পারে না। এখানে বানরের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; কিন্তু উহারা যাত্রিগণের উপর কিছুমাত্র অত্যাচার করে না। বৃহস্পতি-বার প্রাতে উঠিয়া, আমরা এই সকল কিছু কিছু দর্শন করিলাম। পাণ্ডার চাকর বুদ্ধো, আমাদিগকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এ সকল দেখাইতে লাগিল। বুদ্ধোর পায়ে বুটজুতা, গায়ে ছেঁড়া জামা, পরণে ময়লা ধুতি। লাঠি হাতে ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে, সে অর্দ্ধবাঙ্গালা, অর্দ্ধহিন্দিতে আমাদিগকে সকল কথা বুঝাইতে লাগিল। পরে আমরা হিন্দুকলেজ, গবর্ণমেণ্ট কলেজ ও মান-মন্দির দেখিতে গমন করিলাম। হিন্দুকলেজ, আনিবেসেণ্টের এক মহতীকীর্ত্তি। কত রাজা জমিদারের অর্থে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আনিবেসেণ্ট, হতভাগ্য ভারতবাসীর জন্য ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া, এই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ভারতবাসী তাঁহার এই অযাচিত উপকারের কি প্রতিশোধ দিবে? যিনি এ সংসারে সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি তাঁহাকে এই দীন-দরিদ্র ভারতে দয়াময়ী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার যোগ্য পুরস্কারদানে একমাত্র সমর্থ পুরুষ;—তিনিই তাঁহার মঙ্গল করিবেন।

এই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে সেই ঘরের প্রতিষ্ঠা-তার নাম লিখিত রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের সম্মুখে বিস্তীর্ণ

ময়দান। তথায় ছেলেদের খেলিবার ও ব্যায়ামাদি শিক্ষার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের উপরের তলে একটী হলে অনেক চিত্রাদি রক্ষিত আছে। এই বৃহৎ হলের এক পার্শ্বে একটী বেদী। ইহারই উপরে ছাদের নিকট একটী জানালার মুখে, কাচের উপর বীণাপাণি সরস্বতীর প্রতিমূর্ত্তি সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। এই তলেই আর এক পার্শ্বে আর একটী বৃহৎ হলে সভা-সমিতি হইয়া থাকে।

কলেজের পশ্চাতেও একটী ছোট মুক্ত প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণের মাঝখানে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত নানাকারুকার্য্যখচিত একটী ছোট মন্দির। মন্দিরে কাহারও প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত নাই, কখনও হইবে কি না, তাহাও জানিতে পারি নাই। এই প্রাঙ্গণেরই বাঁ'দিকে একটী ছোট দরজা অতিক্রম করিয়া, বোর্ডিং হাউসে ঢুকিতে হয়। বোর্ডিংটী অতি বিস্তৃত। এখানকার বন্দোবস্তও অতি চমৎকার। একটী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলাম, এখানে সর্ব্বশুদ্ধ ১২০টী ছেলে থাকিতে পায়। নিরামিষ আহারীদের জন্য ১২৲ ও আমিষাহারীদের জন্য ১৬৲ টাকা মাসিক খরচ ধার্য্য আছে। যতদূর বুঝিতে পারিলাম, বাসস্থান, আহার ও অন্যান্য বন্দোবস্ত বেশ পরিপাটী।

এখান হইতে আমরা বিলাসপুরের রাজার বাটী ও নেপালের রাণীর বাসভবন দর্শন করিয়া, গবর্ণমেণ্টকলেজ বা কুইন্স কলেজ দেখিতে গেলাম। মৃজাপুরের প্রস্তরনির্ম্মিত এই সুন্দর বাটী অতি চারু কারুকার্য্যভূষিত। ভিতরে নানারূপ বহুমূল্য কাঠের কাজ রহিয়াছে। কলেজের চতুর্দ্দিকে বাগান।

এখান হইতে আমরা জয়পুরাধিপতি দ্বিতীয় জয়সিংহ-প্রতিষ্ঠিত

মানমন্দিরদর্শনার্থে তথায় উপস্থিত হইলাম। মহারাজ জয়সিংহ জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি জয়পুর, দিল্লী, মথুরা উজ্জয়িনী ও বেনারস এই পঞ্চনগরীতে পাঁচটি মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যান। আজকাল উহারা একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলেও, প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষের লুপ্ত গৌরবের সাক্ষ্য দেয়। হিন্দুজ্যোতিষ, অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রের ন্যায় আলোচনার অভাবে ও কালের কঠোর আঘাতে এইভাবে বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। এখানে আমরা যন্ত্রসামন্ত, চক্রযন্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি প্রস্তরগঠিত যন্ত্রের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

পরদিন শুক্রবার প্রত্যূষে উঠিয়াই আমরা কয়েকজন ব্যাস-কাশী দেখিবার জন্য নদীর অপরতীরে যাত্রা করিলাম। বলা বাহুল্য, বুড়ো লাঠিহস্তে বুট পায়ে আমাদের সঙ্গে চলিল। নৌকা-যোগে আমাদিগকে নদী পার হইতে হইল। পার হইতে হইতে আবার প্রাণ ভরিয়া কাশীর সেই চিরনূতন তটশোভা দর্শন করিয়া ধন্য হইলাম। পরপারে পৌঁছিয়া প্রায় অর্দ্ধমাইলব্যাপী বালুকা-সৈকত অতিক্রম করিয়া গ্রামে ঢুকিতে হইল। এই গ্রাম্যপথে প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, আমাদিগকে ব্যাসদেবের আশ্রমে পৌঁছিতে হইয়াছিল। হরি, হরি, হরি; এই কি ব্যাস-দেবনির্ম্মিত কাশীধাম? দেবতার সঙ্গে গর্ব্ব করিয়া ব্যাসদেব এইখানে দ্বিতীয় কাশী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? হায়! তাঁহার সে গর্ব্ব [illegible] খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে! একটীমাত্র সামান্য মন্দির [illegible] ব্যাসকাশীর অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। উহাও তেমন [illegible] নহে; পুরাতন মন্দিরের উপর নূতন

মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাতনের কিছুই নাই। সম্মুখে একটী পুষ্করিণী। উহাতে জল অতি অল্প ও অপরিষ্কার। মন্দিরের ভিতর মহাদেবের লিঙ্গ স্থাপিত। ইহাই ব্যাসদেব-স্থাপিত লিঙ্গমূর্ত্তি বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘাসদূর্ব্বাশূন্য সমতলভূমি। মাঘমাসের প্রথমভাগে এখানে রামলীলা উপলক্ষে মেলা হয়। তাহার কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। এই সময় এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

এখান হইতে আমরা কাশীরাজের রাজধানী রামনগর রওয়ানা হইলাম। রামনগরের দুর্গাবাড়ীর মন্দিরটী অতি প্রকাণ্ড; বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই মন্দিরের বাহিরেই বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা। ইহার চারিপাড় প্রস্তরসোপানময়। ইহারই পার্শ্বে রাজার উপবন। উদ্যানের মাঝখানে চারিদিক খোলা মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত হাওয়া খাইবার ঘর। ইহার কারু-কার্য্য অতি চমৎকার। দূর হইতে গজদন্তনির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। শুনিলাম, রামলীলার সময় এখানে বড়ই আমোদ হয়। মহারাজ নিজ ব্যয়ে যাত্রীগণকে কাশী হইতে এখানে আনয়ন করেন। কৃত্রিম রামলক্ষ্মণ আসিয়া, এখানে সমবেত হন। অযোধ্যা, জনকপুর প্রভৃতি স্থান, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নির্দ্দেশ করা হয়। তারপর রামায়ণের লীলাখেলা কিছু কিছু যাত্রীগণকে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

এখান হইতে আমরা কেল্লার প্রবেশ করিলাম। রামনগরের কেল্লার ভিতরেই মহারাজার প্রাসাদ। এই কেল্লা অতি পুরাতন ও ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। নদীবক্ষ হইতে বা অসিঘাট হইতে

ইহার দৃশ্য চমৎকার। আমরা কেল্লায় প্রবেশ করিয়া, মহারাজার চিত্রশালা দর্শন করিলাম। এখানে রাজবংশীয় নৃপতিবর্গের চিত্র রক্ষিত হইয়াছে; কিন্তু চৈৎসিংহের তসবীরখানা খুঁজিয়া পাইলাম না।

নদীতীরস্থ বারান্দার শোভা বর্ণনাতীত। এখানে বসিলে, সন্ধ্যাসমীরণবাহিত ভাগীরথীর সলিলকণাস্পর্শে সন্তাপিতের তাপ দূর হইয়া যায়। মহারাজার দরবারঘর অতি চমৎকার সজ্জিত। নীচে ভেলভেটের উপর শুভ্র চাদর বিস্তৃত; তদুপরি চেয়ার টেবিল সজ্জিত রহিয়াছে। দেওয়ালে কারুকার্য্যখচিত ফ্রেমমণ্ডিত মুকুরশ্রেণী। তাহার উপরেই বৃহৎ বৃহৎ তৈলচিত্র। এখানেও চৈৎসিংহের কোনও প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না। গজদন্তনির্ম্মিত নানারূপ পুষ্পবৃক্ষদ্বারা ঘরটীকে অমরাবতীসদৃশ মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা পশ্চাদ্বার দিয়া, নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

নৌকায় আসিতে আসিতে কাশীর হরিশ্চন্দ্রঘাট দর্শন করিলাম। এখানে এখনও একটী শ্মশান বর্ত্তমান আছে। অসংখ্য ডোমও ঘাটের উপর বসতি করিয়া থাকে। কিন্তু মণিকর্ণিকার শ্মশানঘাটই এখন মহাশ্মশান বলিয়া বিখ্যাত।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই কাশী সংস্কৃতশাস্ত্রালোচনার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক পণ্ডিত বাস করিয়া থাকেন; অসংখ্য টোলও আছে। এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। দূর বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া, অনেক বাঙ্গালী এখানে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা সহরের যে অংশে বাস করেন, তাহাকে বাঙ্গালীটোলা কহে। জলের কল হওয়ায়, এখানকার

স্বাস্থ্য অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে। নদীর জলের এমনি একটী চমৎকার গুণ যে, পান করিলে পেটের অসুখটী হইবার আশঙ্কা থাকে না। কোনও সাহেব, এই বহুজনাকীর্ণ সহরে বিসূচিকা রোগের অল্পতা লক্ষ্য করিয়া, পানীয়ের এই বিশেষত্বকেই তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভরণপোষণের ব্যয় ও বাড়ীভাড়া পশ্চিমের সর্ব্বত্রের ন্যায় এখানেও খুব কম। পাঁচ টাকাদ্বারা একটী লোকের মাসিক খরচ নির্ব্বাহিত হইতে পারে। কত গরীব বিধবা ৩৲। ৩৷৹ টাকা ব্যয়ে এখানে বাস করিতেছেন। এখানে সর্ব্বদাই অনেক সাধুসন্ন্যাসীর আগমন হইয়া থাকে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর নিকট এ স্থানের তুলনা নাই। কাশীর পিত্তলের জিনিস অতি প্রসিদ্ধ। এখানে পাইপয়সা ও কড়ি প্রচলিত আছে। রেশমের কাজ, শাল এবং শাড়ীর জন্যও এ স্থান প্রসিদ্ধ।

বেনারসের উত্তরপূর্ব্বে সড়নাথ। এখানেই বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথম আপনার ধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সড়নাথের স্তূপ দেখিবার জিনিস।

পরদিন শনিবার অপরাহ্নে কাশী পরিত্যাগ করিয়া, রাত্রি ৯ঘটিকার সময় মুজাপুর পৌঁছিলাম।

মুজাপুর।

মুজাপুরে আমার পরিচিত কেহ ছিল না। একটী কুলির ঘাড়ে বিছানাটী চাপাইয়া, এখানকার ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ধর্ম্মশালা দেখি নাই। সন্ধ্যার আঁধারে জীর্ণশীর্ণ ময়লা একখানা চকমিলান বাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া মনটা কেমন দমিয়া গেল।

আমার সঙ্গে যে কুলি ছোকরাটা আসিয়াছিল, তাহার আকৃতিও যেমন সুন্দর, প্রকৃতিও তদনুরূপ। সে তাহার মোটা বুদ্ধিটুকু আমার জন্ত একটু মাজিয়া ঘষিয়া উজ্জল করিয়া বুঝিয়া লইল যে, আমি অসহায় পরদেশী। সে তাড়াতাড়ি যাইয়া একটী কুঠরী পরিষ্কার করিয়া দিল ও দু'পয়সা ভাড়া চুকাইয়া, একখানি চারপেয়ে সংগ্রহ করিয়া আনিল। আমার সঙ্গে প্রদীপ ছিল না। এই অসহায়ের সহায় ক্ষুদ্র বালক, আমার নিকট হইতে দুটী পয়সা চাহিয়া লইল; তারপর কোথা হইতে একটী মৃৎপাত্রে করিয়া খানিকটা সরিষার তৈল ও একটী পলিতা আনিয়া হাজির করিল। মাতৃভূমি হইতে বহুদূরে কোন অপরিচিত প্রদেশে একটী অপরিচিত বালকের এই সহৃদয় ব্যবহার ও কোমল সহানুভূতি, আমার উদ্বেলিতহৃদয়ে কি শান্তিসুধা সিঞ্চন করিয়া দিয়াছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইতে পারে না। এ কথা চিরকাল আমার মানসপটে জলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

এই অপরিচিত বন্ধুকে বিদায় করিয়া, ধীরে ধীরে শয্যা রচনা করিলাম। তাহার পর আহারের উদ্দেশে সহরে প্রবেশ করিতে হইল। কিছুদূর যাইতেই, সারি সারি সজ্জিত কয়েকখানা ময়রার দোকান নয়নপথে পতিত হইল। কিন্তু দোকানের জিনিসপত্রের দিকে অবলোকন করিতেই তাক্ লাগিয়া গেল। আমি বাঙ্গালীবাবু—রসোগোল্লা, পান্তোয়া, লুচি, বরফি ও রসাল গজায় চিরকাল পুষ্ট; এতদ্দেশীর আহার্য্যে মন উঠিবে কেন? কতকগুলি হলদেবর্ণের আটার লুচি, আর গোটাকতক পেঁড়া—এই মাত্র দোকানীভায়ার সম্বল। আমার ত চক্ষুস্থির। এখন এই জঠরাগ্নি কিরূপে নির্ব্বাপিত

হইতে পারে? যাহা হউক, উপায় নাই; শুষ্কমুখে খানকতক লুচি, এই রসগোল্লাপান্তোয়াভ্যস্ত বাঙ্গালীজঠরে প্রেরণ করিয়া তৃপ্ত হইলাম। অতঃপর পশ্চিমে যতদিন ভ্রমণ করিয়াছি, এই আটার লুচিই আমার সম্বল হইয়াছিল। পরে এমন হইয়াছিল যে, বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও ভাতটাকে নেহাৎ অপদার্থ বলিয়া মনে হইত। বাস্তবিক, এই খাদ্যাখাদ্যের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে, বাঙ্গালীর হীন-বীর্য্যতার প্রকৃত কারণের অনেকটা আভাস পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এতদ্দেশীয়েরা আমাদের মত রসনাপরিতৃপ্তির পক্ষপাতী নহে। যাহাতে শরীরে বল ও শক্তি সঞ্চয় হয়, তাহাই তাহাদের নিকট উপাদেয়। এজন্যই হিন্দুস্থানীগণ আমাদের অপেক্ষা এতাধিক বলিষ্ঠ ও সবলকায়।

ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া সে দিনকার মত রাত্রিযাপন করিলাম। ঘরগুলি এমন অপরিষ্কার ও অব্যবহার্য্য যে, রাত্রিযাপন করিতে কিরূপ আশঙ্কা হইতেছিল। স্থানে স্থানে ভগ্ন, কোথাও বা মাকড়সায় জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। যাত্রিগণ প্রায় সকলেই বারান্দায় শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিয়াছে। এই বিদেশে ও অপরিচিত রাজ্যে বারান্দায় পড়িয়া থাকিতে কিছুতেই সাহসী হইলাম না। আমার ক্ষুদ্র কুঠরীতে যাইয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলাম। দ্বারে অর্গল ছিল না; খুঁটিদ্বারা দরজা আগলাইয়া রাখিলাম। অজানিত স্থানে কেমন ভয় ভয় করিতেছিল। একটী বৃহৎ ছিদ্রপথে বাহিরের অন্ধকার গাঢ়তর দেখাইতেছিল। সে অন্ধকারে আমার হৃদয়ের বিষাদকালিমা মিশাইয়া, আমি কোনরূপে নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইলাম।

ধর্ম্মশালায় যাত্রিগণের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য একজন জমাদার নিযুক্ত আছে। এতদ্ব্যতীত কয়েকটী ভৃত্য ও দু'চার পয়সা উপার্জ্জন করিবার জন্য আগন্তুকগণের ফরমাইস যোগাইয়া থাকে। যাত্রিগণের নিকট হইতে পয়সা গ্রহণ করা ধর্ম্মশালার কর্ত্তৃপক্ষের অভিমতবিরুদ্ধ। কিন্তু তাহাদের দ্বারা যে সব প্রয়োজনীয় কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাতে এইরূপ দু'চারপয়সা তাহাদিগকে দান করা আগন্তুকের মতবিরুদ্ধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ এইরূপ যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে, কেবলমাত্র কর্ত্তব্যচালিত হইয়া, কখনই তাহারা এত আগ্রহের সহিত যাত্রিদের সাহার্য্যার্থ অগ্রসর হইত না।

ধর্ম্মশালায় আগন্তুকগণ তিন দিবসকাল বিনাব্যয়ে অবস্থান করিতে পারেন। তবে আহারাদি বা অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ব্যয় তাহাদিগকে নিজ হইতে বহন করিতে হয়।

আমি প্রাতে উঠিয়া হাতমুখ প্রক্ষলন করিলাম। জামাদার সাহেব দয়া করিয়া ঘটীর ও টাট্টির বন্দোবস্ত করিয়া দিল। এজন্য তাহাকে দু'টী পয়সা বক্‌সিস্ দিতে চাহিলে, সে দৃঢ়স্বরে প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিল, "বাবুজী এ ধরমশালা হায়।" ধন্য জমাদার সাহেব! তোমার মত কয়জন এই 'ধরমের' মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন? আমি মনে মনে তাহার অশেষ গুণানুবাদ করিয়া, সহর দেখিতে বহির্গত হইলাম।

মৃজাপুর তেমন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান নহে। তবে সহরটী সমৃদ্ধিশালী বটে। এখানে যাহা কিছু দর্শনীয় বস্তু আছে, তন্মধ্যে নদীতীরস্থ প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাটটী বড়ই মনোরম। এমন

সুন্দর ঘাট কচিৎ কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাস্করের অপূর্ব্ব শিল্প ইহার চাতালে ও সোপানাবলীতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ভাগীরথীবক্ষ হইতে ইহার শোভা অনির্ব্বচনীয়; যেন কোন মায়াবীর মন্ত্রকৌশলে নদীগর্ভ হইতে কুসুমস্তবকগ্রথিত একখানি মায়াপুরী ভাসিয়া উঠিয়া, সলিলোপরি ভাসমান রহিয়াছে।

এখানকার টাউনহল গৃহটীও দেখিতে অতি সুন্দর। নানা কারুকার্য্যময় উৎকৃষ্ট মৃজাপুরপ্রস্তরের উচ্চ টাউয়ারের (Tower) উপর বৃহৎ ঘড়ি স্থাপিত হইয়াছে। এজন্য এখানকার অধিবাসিগণ ইহাকে ঘণ্টাঘর বলিয়া থাকে। জেলামাজিষ্ট্রেট্ জর্জ্জ ডেলের তত্ত্বাবধানে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্বেশ্বর মিস্ত্রী কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়।

অতঃপর মৃজাপুরের চক দর্শন করিয়া, ৯৷৷০টার সময় চুণার গমনার্থ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। মোগলসরাই ও মৃজাপুরের ঠিক মধ্যস্থলে চুণার ষ্টেসন অবস্থিত। পূর্ব্বদিবস রাত্রি উপস্থিত হওয়ায়, চুণারে অবতরণ করিতে পারি নাই। আজ ১০টার গাড়ীতে তথায় যাত্রা করা গেল।

যদিও রাজনৈতিকবিপ্লবে মৃজাপুর তেমন কিছু উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই, তথাপি বাণিজ্যব্যবসায়ে উহার যথেষ্ট সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভোলানাথ [illegible] এই নগর সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ;—

"ইহার বাণিজ্যসমৃদ্ধি মধ্যভারতে অতুলনীয়। বারাণসী, ভাগলপুর, রাজমহল, মুঙ্গের ও পাটনার ন্যায়, ইহার প্রাচীন গৌরবকাহিনী তেমন না থাকিলেও, প্রথমোক্তটী ব্যতীত অবশিষ্টচারি-

টাই এখন ইহার নিকট পরাজিত। আইনআকবরীতে বা 'বৃটিশসৈন্যের বক্সার হইতে এলাহাবাদ গমন-কাহিনী'তে ইহার নাম নাই। ইংরেজ-রাজত্বেই ইহার গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজধানীর পর এমন সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থান আর নাই। ভারতের এক ষষ্ঠাংশ শস্য, তুলা ও রং এইখানে আমদানী হয় ও কোটী লোকের ভরণপোষণোপযোগী কাপড়, জামা ও ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদি এখানকার গুদামে মজুত থাকে। মৃজাপুরের গালিচা অতুলনীয়। ভারতের সকল দেশ হইতে বণিকগণ বাণিজ্যার্থে হেথায় আগমন করিয়া থাকেন। এবং ধনেরত্নে পুষ্ট হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। মাড়োয়ারীগণ এমন কি বাঙ্গালীরাও কারবার উপলক্ষে এখানে বসতি করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম ও রাজকীয় সংস্রব ব্যতীত কেবলমাত্র বাণিজ্যব্যবসায়ে এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে মৃজাপুর ব্যতীত ভারতে এমন স্থান বিরল। মৃজাপুরের চক্ ভারতে অদ্বিতীয়।"

আমি মৃজাপুরে এক দিবস মাত্র বাস করিয়াছিলাম। ভোলানাথের এই মুক্তকণ্ঠপ্রশংসা কতদূর সত্য, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। চক্ দেখিয়া আমার তেমন কিছু মনে হয় নাই; তবে শস্য, তুলা ও গালিচার ব্যবসায়ে এস্থান দিন দিন সমৃদ্ধিলাভ করিতেছে। মোটের উপর ইহা যে একটী উন্নত সহর, সে বিষয়ে কাহারও মতান্তর নাই।

চুণার।

প্রায় ১১॥০টার সময় চুণারে পদার্পণ করিলাম। ষ্টেসন হইতে সহর দুই মাইল দূরবর্ত্তী। একা করিয়া একটু বাহির

হইতেই, প্রস্তরপ্রাচীরবেষ্টিত বিশাল দুর্গ যেমন নয়নপথে পতিত হইয়া গেল আর অমনি মনোরাজ্যে কি একটা তুমুলান্দোলন উপস্থিত হইল। যেখানে আগ্নেয়াস্ত্রবিক্ষেপে অহরহঃ শত শত বীরের রক্তাক্তদেহ ভূমাবলুণ্ঠিত হইয়াছে, কে জানিত সেইখানে আসিয়া আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণী আজ এমনি করিয়া দাঁড়াইবে?

চুণার ঐতিহাসিকক্ষেত্র। প্রাচীনকালে কে, কখন এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইতিহাস আজ বিস্মৃতির গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের রাজত্বকালেই ভারতের ইতিবৃত্তে চুণার সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। পাঠানবীর সের-সা শূর যখন বাঙ্গালা ও বিহারে ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিতেছিলেন, তখন এই মহাপুরুষের ভাগ্যলক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে, চুণারের অদৃষ্টও একটু একটু করিয়া হাসিয়া উঠিতেছিল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পালবংশীয় কোন বঙ্গীয় নরপতি এই দুর্গ নিম্মাণ করিয়া ইহার ভিতর বসতি করিতেন। পরে বুন্দেলখণ্ডের চন্দলরাজগণ উহা হস্তগত করেন। ইহা হইতেই এই দুর্গ চন্দলগড় বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসি-গণের গল্প অন্যরূপ। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই দুর্গ মালবাধি-পতি উজ্জয়িনীশ্বর বিক্রমাদিত্যকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই বিশ্বা-সের সমর্থন জন্য তাহারা দুর্গমধ্যে একস্থানে তদীয় ভ্রাতা ভর্ত্তৃ-হরির সমাধ্ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

একা যাইয়া তহশীলদারের কুঠীর সম্মুখে থামিল। এখানে আমাকে পাস সংগ্রহ করিতে হইবে। এখানকার তহশীলদারের পদ আমাদের বঙ্গদেশীয় সবডিভিসনেল অফিসারের অনুরূপ। কিন্তু আজ রবিবার বলিয়া, তহশীলদার মহাশয়ের সাক্ষাৎলাভ

ঘটিয়া উঠিল না। আমি অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া, আফিসস্থ একজন ক্লার্কের নিকট হইতে পাশ সংগ্রহপূর্ব্বক দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলাম।

অনূান একশত পঞ্চাশ ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর উন্নত প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গ। পার্ব্বত্যদুর্গ এই আমি নূতন দর্শন করিলাম। কতকাল গিয়াছে, কত মানব এইখানে লীলাখেলা করিয়া, অনন্তের কোলে বুদ্বুদ্‌প্রায় মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই দুর্গ আজিও অচল অটল দাঁড়াইয়া আছে। চুণার! যে তোমায় এমন সুদৃঢ় করিয়া গঠন করিয়াছিল, সে আজ কৈ? যে সেরশাহ তোমাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্ববিজয় করিয়াছিলেন, সেই বীরপুরুষই বা এখন কোথায়? হায়! মানবজীবন জড়পদার্থ হইতেও ক্ষণভঙ্গুর।

আমাদের রাস্তা ক্রমে একটু একটু উঁচু হইতে লাগিল। যখন দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলাম, তখন একা হইতে নামিয়া, সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিতে হইল। এইখানে একজোড়া ভীষণ কপাট আমার দ্বাররুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কত কামান, বন্দুকের গোলাগুলিবর্ষণ ইহার বক্ষের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে; তবুও আজ ইহার ধ্বংস হয় নাই। এই বৃহৎ দরজার একটি ছিদ্রপথে আমি প্রবিষ্ট হইলাম।

চুণার দুর্গে আজকাল দেখিবার তেমন কিছুই নাই। বাবর, হুমায়ুন, সেরশূর এবং ইংরাজের নামের সঙ্গে চুণারের ইতিহাস বিজড়িত। বাঙ্গালার গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ কাশীশ্বর চৈৎসিংহের সর্ব্বনাশ করিয়া, এইখানে আসিয়া কিছুকাল বাস করেন।

এই সময় তাহার তত্ত্বাবধানে কতকগুলি আধুনিক গৃহ দুর্গমধ্যে নির্ম্মিত হয়। সে সকল আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দুর্গের উত্তরাংশে এখনও হিন্দুরাজত্বের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই অংশ দুর্গের সর্ব্বোচ্চস্থান, এবং তিনদিকেই সলিল-বেষ্টিত—দুর্গের দক্ষিণাংশ হইতে একটী উপদ্বীপাকারে বহির্গত হইয়া, স্রোতস্বিনীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই উপদ্বীপস্থ প্রাচীরের উপর হইতে চারিদিকের শোভা অতি চমৎকার। যেন কে একখানা চিত্রপট বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে। দূরে পর্ব্বতমূলে দুইটী দরগা,—লতাবৃক্ষাদির ভিতর হইতে আপনাদের শুভ্রমস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। উহার নিকট একটী বাঙ্গ্লা কোন শ্বেতাঙ্গপুঙ্গবের আবাসস্থানরূপে বিরাজ করিতেছে। ইহারই কিয়দ্দূরে একটী কবরখানা। অন্যদিকে আরও কিছু দূরে পর্ব্বতোপরি আরও একটী সুন্দর বাঙ্গ্লা একাকী শোভা পাইতেছে।

নদীবক্রগামিনী। তটে শ্যামল তৃণরাজি বিস্তৃত হইয়াছে। অপর তীর বালুকাময়; বালুকাময় সৈকত বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণে বিন্ধ্যাচলের খণ্ডগিরিসকল মস্তক উঁচু করিয়া উঁকি ঝুঁকি দিতেছে।

দুর্গের এই অংশে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বের নিদর্শনস্বরূপ নানাচিত্রবিচিত্রশোভিত প্রাসাদাবলি এখনও বিদ্যমান আছে। এই সকল গৃহগুলি হিন্দুআদর্শে নির্ম্মিত এবং কোনও প্রাচীনতমকালে হিন্দুললনাগণের আবাসস্থল ছিল বলিয়া কথিত হয়। এখানেই একটী সুন্দর প্রশস্ত বাটীতে মুসলমান শাসন-

কর্ত্তার বাসভবন ছিল। ইহার নিকট পুরাতন গারদ। এই ভয়ঙ্কর গারদ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। মহারাষ্ট্রবীর ত্রৈম্বকজী এই গারদে বসিয়া বসিয়া মানসিক ও বাহিক তমসায় আচ্ছাদিত হইয়া জীবনের শেষাংশ কর্ত্তন করেন।

এই গারদ সম্পূর্ণ অন্ধকারে আবৃত। পবনদেব এখানে ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করেন। চারিটী ছিদ্রপথ ভিন্ন ইহার ভিতর আলো বা বাতাস প্রবেশের দ্বিতীয় পথ নাই। এই ছিদ্রপথেই হতভাগ্য বন্দীকে এই গভীর কূপে নিক্ষিপ্ত করা হইত। ঐ জন্মে তাহার আর উদ্ধারের সম্ভাবনা থাকিত না।

দুর্গের পানীয়সংগ্রহের জন্য এই অংশের দক্ষিণপার্শ্বে একটী বৃহৎ কূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহার বৃত্তাকার মুখের ব্যাসের পরিমাণ ১৫ ফিট।

এই সকল দেখিয়া আমি ভর্ত্তৃহরির সমাধ্ দেখিতে গেলাম। একখণ্ড কাল প্রস্তর অতি ভক্তির সহিত একটী ক্ষুদ্র গৃহে স্থাপিত হইয়াছে। পুষ্পরাশি ও সিন্দূরবিন্দু এই প্রস্তরকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। আমার সঙ্গে যে গাইড ছিল, সে কহিল "এই দেবতার নাম হরমঙ্গল। ভর্ত্তৃহরী এইখানেই কঠোর সাধনায় জীবন কর্ত্তন করিয়াছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব, দিনের মধ্যে নয় ঘণ্টা এখানে বসতি করেন। বাকী ৩ ঘণ্টা তাহাকে কাশীতে বাস করিতে হয়। এই ৩ ঘণ্টার জন্য দুর্গ অরক্ষিত হইয়া পড়ে।" আমরা ভক্তিসহকারে হরমঙ্গলের নিকট প্রণত হইয়া বাহিরে আসিলাম।

এই সকল গাইডেরা এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলিয়া থাকে। তাহারা ইহার ঐতিহাসিক তত্ত্বের সঙ্গে

কাসিম, সুলেমান ও আরঙ্গজেবের নাম সংশ্লিষ্ট করে। আমি চেষ্টা করিয়াও তাহাদের এই সকল গল্পের কোন ভিত্তি আছে কি না, অবগত হইতে পারি নাই। পূর্ব্বকথিত অন্দরমহলের সঙ্গে তাহারা সুরমারাণী বলিয়া কোন রমণীর বিবাহউৎসবের উল্লেখ করে। আমি হিন্দি ভাল না জানায়, তাহাদের সকল কথা স্পষ্ট ধরিতে পাই নাই বটে, কিন্তু যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে এই বিবাহকাণ্ড যে এখানকার একটা গুরুত্বসম্পন্ন ঐতিহাসিক-তথ্য বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস, তাহার আর কোন সংশয় নাই। শুনিলাম, আল্লাউদলের সহিত এই রাজ্ঞী পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন। এই আল্লাউদল কে? আর এই রাজ্ঞীই বা কে? কোন ইতিহাসজ্ঞ পাঠক জানাইলে বাধিত হইব।

দুর্গের বাহিরে আসিয়া এক্কা চাপিলাম। আমার পুষ্পকরথ চুণারের অপরিষ্কার গলির ভিতর দিয়া ধাবিত হইল।

চুণারের প্রস্তর ভারতে প্রসিদ্ধ। এমন পাতলা পাতলা স্তর বিশিষ্ট প্রস্তর আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এখানকার বাড়ীগুলা অধিকাংশই এই প্রস্তরনির্ম্মিত। ইটের সঙ্গে সম্পর্ক নাই। তামাকের জন্যও চুণার প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

ষ্টেসনে পৌছিয়া চারিটার গাড়ীতে বিন্ধ্যাচল যাত্রা করিলাম। বিন্ধ্যাচল মৃজাপুর হইতে চারি মাইল মাত্র দূরবর্ত্তী। ইহা একটী পীঠস্থান। এখানে বিন্ধ্যবাসিনীদেবী বিরাজমান। ইহারই অদূরে বিন্ধ্যাচলশিখরে দেবী অষ্টভুজার মন্দির। এই সকল দেখিয়া, আজই আবার মৃজাপুরে ফিরিতে হইবে এই সঙ্কল্প করিয়া, গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। সাড়ে পাঁচটার সময় গাড়ী বিন্ধ্যাচলে পৌছিল।

বিন্ধ্যাচল।

বেলা ৫॥ ঘটিকার সময় অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যকিরণপ্রদীপ্ত শৈলশিখরমালা দর্শন করিতে করিতে বিন্ধ্যাচলে অবতরণ করিলাম। বিন্ধ্যাচল একটী ছোট খাটো ষ্টেসন। পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচল-দর্শণপ্রার্থীগণ মৃজাপুরে অবতরণ করিয়া একাযোগে এখানে উপস্থিত হইতেন। যাত্রিগণের আধিক্য ও অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ এইস্থানে একটী ক্ষুদ্র ষ্টেসন স্থাপন করিয়াছেন। একটী ধর্ম্মশালাও ঐ উপলক্ষে কিয়দ্দূরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

একা একা দেশভ্রমণ কিরূপ দুরূহব্যাপার এবং পথিককে মাঝে মাঝে কিরূপ অসহায় অবস্থায় পড়িতে হয়, তাহা পাঠক এই পরিচ্ছেদে অবগত হইবেন।

গাড়ী হইতে নামিয়া একটী জমাদারের নিকট দেবীমন্দির দুইটী কতদূর তাহার অনুসন্ধান লইলাম। সে যাহা উত্তর করিল, তাহাতে আমাকে বড়ই নিরাশ হইতে হইল। সে কহিল, "সহরের ভিতরই বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির;—অধিক দূরবর্ত্তী নহে। কিন্তু অষ্টভুজার মন্দির?—সে ত তিন ক্রোশ। আজ আর সেখানে যাইতে পারিবেন না।"

সে এমনভাবে কথাকয়টী কহিল যে, আমি বুঝিলাম বুঝি পাঁচটার পর পাহাড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাকে অনেকস্থানে যাইতে হইবে; আমি ত অপেক্ষা করিতে পারি না। যেমন করিয়াই হউক, আজই আমাকে পাহাড়ে যাইতে হইবে; এই স্থির করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম। ষ্টেসনের গেট

পরিত্যাগ করিতেই, একজন পাণ্ডা আসিয়া হাজির হইল। আমি তাহার সহিত কোনরূপ দর চুক্তি না করিয়া, প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি আমায় পাহাড়ে লইয়া যাইবে? আমি অষ্টভুজাকে দর্শন করিব।"

পাণ্ডাঠাকুর একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল, "সে ত আজ হবে না বাবা! সেখানে কাল যাইতে হইবে।"

আমি কহিলাম, "সে অবসর আমার নাই। আজই তথায় যাইতে হইবে; নতুবা আমার দর্শন ঘটিয়া উঠিবে না।"

পাণ্ডাজী আপত্তি করিল—বাবুজী, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, এসময়েও কি পাহাড়ে যাওয়া যায়? ফিরিতে রাত্রি হইবে, কাজেই তোমার গাড়ী ফেল হইবার আশঙ্কা আছে। বিশেষতঃ এস্থলের পথঘাট নিরাপদ নহে। দুষ্টলোক সহায়হীন পথিককে আক্রমণ করে। সন্ধ্যাসমাগমে রাস্তার লোকসমাগম বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সঙ্গী সহায়শূন্যের পক্ষে এ সময় অষ্টভুজাদর্শন সহজসাধ্য নহে।

পাণ্ডামহাশয়ের এই লম্বা বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, আমি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলাম; কিন্তু বিচলিত হইলাম না। পর্ব্বতবাসিনী মা অষ্টভুজা ঠগীদিগের আরাধ্যাদেবী ছিলেন। তাহার পর্ব্বতশিখরস্থ বিভীষিকাময় নিকেতনে কত ভয়ানক ভয়ানক কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ হেন ভীষণ স্থলে একাকী পদব্রজে যাইতে কেমন অসহায় বোধ হইতেছিল। আমি অগত্যা একা করিয়া তথায় যাওয়ার বাসনা জ্ঞাপন করিলাম। পাণ্ডাঠাকুর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বীকৃত হইলেন।

আমরা সহরে ঢুকিলাম। বিন্ধ্যাচল ছোট সহর। রাস্তা-ঘাটগুলি ঠিক ৺কাশীধামের মত সরু সরু, উচ্চনীচ ও গোলমেলে। ঠিক তদ্রূপ প্রস্তরমণ্ডিত ও প্রস্তরগঠিতসৌধমালা-বেষ্টিত। বেণারসের মত এখানেও রাস্তার দু'ধারে মিঠাই ও ফুলবেলপাতা বিক্রয় হইয়া থাকে। সমস্তটা সহরই জীর্ণশীর্ণ। তবে কোথাও কোথাও ইদানীং নূতন ইষ্টকালয়াদি নির্ম্মিত হইতেছে।

পাণ্ডাঠাকুর আমার নিকট হইতে সাতটি পয়সা গ্রহণ করিয়া, এক পয়সার মধ্যে কিছু পুষ্প, বিল্বপত্র, কুঙ্কুম ও চিনিদানা ক্রয় করিলেন। তারপর আমার হাত ধরিয়া মন্দিরে লইয়া গেলেন।

সায়াহ্নকাল। পরিষ্কৃত দেবালয়ে বসিয়া লোক জন বিশ্রাম করিতেছে। কেহ কেহ বা গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। ছোট ছোট মেয়েগুলি ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। মন্দিরের প্রশস্ত বারান্দার উজ্জ্বল মেজেতে বসিয়া পাণ্ডাগণ সুস্থিরচিত্তে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছে। মন্দিরের এই শান্তিময় ভাব দেখিয়া আমি মোহিত হইলাম।

মন্দিরের দরজাগুলি বড় অপ্রশস্ত; এমন কি হামাগুড়ি দিয়া প্রবেশলাভ করিতে হয়। সম্মুখস্থ মন্দিরের ভিতর শিক-বেষ্টিত একটী ছোট প্রকোষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রীদেবী বিন্ধ্যবাসিনী উজ্জ্বল প্রদীপালোকে বিরাজ করিতেছেন। ঘরটী স্বভাবতঃই অন্ধকার। এই অন্ধকার দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখিতে হয়। এই মন্দিরের পশ্চাতে আরও দুইটী দেবতাগৃহ আছে। তাহার একটীতে ভগবতী ও অন্যটীতে দেবী সরস্বতী স্থাপিত

আছেন। শেষোক্ত স্থানে আসিয়া পাণ্ডাঠাকুর প্রার্থনা করিল, "মা, বাবুকে খুব পাশ দাও।" বুঝিলাম, বাঙ্গালী যে পাশের কাঙ্গাল তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

মন্দিরের বারান্দায় একটী বৃক্ষের নিকট [illegible], পাণ্ডাজী আমাকে মন্ত্র পড়াইয়া লইলেন। শুনিলাম, ইহার নাম ধর্ম্মবৃক্ষ। তারপর আমরা এক্কার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। অর্দ্ধেক রাস্তা পর্য্যন্ত কুমারীকন্যাগণ পয়সার জন্য জ্বালাতন করিতে লাগিল।

এক্কায় চাপিয়া দুইজনে সন্ধ্যালোকে বিন্ধ্যাগিরির পথে ধাবিত হইলাম। সহরের কোলাহল ছাড়িয়া গাড়ী নির্জ্জন প্রান্তরে পড়িল টিলাময় প্রান্তর; পাশে [illegible] জনশূন্য। নীরব রাস্তা দিয়া এক্কা 'টুন টুন' করিয়া চলিয়াছে। দু'ধারে কেবল চড়াই ও টিলা। শ্যামলপত্রবাহী বৃক্ষ সকল নিস্তব্ধে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রদোষালোকে বোধ হইতেছিল, যেন মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধিয়া শান্তিরক্ষকগণ প্রকৃতির নিস্তব্ধতা রক্ষা করিতেছে। অশ্বকণ্ঠভূষণ ঘণ্টাটা 'টুন টুন' করিতে করিতে সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিয়া, আমাদের মনে কেমন এক আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছিল। ক্রমেই গাড়ী উপরের দিকে উঠিতেছে আর আঁকা বাঁকা হইয়া নিবিড় হইতে নিবিড়তর কাননে প্রবেশ করিতেছে। কেমন একটু ভয় ভয় করিতেছিল। শকটচালক, পাণ্ডাঠাকুর ও দেশ,—সব অপরিচিত; আমি একা। এই নিঃসহায় অবস্থায় জগদীশ্বরের ও আত্মবলের উপর নির্ভর করিয়া, পর্ব্বতোপরি কোথায় এক জনমানবরহিত পুরীর দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি। হায়, সে আত্মবল কত ক্ষুদ্র!

পাণ্ডা চুপি চুপি আমায় কহিল, কিয়দ্দূরে এক গ্রামের লোকেরা বড়ই দুর্দ্দান্ত; প্রায়ই মার ধর করিয়া থাকে। তবে পাণ্ডা থাকিলে সহজে অত্যাচার করিতে সাহসী হয় না।

ভয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় লাঠীধারী দু'একটী বলিষ্ঠদেহ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। আমার সঙ্গে অনেক টাকাপয়সা ছিল; এজন্য কিছু চিন্তিত ও শঙ্কিত হইলাম। হঠাৎ উপরে চাহিয়া দেখি, আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তখন আমার কি যে অবস্থা দাঁড়াইল, তাহা পাঠক অবশ্যই অনুভব করিতে পারিতেছেন। নিজ অপরিণামদর্শিতার জন্য বড়ই অনুতাপ উপস্থিত হইল। যাহা হউক, ঈশ্বরের নাম লইয়া, একটু জোরের সহিত মনের বিষাদিতভাবটী তাড়াইয়া দিয়া, চালককে শীঘ্র শীঘ্র শকট চালনা করিতে বলিলাম। অশ্ব দ্রুতবেগে ধাইয়া চলিল।

সৌভাগ্যক্রমে পবনদেব আমাদিগের সহায়তার জন্য অবতীর্ণ হইলেন;—মেঘগুলিকে আকাশের একপার্শ্ব হইতে উড়াইয়া, অন্য পার্শ্বে লইয়া গেলেন। আমরাও কোনরূপে আসিয়া, মন্দিরের নিকটস্থ ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম। এই জনমানবশূন্য স্থানে—এই ধর্ম্মশালায় কেহ তখন ছিলেন বলিয়া বোধ হইল না। এইখানে এক্কা পরিত্যাগ করিয়া, আমাদিগকে পদব্রজে কয়েকটা ছোট ছোট উপত্যকা অতিক্রম করিতে হইল। তখন মনে হইল, এই বনজঙ্গলবেষ্টিত প্রান্তরগুলির মধ্য দিয়া আমরা দুইটী অসহায় প্রাণী কোথায় যাইতেছি?

ভারতে আজ ঠগীর অত্যাচার নাই। তাহাদের আধিপত্যকালে কত হতভাগ্য আমারই মত এমনই বিশ্বাসের মহিমায়

এই সকল লতাগুল্মের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কে জানে, আজ আমিও সেই প্রবঞ্চনার ক্রীড়াপুত্তলি নাই।

অবশেষে আমরা আসিয়া পর্ব্বতমূলে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে সিঁড়ি বরাবর উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এ মৃত্তিকার সিঁড়ি নয়—মনুষ্যনির্ম্মিত প্রস্তরগঠিত সোপানাবলি। আমরা আরোহণ করিতে লাগিলাম। একটু অগ্রসর হইতেই দূরে—অতি দূরে—ক্ষীণ নক্ষত্রালোকের মত মিটিমিটি প্রদীপালোক দৃষ্ট হইল। আমরা নীরবে সিঁড়ি বহিয়া উঠিতে লাগিলাম। প্রায় শিখরসমীপস্থ হইয়াছি, এমন সময় নৈশাকাশের বায়ুস্তর বহিয়া, এক চমৎকার সুরলয়সম্পন্ন মন্ত্রোচ্চারণধ্বনি আসিয়া শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইল। আমি কি কপালকুণ্ডলা পড়িয়া স্বপ্ন দেখিতেছি? নিশীথে পর্ব্বতশিখরে জনমানবশূন্যদেশে এই অপূর্ব্ব মন্ত্রগীতি শ্রবণ করিয়া, আমার মস্তিষ্কে কি এক মাদকতা প্রবিষ্ট হইল। আমি মুহূর্ত্তে উত্তেজিত হইয়া, দুই লম্ফে অবশিষ্ট সিঁড়ি কয়েকটী পার হইয়া গেলাম।

উপরে উঠিয়া দেখি, একটী অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ। তাহার চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর। এক পার্শ্বে দেখি পর্ব্বতচূড়া বিদীর্ণ করিয়া একটী গর্ত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার সঙ্কুচিত দ্বারপথে প্রদীপের একটী ক্ষীণরশ্মি বাহিরের তিমির ভেদ করিয়া আকাশের দিকে ছুটিতেছিল। আমি উপস্থিত হইতেই কতকগুলি রমণী আসিয়া, আমাকে ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদিগকে দর্শন করিয়া আমার মেকবেথের ডাইনিত্রয়ের কথা মনে পড়িল। আমি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পাণ্ডার হাত ধরিয়া শৈলশিখরখোদিত অষ্টভুজার মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

এই কক্ষ এত ক্ষুদ্র যে, দুইটী লোক দাঁড়াইয়া বাক্যালাপ করিলে, তৃতীয়ের প্রবেশলাভ হইতে পারে না। ক্ষুদ্র দ্বারপথে আমাকে হামাগুড়ি দিয়া ঢুকিতে হইয়াছিল। এই ঘরের সকল দিকেই পর্ব্বতগাত্র। উর্দ্ধে মস্তকোপরি পর্ব্বতের অসমতল দেহ ঝুলিয়া আছে। দেবীমূর্ত্তি আরও ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্টা। মা অষ্টভুজে! তোমার কীর্ত্তিকলাপ এত অসীম—তোমার নাম এত বড়—তুমি এত ছোট হইলে কেন মা? কত নরশোণিত পান করিয়াছ, কত হতভাগ্যের অস্থি-কঙ্কালে বিন্ধ্যভূমি স্তূপীকৃত হইয়া গিয়াছে, আর তুমি এখনও এত ছোট রহিয়াছ—একটুও পুষ্ট হইতে পার নাই? আমি ভীতিবিহ্বলনেত্রে এই ভয়ঙ্করীর ক্ষুদ্র মূর্ত্তিখানা একবার হৃদয় ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। তারপর অন্যমনস্কভাবে বাহির হইয়া আসিলাম।

অষ্টভুজা ব্যতীত এস্থানে আরও কয়েকজন দেবতা ক্রমে ক্রমে স্থাপিত হইয়াছেন। ডাইনিগুলা আমাকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ঘুরাইতে লাগিল। কেহ তারামাতার আশী-র্ব্বাদ দিল; কেহ একখণ্ড শিলাকে দুর্গামাই বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। একজন আসিয়া আমাকে একটী ছিদ্র দেখাইয়া বলিল, 'এই পথে কালীমাইজী আছেন; চল দেখিবে।' সে ভয়ঙ্কর গহ্বরে আমার যাইবার কৌতূহল হইলেও, পাণ্ডামহাশয় টানিয়া লইয়া গেলেন। তিনি কহিলেন, "ও থাক্, চল; এখানে তোমাদের দেশের এক মহাপুরুষ বাস করিতেছেন দেখিয়া আসি।" আমি বুঝিলাম, তান্ত্রিকের কথা হইতেছে। উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সন্ন্যাসী কি বাঙ্গালী?" পাণ্ডা 'হাঁ' বলিয়া আমাকে লইয়া আর একটু উর্দ্ধে একটী ছোটখাট মুক্ত-

স্থলে উপস্থিত হইল। আমি স্তিমিত আলোকে দেখিলাম, ইহারই এক পার্শ্বে একটী তিনদিকখোলা ঘরে প্রজ্জ্বলিতকুণ্ড সম্মুখীন করিয়া, সন্ন্যাসীঠাকুর বসিয়া আছেন।

আমরা যাইয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার কার্য্য সমাধা হইলে, এক গণ্ডূষ জলদ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিয়া, তিনি আমাদিগকে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। আমি বিশেষ করিয়া চাহিয়া দেখিলাম,—বাঙ্গালী বটে। তখন আসন চাপিয়া বসিলাম।

তিনি আমার নামধামের খবর লইলেন। আমিও কৌতূহল নিবারণ করিতে না পারিয়া, তিনি পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কোন্ স্থলে বসতি করিতেন, তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি যাহা উত্তর করিলেন, তাহা এইরূপ ;—

তাঁহার পৈতৃক নিবাস হুগলীজিলায়। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ৺কাশীধামেই তাঁহার বর্ত্তমান বসতি। তবে কখনও কখনও ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, তীর্থাদি পর্য্যটন করেন।

আশ্চর্য্য সন্ন্যাসী! ইহার অতিরিক্ত আর কিছুই জানিতে পারি নাই। আমরা সেখান হইতে বিদায় লইয়া, ষ্টেসনে প্রত্যা-বৃত্ত হইলাম। বলা বাহুল্য, সশঙ্কিতচিত্তে আমাকে সমস্তটা পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছিল।

সেই রাত্রে মৃজাপুরের ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, পর-দিন এলাহাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলাম। বেলা ১০ ঘটিকার সময় আবার পঞ্জাবমেল 'হু হু' করিয়া ছুটিয়া চলিল।

মৃজাপুরে কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ইতিমধ্যে

পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার একজন বন্ধুও এই গাড়ীতে এলাহাবাদ যাইতেছিলেন। বাঙ্গালী বন্ধুটী আমাকে তাঁহার নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তিনি অতি সদাশয় লোক। বয়স ২২।২৩ বৎসর হইবে। তিনি কহিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এলাহাবাদ আমার পরিচিত—আমি আপনাকে সমস্ত দেখাইয়া শুনাইয়া দিব। আমিও কার্য্যোপলক্ষে তথায় ২।১ দিবস অপেক্ষা করিব। এক সঙ্গেই ধরমশালায় থাকা যাইবে।"

এই হিন্দুস্থানী যুবকের নাম মাতাজী।

প্রয়াগ-তীর্থ।

আমরা এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া, ধরমশালায় গমন করিলাম। এখানকার ধরমশালা অতি বিস্তৃত ও সুন্দর। প্রতিনিয়ত বহু-যাত্রী এখানে বেশ স্বচ্ছন্দতার সহিত বাস করিতেছে। ঘরগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভিতরের প্রাঙ্গণে জলের কল। বাড়ীটীও দোতালা। আমরা যাইয়াই উপরের তলে একটী ঘর দখল করিয়া বসিলাম। একটী ভৃত্য দৌড়িয়া আসিয়া, একটী চারপেয়ে দিয়া গেল এবং কখন কিছু জিনিসের দরকার বোধ করিলে, সে আসিয়া তাহা সংগ্রহ করিয়া দিবে, এমত অভিলাষ ব্যক্ত করিল। আমরা একটী কুলুপ ভাড়া করিয়া দরজা বন্ধ করিলাম। তারপর আহারাদির অন্বেষণে বহির্গত হইয়া গেলাম।

এলাহাবাদ উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের রাজধানী—বেশ উন্নত

সহর। এখানকার চক্ অতি সুন্দর। চকে একাসংখ্যা ও লোকসমাগম অত্যন্ত অধিক। এক্কার কঙ্কালমূর্ত্তিগুলি সহরের শোভা অনেকটা খাটো করিয়া দিয়াছে।

আমারা সায়াহ্নের কনকালোকে এই স্থানে কতক্ষণ পাইচারি করিয়া, সেদিনকার মত ধর্মশালায় প্রস্থান করিলাম।

রাত্রিতে বড় বৃষ্টি হইল।

২২শে মাঘ প্রভাতে বিছানায় থাকিয়াই প্রকৃতির অপ্রসন্নভাব লক্ষ্য করিলাম। জলদমালায় নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া আছে। বাসা হইতে বাহির হইতে পারিব না বলিয়া, মনটা কেমন বিষাদিত হইয়া পড়িল। আমার বন্ধুটী উঠিয়াই কহিলেন, "অদ্য পাক করিতে হইবে।" একটা হাঙ্গামা জুড়িয়া দেওয়া, আমার কিছুমাত্র অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু কি করি, বন্ধু কোন কথা গ্রাহ্য না করিয়া, ডাল চাউল আনিয়া খিচুড়ী চড়াইয়া দিলেন। রামশরণ ভৃত্য আসিয়া চুলা ধরাইয়া দিয়া গেল। বাসনপত্র নিকটবর্ত্তী এক মুদীর নিকট হইতে ভাড়া করিয়া আনা হইল। বন্ধু পাক করিলেন; আমাকে বড় ধারে কাছে যাইতে হইল না। যদিও বন্ধুবরের অদ্ভুত পাকপ্রণালী দর্শন করিয়া, আমার হাসি পাইতেছিল এবং এ শাস্ত্রে আমাদের উভয়েরই তুল্যজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তথাপি আহারে উপবেশন করিয়া দেখি—চমৎকার! এত উত্তম খিচুড়ী হই[illegible], তাহা আমরা ধারণাতেই আনিতে পারি নাই। আজ তিন দিবসান্তর আমার ভাত আহার হইল;—উদর পূরিয়া আকণ্ঠ ভোজন করিলাম।

বেলা ১১টা বাজিতে না বাজিতে আকাশ পরিষ্কার হইয়া

গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও মেঘমুক্ত হইল। আমরা তখনই বাহির হইয়া পড়িলাম।

বন্ধুবর কিছু কাজসমাপনান্তে আমাকে সঙ্গে করিয়া হাই-কোর্ট, মুইর কলেজ ও ইউনিভার্সিটী হল, এলফ্রেড্ পার্ক এবং ছোটলাটের প্রাসাদ প্রভৃতি দেখাইতে লইয়া চলিলেন।

এখানকার হাইকোর্টসম্বন্ধে তেমন কিছু বলিবার নাই। ইষ্টকালয়টী অথবা প্রস্তরালয়টী (কারণ ইহা প্রস্তরনির্ম্মিত) কলিকাতা-হাইকোর্টের তুলনায় অত্যন্ত হীন। মাত্র সাত জন জজ এখানে প্রতিনিয়ত বিচার কার্য্য সমাধা করিতেছেন। তাহারই মধ্যে বাঙ্গালী একজন।

আমরা হাইকোর্ট দেখিয়া বাহির হইয়া আসিতেছি, এমন সময় বন্ধুটী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "Oh Baboo, I have lost my umbrella; I left it on the ekka."

বন্ধুবরের ছাতাটী হারান গেল বলিয়া, একটু দুঃখিত হই-লাম। কহিলাম, "Let see, whether the driver is waiting for us."

আমার যে বড় ভরসা ছিল, তাহা নহে। তবে একটু ক্ষণিক সান্ত্বনার জন্য এ কথা বলিলাম। বাহিরে আসিতেই বন্ধুটী দৌড়িয়া Stand এর দিকে ধাবিত হইলেন। আমিও তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলাম; কিন্তু এমন সময় দেখি, একটী একা আমারই দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। আমি বন্ধুকে যাইতে বাধা দিয়া, একার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহি-লাম। ক্ষণপরেই আমাদের পূর্ব্বপরিচিত একাওয়ালা ছাতা-হস্তে হাজির! একাওয়ালার এই ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া —

বিস্মিত হইলাম। আমি যতদূর দেখিয়াছি, এক্কাওয়ালারা সাধারণতঃই খুব ভাল লোক। আমীর সঙ্গে তাহারা কখনও কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করে নাই। তাহাদিগকে কতকাংশে বিশ্বাসী বলিয়াও মনে হইল।

এখানকার এলফ্রেড্ পার্কের খুব নাম শুনিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া ততটা কিছু মনে হইল না। E. I. Ry এর গাইডে ইহাকে যে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইহার অধিকার আছে কি না সে বিষয়ে আমি সন্দিহান। তবে উদ্যানটী খুব বিস্তৃত বটে; ১৩৩ একর জমি লইয়া অবস্থিত। ইহার ব্যয়পোষণার্থে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক দশ হাজার টাকা খরচ করেন। পূর্ব্বে জনসাধারণের হস্তে ইহার ভার ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে, আমাদের বর্ত্তমান সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডিউক্ অফ্ এডিনবরার ভারতভ্রমণের স্মরণচিহ্নস্বরূপ ইহা এলফ্রেড্ পার্কনামে অভিহিত হয়।

উদ্যানমধ্যে শ্যামল মুক্তস্থলে চারু প্রস্তরগঠিতসিংহাসনে প্রস্তরময়ী ভিক্টোরিয়ামূর্ত্তি। ইহার সম্মুখে প্রতি শনিবার ব্যাণ্ড বসে। আরও কিছু দূরে চার্চ্চের মত একটা সুন্দর গৃহে সাধারণের ব্যবহারার্থ একটা উৎকৃষ্ট পুস্তকালয়। আমরা যাইয়া ২।১ খান পুস্তক উলটপালট করিয়া আসিলাম।

পার্কের নিকটেই ইউনিভার্সিটী হল ও মুইর কলেজ। ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট মুইরসাহেবের নাম অনুসারে এই কলেজের নাম মুইরকলেজ হইয়াছে। দুইটীই এক অট্টালিকার অন্তর্গত। বাড়ীটী বড়ই সুন্দর। মধ্যস্থলে উচ্চ মিনার; তাহারই পাশে

সিনেটহাউসের বিশাল-গম্বুজ। এই ঘরের ভিতর অতি সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য ও চিত্রপট সজ্জিত রহিয়াছে।

কলেজের অদূরে মেকডনেল ইউনিভার্সিটী হিন্দুবোর্ডিং। ইহা নূতন তৈয়ার করা হইয়াছে। ২৫০টী ছেলে এখানে বাস করিতে পারে।

এখান হইতে বাহির হইয়া, আমরা দুই বন্ধুতে পৃথক হইয়া গেলাম। বন্ধুটী আপন কাজে ষ্টেসনে প্রস্থান করিলেন। আমি একা চাপিয়া ভরদ্বাজআশ্রম দর্শন করিতে গমন করিলাম।

মহর্ষি ভরদ্বাজ, এলাহাবাদের অদূরে তপোবনে বাস করিতেন। মুনিবর অনেকদিন স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার আবাসস্থলটী আজিও সহস্র সহস্র লোক ভক্তির সহিত দর্শন করিয়া থাকে। আমি সেই বহুকালের স্মৃতির আকর্ষণে, সেই পবিত্রধাম দর্শনাভিলাষে গমন করিলাম।

কিন্তু আমাকে নিরাশ হইতে হইল। এই কি সেই শান্তিধাম? কৈ, সেই শান্তিময় তপোবন ভূমি ত দেখিলাম না;—আশ্রম ত দেখিলাম না! দেখিলাম কি?—কেবল অৰ্দ্ধভগ্ন কয়েকটী দেবালয় ও ইষ্টকস্তুপরাশি! এইস্থানেই ঋষিবর একদিন বাস করিয়াছিলেন —কেবল সেই স্মৃতি! আর কিছুই নাই, আর কিছুই পাইলাম না।

দেবালয়ে শিবস্থাপিত। ইহারই পার্শ্বে একটী অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ। সেই সুড়ঙ্গপথে ভূগর্ভস্থ একটী গৃহে প্রবেশ করিলাম;— এখানে নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ইহারও কিছু নীচে আরও একটী অন্ধকার ঘর। সেখানে আরও কয়েকটী দেবতা স্থাপিত আছেন।

তারপর এক স্থানে ভরদ্বাজ মুনিকে পাইলাম। কাল পাথরের ছোট মূর্ত্তি সাজিয়া এক কোণে বসিয়া আছেন। দেখিলাম, পবিত্র তপোবন এখন প্রবঞ্চনার নিকেতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কতকগুলি স্ত্রীপুরুষ, পয়সার লোভে এক একটী শিলাখণ্ডকে এক একটী দেবতা সাজাইয়া বসিয়া আছেন।

একটী চতুষ্কোণস্থান প্রদক্ষিণ করিতে বলায়, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এইখানে নাকি রামচন্দ্র যজ্ঞ করিয়াছিলেন। নিকটেই কতকগুলি প্রস্তর পোতা ছিল; সেগুলি স্পর্শ করিতে হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া এ প্রস্তরখণ্ডগুলির কোন বিশেষ পরিচয় পাইলাম না।

সন্ধ্যার সময় বাসায় ফিরিলাম। কিছু পরে বন্ধুটী কিছু খাবার লইয়া উপস্থিত হইলেন। দু'জনে আহার করিলাম। এখানেও খাদ্যসামগ্রী তেমন ভাল কিছু পাওয়া যায় না; তবে এখানকার মালাই খুব সস্তা। পাঁচ পয়সার মালাই আমি খাইয়া কুলাইতে পারি নাই।

২৩শে মাঘ বুধবার শয্যা ত্যাগ করিয়াই খসরুবাগ দেখিতে গেলাম। খসরুবাগে জাহাঙ্গীরতনয় খসরুর মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছে। এই সুন্দর উদ্যানের উপলখণ্ডনির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর, আকবরের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল; উহা আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মানসিংহের ভগিনী অম্বরদুহিতার গর্ভে খসরুর জন্ম হয়। বাদশাহ আকবরের রাজত্বের শেষাবস্থায় জাহাঙ্গীর স্থানীয় শাসনকর্ত্তারূপে এলাহাবাদের দুর্গে বাস করিতেছিলেন। মানসিংহের প্ররোচনায় রাজ্যলাভলালসাযুক্ত হইয়া কুমার খসরু এই সময় পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।

খসরুজননী সাধ্বী সাহেবা বেগম, পুত্রের এই অপব্যবহারে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া, ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে এ সংসার পরিত্যাগ করেন। কিন্তু খসরুর বাসনা পূর্ণ হয় নাই। আকবরের স্বর্গারোহণের সঙ্গে সঙ্গেই জাহাঙ্গীর, আগরার মসনদ চাপিয়া বসিলেন। খসরুকে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা খোরামের (পরে বাদসাহ সাহজাহান) তত্ত্বাবধানে অবরুদ্ধ থাকিয়া, খসরু মাতার মৃত্যুর নয় বৎসর পর, এ সংসার হইতে অপসারিত হইলেন। জাহাঙ্গীরের বিলাসভবনে মাতৃসমাধিপাশে খসরুর সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইল। সেই অবধি এই রম্যোদ্যান খসরুবাগ নামে পরিচিত হইয়াছে।

খসরু ও সাহেবা বেগমের সমাধিমন্দিরের মাঝখানে আর একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কাহারও মৃতদেহ স্থাপিত হয় নাই। উহা এখনও শূন্য পড়িয়া আছে।

উচ্চ বিটপীশ্রেণীবেষ্টিত এই সমাধিত্রয় দূর হইতে দর্শকের মনে কি এক গম্ভীরভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়! যেন কোন শান্তিধামে স্বর্গীয় মৃতাত্মাগুলি চিরবিশ্রাম ঢালিয়া দিতেছে। অতি সন্তর্পণে ধীরনিশ্বাসে ও ধীরপদবিক্ষেপে আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া, দুইটী অপার্থিব আত্মার চিরবিশ্রামশয্যা অশ্রুপূর্ণনয়নে দর্শন করিলাম। এ অশ্রু আনন্দের নহে, বিষাদের নহে,—ভক্তির;—মৃতের প্রতি সম্মানের ক্ষুদ্র নিদর্শন। এই সমাধিমন্দিরগুলি যে কোনকালে অতি রমণীয় ছিল, ভিতরের অস্পষ্ট চিত্রাবলি দেখিলে তাহা উত্তমরূপে প্রতীতি হয়।

বেলা দশ ঘটিকার সময় বাসায় ফিরিয়া একটু বিশ্রাম

করিলে পর, মাতাজী প্রসাদ আপন কাজে বাহির হইয়া গেলেন। আমি ও ধীরে ধীরে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের দিকে যাত্রা করিলাম।

সহরের অনতিদূরে এলাহাবাদদুর্গের পাদমূল প্রক্ষালিত করিয়া, যমুনা ও ভাগীরথী কুলুকুলুরবে বহিয়া যাইতেছে; যেন কোন্দলপ্রিয়া সপত্নীযুগল সাহঙ্কারে গর্জ্জন করিতে করিতে, পরস্পরের সম্মুখীন হইতেছেন। মাঝখানে দাঁড়াইয়া বিশালদুর্গ! —অচল অটল মূর্ত্তিতে শান্তি রক্ষা করিতেছে। তাহার কঠোর শাসন ও মর্ম্মভেদী দৃষ্টির নীচে অভিমানিনীদ্বয় তড়িদ্বেগে ছুটিয়া পলাইতেছে।

এই গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের অপর নাম ত্রিবেণী। স্রোতস্বিনী সরস্বতী ভূগর্ভতলপ্রবাহিনী;—অন্তঃসলিলারূপে আসিয়া, এই স্থানে মিলিতা হইয়াছেন। ইহা হইতেই ত্রিবেণী' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এইখানেই প্রাচীন প্রয়াগনগরী বর্ত্তমান ছিল। এখন তাহার সে সৌষ্ঠব কিছুমাত্র নাই। কালের কুঠারাঘাতে শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে।

কোন্ সময় কোন্ মহাপুরুষ এই নগরী স্থাপিত করেন, তাহার ইতিহাস বর্ত্তমান নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মেগাস্থিনিস ও সপ্তম খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক হিউ এনৎ সঙ্গ এই স্থানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেল্লায় রক্ষিত বৌদ্ধস্তম্ভটী মহারাজ অশোককর্ত্তৃক খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪০ অব্দে এই নগরীতেই প্রোথিত হইয়াছিল। সুতরাং খ্রীষ্টের জন্মের তিন-শত বৎসর পূর্ব্বেও প্রয়াগ যে একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, তাহা উত্তমরূপে বুঝা যাইতেছে। কথিত আছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা এই স্থানে অশ্বমেধযাগ সমাপন করিয়া, শঙ্খাসুর হইতে চতুর্ব্বেদের

উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। সেই হইতেই ইহার নাম প্রয়াগ হইয়াছে।

প্রয়াগের প্রাচীন সীমা নির্দ্দেশ করা একবারে সহজ নহে। একটী মাত্র সূত্র অবলম্বন করিয়া, আমরা এ তত্ত্বের কথঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইতে পারি। এখানকার প্রসিদ্ধ অক্ষয় বটের কথা অনেকেই অবগত আছেন। এই পুরাতন বৃক্ষটী খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও বর্ত্তমান ছিল। হিউ এনৎ সঙ্গ ও আবুরিহান ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই আশ্চর্য্য বৃক্ষ আজও ঠিক সেই স্থানেই বর্ত্তমান আছে। এই বৃক্ষের সমীপস্থ যে দেবমন্দিরের কথাটি চীনপরিব্রাজক উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ভগ্নাবস্থায় নিকটেই পতিত রহিয়াছে। তাঁহার পরিক্রমণকালে এই বৃক্ষ নদীকূল হইতে দেড় মাইল দূরবর্ত্তী ছিল বলিয়া বর্ণিত হয়। কিন্তু আকবরের রাজত্বের প্রারম্ভে মুসলমান ঐতিহাসিক আবদুল কাদির, এই বৃক্ষকে নদীকূলবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার, তিনি বা আবুরিহান অথবা তাঁহাদের পরবর্ত্তী কোন লেখকই নগরীসম্বন্ধে কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, তটিনীদ্বয়ের প্রবলস্রোতে আকবররাজত্বের বহুপূর্ব্বেই প্রয়াগনগরীর ধ্বংসলীলাভিনয় আরম্ভ হইয়াছিল; পরে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর, লুপ্তপ্রায় নগরীর উপর বর্ত্তমান কিল্লা প্রস্তুত করিয়া, ত্রিবেণীর সর্ব্বসংহারিণী মূর্ত্তির লোপ সাধন করেন, এবং ইহারই কিয়দ্দূরে বর্ত্তমান নগর নির্ম্মাণপূর্ব্বক ইলাহাবাজ আখ্যায় ভূষিত করিয়া যান।

আকবরস্থাপিত ইলাহাবাজই এখন এলাহাবাদনামে প্রসিদ্ধি

লাভ করিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান দুর্গ ও ত্রিবেণীসঙ্গমের কতকাংশ লইয়াই যে পুরাতন প্রয়াগের অবস্থিতি ছিল, এরূপই অনুমিত হয়।

প্রসিদ্ধ অক্ষয়বট এখনও কিল্লামধ্যস্থ একটী অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূগর্ভস্থিতালয়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারই পার্শ্বে পূর্ব্বোক্ত ভগ্নমন্দিরের অধোভাগ বর্ত্তমান আছে। দুর্গনির্ম্মাণকালে মৃত্তিকা ও প্রস্তররাশি স্তূপীকৃত হওয়ায়, প্রাচীন মন্দির ও বৃক্ষটী উভয়ই অধোগামী হইয়া গিয়াছে। এই ভূগর্ভস্থ অন্ধকার পুরীতে একটী সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করিতে হয়। তীর্থযাত্রীরা দেবদর্শনার্থ এখনও এস্থানে ঢুকিতে পায়। এজন্য কিল্লার দরজা প্রায়ই মুক্ত থাকে। অক্ষয়বট ব্যতীত এই স্থানে অনেক দেবতাও আছেন। এই সুড়ঙ্গপথের অনতিদূরে অশোকস্তম্ভ। মহারাজ অশোক, এই স্তম্ভ খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪০ অব্দে তৈয়ার করিয়া যান, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অশোকের পর, সমুদ্রগুপ্তকর্ত্তৃক ইহা ব্যবহৃত হয়। তাঁহাদের উভয়ের বিষয়ে নানাকথা এ স্তম্ভের পৃষ্ঠে লিখিত আছে। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরও ইহার পৃষ্ঠে অনেক কথা খোদিত করেন। এই স্তম্ভের উচ্চতা ৪৯ ফিট। জনরব এই যে, আরও ১০ ফিট ভূগর্ভে প্রোথিত আছে। ইহার গোড়ার ও উপরের বৃত্তাকার মুখের পরিধি যথাক্রমে ৩ ও ২ ফিট। অতি উত্তম প্রস্তরে ইহা নির্ম্মিত;—আজও যেন নূতন রহিয়াছে। কত শতাব্দীর কত ঝড়বৃষ্টি ইহার মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু আজিও বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই। কত রাজ্য, কত রাজা অতীতের তমসায় লোপ পাইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই প্রস্তরস্তম্ভ আজও

একখানা ঘোষণাপত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, মহারাজাধিরাজ অশোকের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে।

আমি ধীরে ধীরে ত্রিবেণীসঙ্গমে উপস্থিত হইলাম। বর্ত্তমান প্রয়াগতীর্থ ইহার ঘাটগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। ঘাটে পাণ্ডারা বড় বড় পতাকা উঠাইয়া, কাষ্ঠমঞ্চে বসিয়া আছে। পতাকার উপর পতাকা বায়ুভরে সঞ্চালিত হইতেছে। পবন-তাড়িত এই সকল নিশানাগ্রভাগে নানারূপ বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। এই ঘাটগুলির উপরই, দুর্গের পশ্চাৎভাগে বিস্তীর্ণ ময়দানে প্রতিবৎসর মাঘমাসে একটী করিয়া মেলা বসিয়া থাকে। ইহাকে মাঘী মেলা কহে। কিন্তু মাঘমাসের শেষার্দ্ধকে এদিকে ফাল্গুনমাস বলিয়া ধরা হয়। সুতরাং আমার ভাগ্যে এই মেলাদর্শন ঘটিয়া উঠে নাই। এতদ্ব্যতীত দ্বাদশ বৎসর অন্তর একবার করিয়া এখানে কুম্ভমেলার অধিবেশন হয়। তখন নানাদেশ হইতে বহুলোক সমাগত হইয়া থাকে।

আমি একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া, যমুনা ও গঙ্গার শুভ্র-কৃষ্ণ সলিলে স্নান করিলাম। তারপর দুর্গ দর্শন করিয়া, বাসায় ফিরিতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইল।

সেই দিনই রাত্রিতে বন্ধুবরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, ইটাওয়া গমনার্থ ষ্টেসনের দিকে অগ্রসর হইলাম। গাড়ী আজ ভয়ঙ্কর লেট (Late) হইয়া গেল। এদিকে আকাশ মেঘাচ্ছাদিত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অনতিবিলম্বেই প্রবলবেগে ঝড়বৃষ্টি ছুটিল। এলাহাবাদ ষ্টেসন অতি প্রকাণ্ড—চতুর্দ্দিকে আলোকমালাবেষ্টিত হইয়া, যেন ইন্দ্রপুরীর মত শোভা পাইতে-

ছিল। এজন্য প্রকৃতির এই ভীষণ ছবি আমাদের ততটা উপলব্ধি হইল না।

রাত্রি ৩ টার সময় গাড়ী পৌছিল। আমরা দৌড়িয়া যাইয়া স্থান গ্রহণ করিলাম। একটু পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ষ্টেসনের বিশাল মণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া, আমরা যেন একবারে আসিয়া মিল্টনের Chaos এর ভিতর ঢুকিলাম। যাহা হউক, প্রকৃতির এই দুর্য্যোগের ভিতর দিয়া আমাদের গাড়ী সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া ছুটিয়া চলিল। যেন বোধ হইতেছিল, দেবদানবে একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি, আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। গাড়ীর দুই পার্শ্বে শিশিরবারিসিক্ত তৃণরাজির উপর নবোদিতভাস্করের প্রদীপ্তকিরণ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যেন প্রস্ফুটিত কুসুমদামশোভিত নন্দনকাননের ভিতর দিয়া কোন স্বর্গরাজ্যে ছুটিয়া চলিয়াছি।

ইটাওয়া।

৯॥০ ঘটিকার সময় গাড়ী ইটাওয়া বা এটোয়াতে পৌছিল। হিন্দুস্থানীগণ এটোয়াকে ইটাওয়া বলিয়া থাকেন। আমিও সে পন্থার অনুসরণ করিলাম।

এখানে ধর্ম্মশালা নাই। কাজেই আমাকে সরাইয়ে আশ্রয় লইতে হইল। E. I. Ry এর গাইডে এই সরাইয়ের খুব প্রশংসা-বাদ শুনিয়াছিলাম। তখন জানিতে পারি নাই যে, আমাকে এরূপভাবে নিরাশ হইতে হইবে। সরাইয়ের অবস্থাখানা দেখিয়া

আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, তখনই এক্কা ফিরাইয়া চলিয়া যাই। এমন স্থানেও ভদ্রলোক তিষ্ঠিতে পারে? চারিদিকে লম্বা লম্বা খোলার ঘর; মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড অঙ্গিনায় যত রাজ্যের আবর্জ্জনারাশি জমা হইয়া আছে। অসংখ্য শকট ও গরু ঘোড়া ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছে। তাহাদের মলমূত্রত্যাগে স্থানটী কর্দ্দমাক্ত হইয়া গিয়াছে। ঘরগুলির দেওয়াল মৃত্তিকানির্ম্মিত; ছোট ছোট কোঠাগুলিতে আলো বা বাতাস প্রবেশের পথ নাই। সমস্তটা স্থানে যেন কি একটা অপরিষ্কারের ভাব মাখান রহিয়াছে। সরাইয়ের এই নিখুঁত ছবি দর্শন করিয়া, পাঠকই অনুমান করুন, আমার মনের ভাব কি দাঁড়াইল। আমি সঙ্কল্প করিলাম, এখানে কিছুতেই থাকা হইবে না; যত শীঘ্র সম্ভব সহরটী দেখিয়া আজিই প্রস্থান করিব।

তখনই হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া বাহির হইলাম। আমার আসবাবপত্রগুলি গৃহস্বামিনীর নিকট পড়িয়া রহিল। এই স্থলে পশ্চিমের সরাইগুলির একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয়দান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যাঁহারা অতঃপর ভ্রমণে বাহির হইবেন, তাঁহারা সাবধান হইতে পারিবেন।

ধর্ম্মশালায় ও সরাইয়ে একটু তফাৎ আছে। ধর্ম্মশালায় যাত্রীদের থাকিবার ভাড়ার দরকার হয় না, সরাইয়ে ভাড়া লওয়া হইয়া থাকে। পথিকদিগের সুবিধার্থ পরদুঃখকাতর দেশীয় ধনীব্যক্তিগণ ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়া থাকেন; আর সরাই, দরিদ্র ব্যক্তিগণের বা ব্যবসায়িগণের অর্থোপার্জ্জনার্থ স্থাপিত হইয়া থাকে।

পশ্চিমের সরাইগুলি প্রায়ই এইরূপ অপরিষ্কার ও খোলার

ছাদবিশিষ্ট। তবে দিল্লী, আজমীর ও আগ্রা প্রভৃতি বহুজনাকীর্ণ সহরে কোন কোন ধনীব্যক্তি প্রশস্ত চারু-ইষ্টকালয়ে সাহেব-দিগের হোটেলের মত সরাই খুলিয়া, পয়সা উপার্জ্জন করিতে-ছেন বটে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি সামান্য। পূর্ব্বোক্ত সরাইগুলি গবর্ণমেণ্টানুমোদিত এবং মুসলমানরমণীগণ কর্ত্তৃক পরি-চালিত। এক একটী রমণী এইরূপ কয়েকটী ঘর ভাড়া দিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই সকল অমার্জ্জিতরুচি স্বাধীনা ললনাগণের আচারব্যবহার সরাইগুলিকে অধিকতর অব্যবহার্য্য করিয়া তুলিয়াছে। পথিকের পক্ষে তাহাদের সংস্রব সর্ব্বথা বর্জ্জ-নীয়। যাহারা প্রলোভন সম্বরণ করিতে না পারিবেন, তাহারা বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া থাকিবেন, তথাপি এই প্রেতভূমির মৃত্তিকাস্পর্শ করিবেন না। পশ্চিমের কয়েকটী সরাই দেখিয়াই আমার এ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে।

ইটাওয়া ক্ষুদ্র হইলেও অতি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থান। অনেকে হাওয়াপরিবর্ত্তনার্থ এখানে আগমন করেন। মহাত্মা হিউম সাহেবের কল্যাণে এ স্থানের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হই-য়াছে। হিউমগঞ্জের বাজার ও হিউমস্কুল তিনিই স্থাপিত করিয়া যান। এই স্কুল নির্ম্মাণ করিতে ৪১০০০৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। পরিষ্কার রাস্তার দু'পাশে সুন্দর সুন্দর শুভ্র বাড়ী-গুলি বড়ই মনোমুগ্ধকর। সমস্তটা সহর যেন পর্ব্বতমধ্যস্থ একটী দুর্গ। সহরে প্রথম প্রবেশ করিয়াই বাড়ীঘরগুলিকে যেন এক একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেল্লা বলিয়া বোধ হইতেছিল। সর্ব্বত্র টিলাময়; বাড়ীগুলি কোথাও উচ্চ, কোথাও ভয়ঙ্কর নীচু, কোথাও বা কিছু ঢালু হইয়া গিয়াছে। কোথাও টিলার

উপর ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার স্থানে স্থানে টিলার মৃত্তিকা খনন করিয়া, ভিতরেও ইষ্টকালয় স্থাপন করিয়াছে।

ইটাওঁয়া অতি প্রাচীননগর; প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে সোমর্ষি এখানকার পুরাতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সহর পৃথ্বীরাজের বংশধর চৌহানকুলোদ্ভব সংগ্রামসিংহ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। কিল্লার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। যমুনাতীরে একটী পরিত্যক্ত স্থানে উচ্চটিলার উপর এই দুর্গের শেষচিহ্ন দেখিতে উপস্থিত হইলাম। মধ্যাহ্নতপনের প্রচণ্ড কিরণে চারিদিক লোকশূন্য; নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। চারিদিক কিরূপ নিঝুম নির্জ্জনভাব ধারণ করিয়াছে! এই খাঁ খাঁ রৌদ্রে, এই টিলামধ্য ভীষণ ভগ্নদুর্গে একাকী উঠিতে আমার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল। কি করিব, পর্য্যটকের দায়িত্ব কম নহে;—সাহসে ভর করিয়া সেই বনজঙ্গলময় মৃত্তিকাস্তূপগুলি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

যতদূর চাহিয়া দেখি, কেবল টিলা ও মৃত্তিকাস্তূপরাশি। এই মৃত্তিকাস্তূপগুলি এক এক স্থানে এত উচ্চে উঠিয়াছে যে, যে কোন মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া পড়া অসম্ভব নহে। আমি ঘুরিতে ঘুরিতে উঠিয়া, শেষকালে একটা ভগ্নপ্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইলাম। এই ভগ্নপ্রাচীরের স্তরে স্তরে যে কত ঐতিহাসিকতত্ত্ব নিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া যেন কি এক উদাসভাবে হৃদয় সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। ইহার নিকটেই একটী অস্পষ্ট ও সঙ্কীর্ণ রাস্তা;—বরাবর উপরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। আমি এই রাস্তা ধরিয়া কিছু অগ্রসর হইতেই একটী প্রাচীন দুর্গদ্বার হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িল। ওলন্দাজভ্রমণকারী Johannes de

Laet ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে এ দুর্গসম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, এই দুর্গদ্বারের উপর একটী মনুষ্যবদন স্থাপিত ছিল; এবং হিন্দুগণ ইহাকে অত্যন্ত ভয় ও শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিত ও তৈলসিক্ত করিয়া অর্চ্চনা করিত।

এই দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া, আমি অবশেষে দুর্গের সর্ব্বোচ্চস্থানে উপস্থিত হইলাম। এইস্থান অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং আবর্জ্জনারহিত। মধ্যস্থলে "বারদ্বারী" নামক একটী ক্ষুদ্র ইষ্টকালয়, মুক্তহৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছে। এই দালানটী আধুনিক বলিয়া বোধ হইল। কেন যে এ স্থানের অধিবাসীরা 'বারদ্বারীর' নামে একটা গুরুত্ব স্থাপন করিয়াছে, আর কেনই বা দশটী দ্বার সত্ত্বেও ইহার নাম বারদ্বারী হইল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। তবে এই ক্ষুদ্র ইষ্টকালয় হইতে চতুর্দ্দিকের শোভা অতি মনোরম এবং এইখানে উপবেশন করিলে, মুক্তদ্বারপথপ্রবিষ্ট যমুনাশীকরসিক্ত সমীরণ-স্পর্শে ক্ষুদ্র মানবের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে। বোধ হয়, এজন্যই "বারদ্বারীর" এতাধিক সম্মান।

এইস্থানে ক্ষণেক উপবেশন করিয়া, আমি আনন্দাপ্লুতহৃদয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। সে মহান্ দৃশ্য আমার হৃদয়ে চির-অঙ্কিত রহিয়াছে;—ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। ঠিক যেন একটী পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছি। নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকার মত সমতলভূমিতে নানালোক নানা-কার্য্যে ব্যস্ত আছে। একটু নামিয়া আসিলেই আর তাহারা দৃষ্টিগোচর হয় না। লুকোচুরী খেলিবার এরূপ

স্থান বুঝি জগতে আর নাই। পথগুলি উচ্চনীচ হইয়া, পার্ব্বত্যপথের মত ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। দূরে সহরের শুভ্রালয়গুলি মৃত্তিকাস্তূপের ভিতর দিয়া কেমন উকি দিয়া দিয়া চাহিয়া রহিয়াছে। আমি অনেকক্ষণ বিমোহিতাবস্থায় বসিয়া রহিলাম। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিয়া, যমুনার কূলে দাঁড়াইলাম। এখানে আর একটা স্বর্গীয়চিত্র আমার নয়নসমক্ষে প্রতিফলিত হইল। ক্ষীণাঙ্গিনী যমুনা বালুকাসৈকতের ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিতা। উচ্চ টিলার কাল ছায়া তাহার কাল জলে পতিত হইয়া, কি এক স্বপ্নাবরণের মত সমস্ত দৃশ্যটীকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলে মন-প্রাণ মোহিত হইয়া যায়। কোনও জ্যোৎস্নাস্নাত রজনীর গভীর নিশীথে যদি কোন ভাগ্যবান্ ক্ষুদ্র তরণী বাহিয়া এই যমুনাবক্ষে বিচরণ করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চিত তাঁহার জন্ম সফল ও ধন্য হইয়াছে। প্রাণের মধ্যে এই সুন্দর ছবি লইয়া, ধীরে ধীরে যাইয়া একার নিকটে উপস্থিত হইলাম।

আমার একার সামনে আর একখানি সাধারণ ভাড়াটে গড়ীর নিকট কতকগুলি লোক জড় হইয়াছে, দেখিতে পাইলাম। আমার একাওয়ালাকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলাম। সে যাহা বলিল, তাহাতে একটু কৌতূহল জন্মিল। শুনিলাম ইন্দোরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজা যমুনা দর্শন করিতে আগমন করিয়াছেন। মহারাজ জীবিত থাকিতেও "ভূতপূর্ব্ব" হইলেন কেন, এ কথা জানিতে পাঠক-পাঠিকাদিগের কৌতূহল হইতে পারে। শুনিলাম, ইনি পুত্রকে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

এইক্ষণ তাঁহার পুত্রই ইন্দোরের অধীশ্বর। ইঁহার সহিত আর রাজ্যের কোনও সংশ্রব নাই। ইনি এখন সামান্য দীনহীনের বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। দেশভ্রমণে নাকি ইঁহার বড় আনন্দ। দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া পলোয়ান সংগ্রহ পূর্ব্বক কুস্তি বিদ্যার আলোচনা করা ইঁহার নিত্যকার্য্য হইয়াছে। এই নির্দ্দোষ ও বীরত্বপূর্ণ আমোদেই তাঁহার কার্য্যশূন্য দিনগুলি অতিবাহিত হইয়া যায়। শুনিলাম, খরচের জন্য তাঁহাকে বার্ষিক ছয়লক্ষ টাকা পেন্‌সন দেওয়া হয়। মহারাজ এই টাকা হইতেই কতকাংশ দরিদ্রদিগকে দান করিয়া থাকেন।

এখান হইতে আমরা মহাদেবজীর মন্দির ও জুমামসজিদ দর্শন করিতে গেলাম। মহাদেবজীর মন্দির একটী অত্যুচ্চ টিলার উপর স্থাপিত; ইষ্টকনির্ম্মিত সিঁড়ি দিয়া উঠিতে হয়। ১৫০ শত বৎসর পূর্ব্বে কোন ধনী বেণের অর্থে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরাতন মন্দিরই এখন পুনঃসংস্কার করা হইয়াছে।

জুমামসজিদে অনেক কবর বিদ্যমান আছে। কখনো কোন মহাপুরুষের দেহ এখানে সমাধিস্থ হইয়াছে কি না, সে তত্ত্ব আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

বেলা একটার সময় বাসায় ফিরিলাম। সরাইএর নিকটেই বাজার। আপনার ক্ষুদ্র মেটে কুঠরীতে জামা জুতা ছাড়িয়া রাখিয়া একবার বাজারের দিকে গমন করিলাম। ইটাওয়ার এই স্থানটী বেশ জমকাল। অনেক বড় বড় ব্যাপারী এইস্থানে বড় বড় দোকান পাট খুলিয়া বসিয়াছে। সাদা ধব্ ধবে বাড়ীগুলি সূর্য্যকিরণসম্পাতে চক্ষু ধাঁধিয়া দেয়! এক পয়সার চামেলীর তৈল ক্রয় করিয়া, স্নান

করিতে গেলাম। আমার গৃহস্বামিনী "কাঁহার', ডাকিয়া দিল। মুসলমানের সরাইয়ে হিন্দুভৃত্যেরা আসিয়া জল দিয়া যায়। ইহাদিগকে 'কাঁহার' কহে। কূপের জলে কোনরূপে স্নান করিয়া নিকটবর্ত্তী কোন ময়রার দোকানে বসিয়া আহার করিলাম। এস্থানে আহার্য্যসামগ্রী যেমন সস্তা, তেমনি উৎকৃষ্ট। ছয় পয়সার সামগ্রী আমি খাইয়া কুলাইতে পারি নাই।

উদরপরিতৃপ্তি করিয়া, সরাইওয়ালীর পয়সা চুকাইয়া দিলাম। ঘরভাড়া দুইআনা, চারপেয়ের জন্য দু'পয়সা, জলের জন্য দু'পয়সা, একুনে এই তিন আনা আমাকে দিতে হইল। তারপর একার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, আবার ষ্টেসনাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

এখানকার একাগুলি একটু ভিন্ন রকমের। অতঃপর যত পশ্চিমে যাওয়া যায়, সকল স্থানেই এইরূপ একা প্রচলিত। একটী ত্রিকোণাকার বাক্সের উপর আরোহীর স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। এই বাক্সের ভিতর পথিকের আসবাবপত্র রক্ষিত হইয়া থাকে।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকগণ বড় অলঙ্কারপ্রিয়। হস্তে, গলায়, বাহুতে, মুখে ও পদে অসংখ্য অদ্ভুত অদ্ভুত অলঙ্কার ধারণ করে। তাহাদের এক একটা এমন ভারি ও কদাকার যে, দেখিলে হাসি চাপিয়া রাখা দুর্ঘট হয়। আমাদের গাড়ী ছাড়িয়া দিলে, আগ্রার পথে আজ কোন রমণীর একটী নথের বাহার দেখিয়া, আমি একবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। এই নথের ব্যাসের পরিমাণ কিছুতেই আধহাতের কম নহে। আমি গল্প বলিতেছি, পাঠক এমন মনে করিবেন না। আমি কেবলি ভাবিতেছিলাম,

কোন্ হতভাগ্য পুরুষ এই রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যেই হউন, প্রিয়তমার অধরসুধাপান করিতে নিশ্চয়ই তাহাকে বেগ পাইতে হয়। এই ভীষণ নথ গলায় আটকাইয়া, ফাঁসি যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। রমণী অতিকষ্টে অবগুণ্ঠনের দ্বারা, তাহার এই দুর্ভরভূ আবরিত করিয়া রাখিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। অবগুণ্ঠনাবৃত নথটা তাহার মুখসংলগ্ন হইয়া, সমস্তটা মস্তককে একটা আকাশপ্রদীপের ন্যায় বস্ত্রাচ্ছাদিতলণ্ঠনে পরিণত করিতেছিল।

আগ্রা।

আমাদের গাড়ী সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আসিয়া তুণ্ডলা পৌছিল। এখান হইতে আগ্রা ৮।১০ মাইল দূরবর্ত্তী; আমাদিগকে গাড়ী বদলাইয়া অন্য গাড়ীতে উঠিতে হইল। তুণ্ডলা খুব বড় ষ্টেসন;—মিঠাই, চেনাচুর, দুধ, রাবড়ী, পান ও সিগারেট ওয়ালার হাঁকে ডাকে সর্ব্বদাই সরগরম। সন্ধ্যার সময় নানাদেশীয় যাত্রিগণের ব্যস্তসমস্তভাব এবং চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি বড়ই আমোদজনক বোধ হইতেছিল।

গাড়ী যমুনার পুলের উপর উঠিলে, আমি তাজের মিনার দেখিবার প্রয়াসে মস্তক বাহির করিয়া বসিলাম। আজ আমার মনে কত কি হইতেছে, তাহা কে বলিবে? বিবাহরজনীতে প্রিয়তমার অপরিচিতমুখখানি দেখিতে যত না আগ্রহ হয়, তাজমহলের অপরূপদৃশ্য দেখিবার জন্য আমার ততোধিক

কৌতূহল জন্মিতেছিল। এত নিকটে আসিয়াছি, তথাপি যেন তিল অপেক্ষা করিতে সাহস হইতেছে না। কে জানে, বিশ্বনিয়ন্তার অঙ্গুলিহেলনে আজ রজনীতেই যদি আমার এই নশ্বরদেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়! তবে ত আর জীবনে তাজ দেখা হইল না! জীবনের একটী সাধ অপূর্ণ রহিয়া গেল।

কিন্তু আমার চেষ্টা ফলবতী হইল না। আঁধারের ভিতর সহরের ও ষ্টেসনের আলোকমালা ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি-গোচর হইল না। আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ কেবল সম্মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলাম। জগতের সকল আঁধার পশ্চাতে ফেলিয়া, আমি যেন এক আলোকময় রাজ্যে ছুটিয়া চলিয়াছি। Wordsworth এর কবিতা "Stepping westward" আজ আমার নিকট বাস্তবে পরিণত হইল। তখন মনে হইতেছিল,—

> Behind, all gloomy to behold ;
> And stepping westward seemed to be
> A kind of heavenly destiny :—

পুল পরিত্যাগ করিয়া তটস্পর্শ করিতেই, আগ্রাদুর্গের অভ্র-ভেদী প্রাচীর আমাদের নয়নপথে পতিত হইল। নৈশাধারে সেই উন্নত প্রাচীর যেন অতীতগৌরবের সাক্ষীস্বরূপ সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া ছিল।

গাড়ী আসিয়া ষ্টেসনে পৌছিল। ষ্টেসনটী খুব জাঁকজমক-সম্পন্ন। চারিদিকে অসংখ্য আলোকমালা নিঃশব্দে ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহার একদিকে E. I. R. ও G. I. P. রেলওয়ের এবং অন্যদিকে R. M. Rএর গাড়ী অপেক্ষা করিয়া থাকে।

লাইনের উপর দিয়া উভয় ষ্টেসনে যাতায়াতের জন্য একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

আমরা গাড়ী হইতে নামিতেই অসংখ্য সরাইওয়ালা প্রদীপহস্তে আসিয়া আমাদিগকে, বাসস্থানের প্রয়োজন আছে কি না, বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। এক একজন যাত্রিককে লইয়া এক একবার তাহাদের মধ্যে বাদবিসম্বাদ ও বচসা হইতে লাগিল। আমি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া, প্রথমতঃ ধর্ম্মশালায় উপনীত হইলাম। কিন্তু আগ্রার ধর্ম্মশালা অপেক্ষা সরাইগুলিই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। আমি অবশেষে তোতারামের সরাইএ আশ্রয় লইলাম।

এখানে আসিয়া দেখি, আরও দু'টী বাঙ্গালীবাবু ইতিপূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়া পাকশাকের আয়োজন করিতেছেন। আমিও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া গেলাম। কিন্তু সেদিনকার মত আমাকে বাজারের লুচি কচুরী খাইয়াই রাত্রিযাপন করিতে হইল। আগ্রার আহার্য্যদ্রব্যাদি বড়ই উপাদেয়; এমন লুচি ও কচুরী কখন খাইয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। লুচি কচুরী পাইয়া, আমি ভাতের অভাব একবারে বিস্মৃত হইয়া গেলাম।

এখানকার সরাইএর ঘরগুলি বেশ ভাল ও পরিষ্কার। যাত্রিদের কোনই অসুবিধা হয় না। আদরযত্ন যথেষ্ট। বরং অত্যধিক যত্নে কখনও কখনও উত্তাক্ত হইয়া উঠিতে হয়।

পরদিন ২৫ শে মাঘ শুক্রবার, গাত্রোত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই দরজার বাহিরে অসংখ্য লোকের কলরব শুনিতে পাইলাম। বাহির হইয়া দেখি, ফেরিওয়ালারা নানারূপ জিনিসপত্র লইয়া আসিয়া,

ক্রেতার উদ্দেশে হাঁকডাকের ছড়াছড়ি করিতেছে। আমাকে পাইয়াই তাহারা আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল। তারপর "এটা চাই, ওটা চাই" বলিয়া জ্বালাতন করিয়া তুলিল। নানারূপ সুন্দর সুন্দর পাথরের জিনিষগুলি বড়ই মনোমুগ্ধকর। কেহ একটা তাজমহল দেখাইল, কেহ নানারঙের প্রস্তররঞ্জিত নানারূপ বাক্স, কৌটা ও প্লেট বাহির করিয়া দিল। কেহ আতর লইয়া আসিল; কেহ কানের ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য আমার শ্রবণেন্দ্রিয় স্পর্শ করিতে চাহিল। আমি রুক্ষস্বরে বলিলাম, "আমার কিছুরই দরকার নাই।" কিন্তু "কাকস্য পরিবেদনা"—তাহারা আরও চাপিয়া বসিয়া, এইবার আপনাপন জিনিষের গুণানুবাদ ও সার্টিফিকেট পেশ করিতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া আমি—"যঃ পলায়তি স জীবতি"—এই সুবুদ্ধির অনুসরণপূর্ব্বক এক দৌড়ে যাইয়া যমুনাতীরে দাঁড়াইলাম।

তখন নাটকের দৃশ্য পরিবর্ত্তনের মত, হঠাৎ এক নবছবি আমারনয়নপথে পতিত হইয়া গেল। কৃশাঙ্গী যমুনা বালুকরাশির ভিতর দিয়া, মৃদুমন্দ প্রবাহিতা। সে ক্ষুদ্রবীচিমালিনী যমুনাবক্ষে অরুণরাগরঞ্জিত তাজমহলের চারুছবি প্রতিফলিত হইয়া ঈষৎ দুলিতেছিল। ইহারই উপরে ঘনসন্নিবিষ্ট বিটপীশ্রেণীর শ্যামলবক্ষে, এই অপরূপ সমাধিমন্দিরের উজ্জ্বল ধবলমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আমি আত্মহারা হইয়া গেলাম। উহার অত্যুচ্চ মিনারচতুষ্টয় চিত্রার্পিতের ন্যায় নীলাম্বরে শোভা পাইতেছিল। আমার বোধ হইল, যেন এক স্বপ্নরাজ্যের প্রিয়তম দৃশ্যটী আজ বাস্তবে পরিণত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া প্রকটিত হইয়াছে। আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর যমুনার খর-

স্রোতে অবগাহনান্তর বিস্ময়বিহ্বলচিত্তে ধীরে ধীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

বাসায় আসিয়া দেখি মস্ত হুলুস্থুল বাঁধিয়া গিয়াছে। সাড়ে চার হাত লম্বা ও দেড় হাত প্রস্থ এক পাঠান, চীৎকার করিয়া প্রাঙ্গণ কম্পিত করিতেছে; আর মধ্যে মধ্যে নানারূপ শপথ করিয়া কি কহিতেছে। নিকটে একটা সরাইএর ভৃত্য দাঁড়াইয়া, তাহাকে ভাড়ার পয়সার জন্য তাগাদা করিতেছে। পাঠান পয়সা দিতে পারিতেছে না। কহিতেছে, "আমি বাজার হইতে কিছু কাপড় বিক্রী করিয়া আনিয়া দিতেছি, মেহেরবানী করিয়া একটু অপেক্ষা কর।"

ভৃত্য কিছুতেই কথা শুনিতেছে না। বলিতেছে, "না, তা হইবে না। তুই জাতিতে পাঠান, পলাইয়া যাইবি। এখনই আমার পয়সা দিতে হইবে।"

এইরূপ বাদবিসম্বাদ অনেকক্ষণ চলিলে পর, পাঠান তাহার কাপড়চোপড় খুলিয়া আমাদিগকে দেখাইতে লাগিল; আর কহিল, সে এই সমস্তই অতি কম মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে; এবং যেমন করিয়া হয়, ভাড়ার পয়সা চুকাইয়া দিয়া দিল্লী চলিয়া যাইবে। লোকটার দুরবস্থা দেখিয়া, আমরা কিছু কিছু কাপড় খরিদ করিলাম। যেটা ৫৲ পাঁচ টাকা দিয়া খরিদ করিলাম, উহার প্রকৃত দাম ১৫৲ টাকা ছিল বলিয়া, পাঠান আমাদিগকে বুঝাইয়া দিল। সে দিন কিছু ধরিতে পারি নাই। কিন্তু অতঃপর আমি আর একবার আগ্রায় আসিয়া, দ্বিতীয় একটী সরাইতে আশ্রয় লইয়াছিলাম। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, সেইদিন সেই স্থানেও আমি এই দু'টী

লোককে এই অবস্থারই দেখিতে পাইয়াছিলাম। ঠিক এই অভিনয় হইতেছিল! এইরূপ প্রবঞ্চনাময় সহরে আমি আর তদবধি কোনই মূল্যবান্ দ্রব্য খরিদ করি নাই।

আহারান্তে আমরা তাজ দেখিতে বাহির হইলাম। আমার সঙ্গে সেই দু'টী বাঙ্গালীবাবু ও তাহাদেরই সঙ্গীয় একজন ব্রজ-বাসী। এই ব্রজবাসী তুণ্ডলা হইতে বাবুদিগকে পাকড়াও করিয়াছে; বৃন্দাবন লইয়া যাইবে।

আগ্রার প্রাচীন নাম অগ্রবন' বলিয়া কথিত হয়। বৃন্দাবন যেমন একটী বন ছিল, অগ্রবনও' তেমনই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অন্ত-তম বিহারকাননরূপে ব্যবহৃত হইত। ব্রজদর্শনার্থীগণ প্রথমে এই কাননে না প্রবেশ করিয়া, ব্রজে ঢুকিতে পারিতেন না; এই জন্ম ইহার নাম অগ্রবন।

যাহা হউক, এতদ্ব্যতীত আগ্রার তেমন প্রাচীনত্বের কোন ইতিহাস আমাদের নিকট বিদ্যমান নাই। আগ্রা যে অতি প্রাচীন সহর, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। ভারতসম্রাট্ জাহাঙ্গীর স্বীয় দৈনিকস্মরণলিপিতে নিজহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন যে, সুলতানমামুদের সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিক, এ নগরীর উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। লোদীবংশীয় সেকেন্দর সাহের সময় হইতেই আগ্রার ক্রমোন্নতি বিকাশ পাইতে থাকে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে সেকেন্দর লোদী এইখানে রাজধানী স্থাপিত করেন, এবং প্রাচীন হিন্দুদুর্গ বাদলগড় পুনর্গঠিত করিয়া যান। তাঁহারই নামানুসারে বর্ত্তমান আকবর-সমধিক্ষেত্রের নাম সেকেন্দ্রা হইয়াছে।

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইব্রাহিম লোদী, পানিপথের সমরে পরাস্ত

হইলে, বিজয়ী বাবর সাহ ভারতে মোগলসাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিয়া, এই খানেই আসিয়া বাস করিতে থাকেন। যমুনার পূর্ব্বতীরে প্রাচীননগরের ভগ্নাবশেষের উপর তাঁহার বাসগৃহ নির্ম্মিত হয়। তাহার নির্ম্মিত চরবাগ প্রাসাদেই তিনি অবশেষে প্রাণত্যাগ করেন। বর্ত্তমান রামবাগও তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

তাঁহার মৃত্যুর পরও হুমায়ুন ক্রমাগত নয় বৎসরকাল এইখানে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সময় সের শা শূর তাহাকে পরাস্ত করিয়া, বাদলগড় অধিকার করেন ও তথায় বাস করিতে থাকেন। কালক্রমে মোগলসাম্রাজ্য পুনঃস্থাপিত হইল। আকবর সাহ সিংহাসন অধিকার করিয়াই আগ্রায় রাজধানী স্থাপন করিলেন। সেই অবধিই আগ্রা মোগলসম্রাটগণের রাজধানীরূপে পরিণত হইল। আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাহজাহানের সময় আগ্রাতেই সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত; এবং দিল্লীর রাজগৌরব অনেকটা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে আগ্রার যেরূপ উন্নতিসাধিত হইয়াছিল, তাহা জাহাঙ্গীরের স্মরণলিপি পাঠে কতক অবগত হইতে পারা যায়। "তৎকালে সমস্ত পৃথিবীতে আগ্রার মত সমৃদ্ধিশালিনী নগরী কচিৎ দৃষ্ট হইত;"—এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কোনও সাহেব এই নগরী দর্শন করিয়া, তৎকালীন লণ্ডনের সহিত ইহাকে আসনে স্থাপিত করিয়াছিলেন (Calbanke's letter to Sir T. Smith)। মহাত্মা ফিচ্ ইহাকে লণ্ডন অপেক্ষাও সমৃদ্ধিশালিনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

আগ্রার বর্ত্তমান কিল্লা আকবর বাদসাহ নির্ম্মাণ করিয়া যান।

কিন্তু দুর্গমধ্যস্থ প্রাসাদাবলি সাহজাহান কর্ত্তৃক অনেক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সেকেন্দ্রার নির্ম্মাণকার্য্যও আকবর নিজেই আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে জাহাঙ্গীরের সময় উহা সম্পূর্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত যমুনার অপরতীরস্থ চাকসোধ ইতমদ্দৌলা জাহাঙ্গীরকর্ত্তৃক নির্ম্মিত। কিন্তু আগ্রার বর্ত্তমান সমৃদ্ধি সাহজাহানেরই কীর্ত্তি। তিনিই আপন প্রিয়তমাসঙ্গিনী অনর্জুমান বানুর (তাজমহলবেগমের প্রকৃত নাম) সমাধির উপর তাজমহল, এবং দুর্গমধ্যস্থ অন্যান্য অপূর্ব্ব প্রাসাদনিচয় নির্ম্মাণ করিয়া যান। এই তাজমহলের জন্যই আজও আগ্রার প্রাচীন সমৃদ্ধি একবারে বিস্মৃতির গর্ভে লোপ পায় নাই;—আজও সহস্র সহস্র পর্য্যটক পৃথিবীর নানাপ্রান্ত হইতে অসংখ্যক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক আসিয়া, এ স্থানে উপস্থিত হয়।

তাজ দেখিয়া কোন লেখক আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তাজমহলে পৃথিবীর কোনই উপকার সাধিত হইতেছে না—এ অর্থ অন্য কোন লোকহিতকরকার্য্যে দান করিয়া গেলে, অথবা এতদ্দ্বারা পান্থশালাদি নির্ম্মিতহইলে অনেক সুফল ফলিত।"

তাজে জগতের কিছু উপকার হ'ক্ না হ'ক্, আগ্রার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এজন্য আগ্রাবাসী ইহার নিকট চিরানুগত থাকিবে। বিশেষতঃ এই লেখক বিস্মৃত হইতেছেন যে রাজ্য-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল পান্থনিবাসাদিও লোপ পাইবার সম্ভাবনা আছে;—নতুবা তৎকালে পান্থশালার অভাব ছিল না। তাজমহলের বাহিরেই বিস্তৃত কারবনসরাই স্থাপিত হইয়াছিল। সে গৃহগুলি এখনও বিদ্যমান আছে; কিন্তু কে আর আজ এইখানে দরিদ্রকে আশ্রয় দান করে? বাস্তবিক, তাজের

সঙ্গে আগ্রার এক অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়া গিয়াছে। যে দিন এ সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হইবে, সেই দিন আগ্রার সম্পদ্‌ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে; সেইদিন হইতে ভারতের এইটী গৌরবধ্বজা অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

বৃহৎ কিল্লা প্রাচীরের নীচদিয়া যমুনার তীরে তীরে প্রশস্ত সড়ক তাজমহলের দিকে চলিয়া গিয়াছে। দুর্গ ছাড়িয়া একটু অগ্রসর হইতেই আমরা এক মনোরম উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ইহারই এক পার্শ্বে তাজমহল অবস্থিত। কিন্তু এই উদ্যান অতি আধুনিক, এমন কি ইহার নির্ম্মানকার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। এই বিস্তৃত ভূভাগে পূর্ব্বে আমীরওমরাহদের আবাসভবন ছিল। আজ তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সার এণ্টনি মেকডনেল এই রম্যোদ্যানের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন। সেই হইতে ইহার নাম মেক্‌ডনেলপার্ক হইয়াছে। ইহার মত বিস্তৃত ও সুশ্রী উদ্যান জগতে দুর্লভ। উচ্চ-নীচ ভূমিখণ্ডের উপর যত্নসজ্জিত দূর্ব্বাদলরাশি বড়ই নয়নপ্রীতি-কর। যে দিকে চাও চক্ষু জুড়াইবে। এই নানালতাপুষ্পা-লঙ্কৃত তরঙ্গায়িত কাননের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াই, আফগা-নিস্থানের আমীরবাহাদুর স্বীয় রাজধানীতে এমনই একটা উপবনপ্রস্তুতের বাসনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই বাগানের এক পার্শ্বে একটী উন্নতভূমিতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ধাতুনির্ম্মিত অতি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পদতলে চতুর্দ্দিকবেষ্টন করিয়া, একটী কৃত্রিম জলাধার। সলিলোত্থিতা এই মনোহারিণী মূর্ত্তি আধুনিক ভাস্করের অপূর্ব্ব শিল্পের পরিচয় দিতেছে।

আমরা বৃক্ষসারিপরিশোভিত অতি রমনীয় একটী কানন-পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতে, অবশেষে তাজমহলের প্রাচীর অতিক্রম করিলাম। প্রবেশ করিতেই সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণভূমি দৃষ্ট হইল। ইহার চতুর্দ্দিকে লম্বা লম্বা লোহিতপ্রস্তরনির্ম্মিত অনতিউচ্চ হর্ম্ম্যরাজি শোভা পাইতেছে। এইখানে অতিথি-শালা স্থাপিত ছিল। দূর-দূরান্তর হইতে আগত পথিকগণ এই-খানে আশ্রয় পাইত। এই প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলেই বিশাল ফটক। শতফিট উচ্চ, এই ফটক দেখিলেই তাজের বিশালত্বের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। লাল প্রস্তরের উপর সাদা মার্ব্বলপাথরের অপরূপ কারুকার্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া যাইতে হয়। তোরণের উপরে সাদাপ্রস্তরফলকে কোরাণো-দ্ধৃত অনেক কথা অঙ্কিত আছে। এই ফটকের উর্দ্ধতলে সিঁড়ি বহিয়া উঠিতে পারা যায়। তথায় অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কক্ষ আছে। এই ফটক অতিক্রম করিলেই বিশ্ববিমোহন তাজ-মহলের প্রশান্তছবি দর্শকের মন বিহ্বল করিয়া দেয়।

আমরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতেই যেন কোন যাদু-করের দণ্ডস্পর্শে সহসা কল্পনার মায়াময়রাজ্য নয়নসমক্ষে প্রসারিত হইয়া গেল। সে চারুছবি একমাত্র কল্পনারাজ্যেই সম্ভব হইয়া থাকে। একটী উচ্চ ও অতি প্রশস্ত প্রস্তরবেদীর উপর এই সমাধিমন্দির স্থাপিত। বেদীর চারিকোণে চারিটী মিনার গগন ভেদ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। মধ্যস্থলে আরও একটী মর্ম্মরপ্রস্তরমণ্ডিত ক্ষুদ্রতর বেদীর উপর সেই বিশুদ্ধমর্ম্মরনির্ম্মিত শ্বেতোজ্জ্বলসৌধ, কুসুমদামগ্রথিত স্বর্ণ-নিকেতন-প্রায় শোভা পাইতেছে। বেদীর পদমূল হইতে এক

অপ্রশস্ত অথচ সুদীর্ঘ পাষাণমণ্ডিতজলাশয় ফটক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তাহাতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোয়ারা; যেন সরোবরে পদ্ম ফুটিয়াছে। এই জলাধারের ঠিক মধ্যস্থলে আর একটী উন্নতভূমির উপর বৃহৎ চৌবাচ্চা; তাহারই ভিতর ফোয়ারার জলে ছোট ছোট লাল নীল মৎস্যগুলি কেমন খেলিয়া বেড়াইতেছে। ইহার বামে ও দক্ষিণে সারি সারি সাইপ্রেস বৃক্ষশ্রেণী। তাহাদেরই পার্শে রমনীয় উদ্যান, দেখিলে চক্ষু স্নিগ্ধ হয়।

শত শত লোক মুক্তকণ্ঠে তাজমহলের এই অপরূপ রূপ-রাশির প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। আমার মত ক্ষুদ্রপ্রাণী এ বিষয়ে মূক থাকিলে তাজমহলের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে তাজমহল দর্শন করিয়া একবারে চুপ করিয়া থাকাও বুঝি ধৃষ্টতাব্যঞ্জক;—তাই কিছু বলিতে হই-তেছে।

কিন্তু কি বলিব? যে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যরাশির বর্ণনা করিতে যাইয়া, ভাষাসাগর মন্থন করিয়াও অনেক অনেক কবি কৃতকার্য্য হন নাই, অক্ষমলেখনিহস্তে আমি কিরূপে তাহা বর্ণনা করিব?

পত্নিপ্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন—তাজমহল! এ কল্পনাময়ী অপার্থিব ছবি একমাত্র এই স্বর্গীয়প্রণয়েরই উপযুক্ত স্মরণ-চিহ্ন। প্রেমাশ্রুতে গজদন্ত দ্রব করিয়া বুঝি সাহজাহান এ কবিতাময় সমাধিমন্দির গঠিত করিয়াছিলেন; তাই আজ এই শান্তিপুরীদর্শনমাত্র পথিকহৃদয়ে এক অপূর্ব্ব করুণগীতি মুখরিত হইয়া উঠে। সে সঙ্গীতঝঙ্কারে হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে কত সুর বাজিয়া উঠে তাহা কে বলিবে? প্রেমিক সাহজা-

হান পার্থিব পদার্থে কল্পনার এক অপার্থিব প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। এ ছবি চির নূতন;—অথচ চির-পুরাতন! যেন স্বপ্নের যবনিকান্তরালে বহুদিন এ ছবির অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছি,—যেন দেখিতে দেখিতে কতদিন ইহা গগন মার্গে লীন হইয়া গিয়াছে! ধন্য সাহজাহান, স্বর্গের দুর্লভ সামগ্রী তুমি মানবের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছ! এ কীর্ত্তি অক্ষয়, অব্যয়! কোথায় আজ বাবর? কোথায় সেরসা? কোথায় আকবর? আউরঙ্গজেবই বা কোথায়? ইতিহাসের শুষ্ক ঘটনা-বলী ব্যতীত তাহাদের সকল নিদর্শনই আজ কালের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। আছ কেবল তুমি! তোমার প্রণয়ার্দ্র কোমল অন্তরটী আজও এই সমাধিমন্দিরের ভিতর বসিয়া জগৎকে নিঃস্বার্থ ভালবাসায় অনুপ্রাণিত করিতেছে।

শৈশবে একদিন রহস্য করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলাম, "তাজ-মহলকে বিবাহ করিব।" শুনিয়া বন্ধুবর্গ হাসিয়া উঠি-য়াছিলেন। বহুদিন পর, আমার সেই পূর্ব্বমনোনীত প্রেয়সী-সদনে উপস্থিত হইয়া, আজ কিন্তু তেমন কিছুই হাসিবার কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। বাহ্যিকজীবনে তাজমহলের সহিত পরিণয়পাশে বদ্ধ হওয়াটা যতই অসঙ্গত বিবেচিত হউক, কল্পনার জগতে যে অনেকের সঙ্গেই এই সৌন্দর্য্যময়ীর এমনতর একটা নৈকট্যসম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে তাহা তত অসম্ভব মনে হইল না। তাজের সেই দ্বিরদরদশুভ্রকোমলদেহে যেন একটা শান্তিময় ইন্দ্রিয়জ্ঞানবর্জ্জিত প্রাণ চিরসঞ্জীবিত রহিয়াছে এবং অনেক সৌন্দর্য্যপিপাসু নায়ক-হৃদয়ে ইহাও যেন অনন্তসৌন্দর্য্যপিপাসার উদ্রেক করিয়া দেয়। বৈদেশিককবি

Wordsworth প্রকৃতির ভিতর প্রাণ গঠন করিয়াছিলেন; দিল্লীশ্বর সাহজাহান জড়পদার্থে প্রাণ পূরিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু যে সতীসাধ্বীসুন্দরীর উপর এই বিশ্বমনোমোহন সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার কথা কি একবারও কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছ? যদি না ভাবিয়া থাক, তবে তুমি একান্ত অকৃতজ্ঞ। এই প্রণয়মন্দিরে আসিয়াও যদি তাহার জন্য তোমার একবিন্দু অশ্রু ক্ষরিত না হইয়া থাকে, তবে পথিক, এখনই তুমি এ প্রাসাদ পরিত্যাগ কর। এ মন্দির তোমার মত হৃদয়হীনের জন্য নহে।

সাহজাহানপ্রিয়তমা অর্জ্জুমানবানু নারীকুলে এক উত্তম চিত্র! একাধারে এরূপ রূপগুণের সমাবেশ জগতে অতি দুর্লভ। নুরজাহানও রূপবতী ছিলেন; তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী তাজমহলও তদ্রূপ রূপবতী;—কিন্তু সরলতা, সত্যনিষ্ঠা ও পাতিব্রত্যের মাহাত্ম্যে ভ্রাতুষ্পুত্রীর চরিত্র যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, নুরজাহানের চরিত্র তেমন বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। এই রমণীর অপার্থিবপ্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া, বাদসাহ যেরূপ নিষ্কলঙ্ক জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন, সমগ্র মোগলইতিহাসে তাহার উদাহরণ পাওয়া যায় না। কথিত আছে, মমতাজের জীবিতকালে সাহজাহান অন্যস্ত্রীগত হন নাই। আজন্ম বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত ভারতসম্রাটের জীবনে এতাধিক পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি করা একটী ক্ষুদ্র অবলার পক্ষে সামান্য ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। সাধ্বী মমতাজমহলও প্রিয়তমের এই আযাচিত অনুগ্রহের প্রতিদান করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। আজন্ম তিনি প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন, এবং মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও প্রেমবিহ্বলদৃষ্টিতে তাঁহার

মুখখানি দেখিতে দেখিতে এ সংসার পরিত্যাগ করেন। পত্নীর প্রাণবিয়োগান্তে, বিধবা যেমন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, সাহ-জাহানও তেমনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন; রাজকার্য্যে অমনোযোগিতা লক্ষিত হইল। তিনি রাজ্য ও রাজকোষ পণ পূর্ব্বক, জগতের মণিমাণিক্য একত্রীভূত করিয়া, তাঁহার সাধের মমতাজের উপর তাজমহল নির্ম্মাণ করিলেন।

আমরা অতি সন্তর্পণে প্রাঙ্গণভূমি অতিক্রম করিয়া, বেদীর উপর আরোহণ করিলাম। শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিতে, দুই দিকের উজ্জ্বল প্রস্তরে আমাদের প্রতিমূর্ত্তিসকল প্রতিফলিত হইতে লাগিল। তারপর যখন সূক্ষ্ম প্রস্তরজালবেষ্টিত নানাকারুকার্য্যময় মন্দিরদ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন?—তখন যে অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্য আমাদের নয়নপথে পতিত হইল, জগতে তাহার তুলনা নাই, ভাষায় তাহার বর্ণনা হয় না। সেই দুর্ল্লভপ্রস্তরাদিখচিত উজ্জ্বলমর্ম্মরসৌধের অপরূপ ছবি দর্শন করিয়া পূর্ণাবেগে হৃদয় চাপিয়া ধরিলাম।

এই সমাধিমন্দির বাইশবৎসরের অক্লান্তপরিশ্রমে চারিকোটী মুদ্রাব্যয়ে সহস্র সহস্র শিল্পীদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাষ্ট্র-বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে কতবার ইহার বহুমূল্যমণিমুক্তাদি অপহৃত হইয়াছে, কিন্তু আজও তাজমহল সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা স্বল্পাভরণা রমণীর মত, আপন গৌরবে আপনি মহিমান্বিত হইয়া শোভা বিস্তার করিতেছে। তাজের অনুরূপ আর কিছু কোথাও দেখি নাই—কখনও দেখিব না।

প্রস্তরজালাচ্ছাদিত সুবৃহৎ দরজার সম্মুখেই আর এক সারি সোপানশ্রেণী ছিদ্রপথে কবরখানায় নামিয়া গিয়াছে। আমরা

এই অন্ধকারাবৃতঘরে ঢুকিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে রাজদম্পতির অনন্তপ্রেমশয্যা দর্শন করিলাম। যে বহুমূল্য প্রস্তররাজি আজ এই সমাধিমন্দির অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে, তাহারা এই বিমলপ্রেমবন্ধনের নিকট কত তুচ্ছ!

আমরা উপরে উঠিয়া গম্বুজের নীচে, যেখানে অত্যাশ্চর্য্য রত্নাদিখচিত ও লতাপুষ্পাদিসুশোভিত প্রস্তরজালের (Marble Screen) প্রাচীরে উক্ত কবরদ্বয়ের অনুরূপ দুইটী নকল সমাধি শোভা পাইতেছিল, সেইস্থানে প্রবেশ করিলাম। এখান হইতে, গম্বুজের ভিতরদিকে যে সকল ভুবনবিখ্যাতচিত্রাদি খচিত হইয়াছিল, তাহা দর্শন করিয়া মোহিত হইয়া গেলাম। অতঃপর আমরা যমুনার তীরে কিছুকাল উপবেশন করিয়া, বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

তখনও দিবাবসান হয় নাই। আমরা জুমামসজিদ দর্শন করিয়া, চকে বেড়াইতে গেলাম। ষ্টেসনের নিকটেই জুমামসজিদ সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। সাহজাহানদুহিতা জাহানারাবেগম কর্ত্তৃক এই প্রকাণ্ড ভজনালয় ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। সৌন্দর্য্য ও সম্পদে দিল্লীর জুমামসজিদ অপেক্ষা অনেক হীন হইলেও, আয়তনে ইহা নিকৃষ্ট নহে। প্রাচীরবেষ্টিত উচ্চ প্রাঙ্গণের মধ্যে ক্ষুদ্র সরোবর। এখানে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া, উপাসকগণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এই মসজিদের দেওয়ালগুলি প্রায় ৭।৮ হাত পুরু। ইহার দুইপার্শ্বে স্ত্রীলোকদিগের উপাসনার জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

আগ্রার চকের পূর্ব্বসম্পদ এখনও লুপ্ত হয় নাই। প্রস্তর মণ্ডিত অপ্রশস্ত রাস্তাগুলির দুইপাশে পাথরের নানাকারুকার্য্যময়

সামগ্রী শোভা পাইতেছে। নানাদেশীয় বণিকদিগের পণ্য-বীথিকাগুলি উত্তমরূপে সজ্জিত; দেখিলে মন প্রফুল্লিত হইয়া উঠে। রাস্তা দিয়া অসংখ্য জনস্রোত দিবারাত্র মন্দ্রধ্বনি করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে। নানারূপ ফেরিওয়ালাগণ আপন আপন পণ্যদ্রব্যগুলি উত্তমরূপে সাজাইয়া নানাস্বরে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই সকল দৃশ্যের মধ্যে আমি আগ্রার ভূতপূর্ব্বরাজকীয়গৌরবের চিহ্ন কিছু-কিছু দেখিতে পাইলাম। অতীতের স্মৃতি জাগরিত হইয়া, আমাকে কেমন উদাস করিয়া ফেলিল।

সেইদিন রাত্রিতেই স্বজাতীয় বন্ধুদের অনুরোধে, আমাকে বৃন্দাবন ও মথুরার অভিমুখে যাত্রা করিতে হইল। ইহার ৮।১০ দিন পরে পুনরায় আগ্রায় আগমন করিয়া, দুর্গ, সেকেন্দ্রা ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থানে গমন করি। ফতেপুরসিক্রিও এই সময়েই পরিদর্শিত হয়। কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থ এই স্থানেই তাহাদের কথা বিবৃত হইবে।

৫ই ফাল্গুন অপরাহ্নে সেকেন্দ্রা দর্শনার্থ গমন করিলাম। এই স্থান ষ্টেসন হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী। একারোহণে যাইতে হইল। আগ্রার দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে তাজমহলের পরই আকবর-সমাধি সেকেন্দ্রা, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আকবরের জীবিতকালেই এই মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় পুত্র জাহাঙ্গীরকর্ত্তৃক ইহা সমাপ্ত হয়। সেকেন্দরলোদীর আবাসস্থল সেকেন্দ্রানগরী হইতেই এই মন্দিরের নামকরণ করা হইয়াছে।

একটী বিস্তীর্ণ উদ্যানের ভিতর এই প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির

স্থাপিত। প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের চারিদিকে লোহিতপ্রস্তর-গঠিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চারিটী তোরণ। মন্দিরের পদমূল হইতে এই তোরণ-চতুষ্টয়পর্য্যন্ত অতি উচ্চ ও প্রশস্ত চারিটী প্রস্তরমণ্ডিত রাস্তা বিস্তৃত হইয়াছে। দ্বিরদরদোজ্জ্বলমিনার-চতুষ্টয়শোভিত প্রধানফটকটীর শোভা অনির্ব্বচনীয়। এই সুদৃশ্য মিনারগুলি দূর হইতে মানবের মনে কি আনন্দেরই সঞ্চার করিয়া দেয়!

ফটক হইতে এই সমাধিমন্দিরের শোভা তত মনোরম নহে। কিন্তু ভিতরে প্রবেশমাত্র বোধ হয়, যেন কোন দানবের দুর্ভেদ্য পুরীতে উপস্থিত হইয়াছি। এমন অদ্ভুত ও বিশাল সৌধ বুঝি জগতে আর নাই। তাজমহল অপেক্ষা ইহা আকৃতিতে অনেক বৃহৎ। এই পঞ্চতলমন্দিরের উচ্চতা একশত ফিটেরও অধিক হইবে। নীচের তলগুলি হইতে উপরের তল গুলি কিছু কিছু করিয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বোচ্চতলটী বহুমূল্য শ্বেতপ্রস্তরগঠিত। শ্বেতপ্রস্তরের সিঁড়ি বহিয়া এইখানে উঠিলে, একটী শান্তিপূর্ণ চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। উচ্চপ্রস্তরবেদীর উপর বহুমূল্যমর্ম্মরগঠিত একটী সমাধি, মুক্তাকাশপানে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। ইহারই শিরোদেশে নানাকারুকার্য্যময় একটী সুদৃশ্য স্তম্ভ দণ্ডায়মান। কথিত আছে, এই স্তম্ভে আকবর কোহিনুর নামক উজ্জলহীরক স্থাপিত করিয়াছিলেন।

এই কক্ষের উপরে ছাদ নাই। কেবল চারিধারে সহস্র সহস্র-ছিদ্রযুক্ত প্রাচীর ঘেরিয়া আছে। বাহিরের শ্যামলদৃশ্য এই সকল ছিদ্রপথে বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

এই সমাধি, নিম্নতলস্থিত প্রকৃত আকবরসমাধির একটী

নকল নিদর্শনমাত্র। সমাধিমন্দিরমাত্রেই এইরূপ কৃত্রিমকবর স্থাপিত হইয়া থাকে। আমরা নামিয়া আসিয়া, সেই প্রকৃত সমাধিকক্ষে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখস্থ দরজার পাশ হইতে একটী ঢালু রাস্তা বরাবর অনেক দূর যাইয়া, এই কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ঘরের সম্মুখস্থ ছাদে যে সকল অপূর্ব্ব ও বহুমূল্য কারুকার্য্য বর্ত্তমান ছিল, তাহা আজ অদৃশ্যপ্রায় হইয়া গিয়াছে। ভারতগবর্ণমেন্ট অনেক অর্থব্যয়ে একটুকুমাত্র উদ্ধার করিয়া, সাধারণের দর্শনার্থে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছেন। সে অদ্ভুত স্থাপত্যচাতুর্য্য দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

কক্ষের ভিতরে মহান্ আকবর জীবনের কঠোরপরিশ্রমের পর অনন্তনিদ্রায় শায়িত আছেন। যাঁহার দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে এককালে সমগ্রভারত কম্পিত হইত, তিনি আজ ধূলিধূসরিত হইয়া এইখানে,—এই তমসামণ্ডিতকারাগারে প্রস্তরমণ্ডিত-বেশে অনন্তকালের জন্য ঘুমাইতেছেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই দুর্গ দেখিতে গেলাম। কেল্লা দর্শন করিতে হইলে পাসের দরকার হয়। রেলওয়ে পুলিসষ্টাফের নিকট হইতে পাস সংগ্রহ করিতে করিতে একটু বেলা হইয়া গেল।

আগ্রাদুর্গে এখন ইংরেজসৈনিকগণের বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। বন্দুকহস্তে গোরাসৈন্যগণ দ্বারে দ্বারে পাহারা দিতেছে। আমরা তাহাদিগকে পাসখানা দেখাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

শ্বেতসৌধকিরীটিআগ্রাদুর্গ আপনহৃদয়ে জগতের অতুলনীয়

রূপরাশি ধারণ করিয়া, অমরাবতীপ্রায় শোভা পাই-তেছে। সেই সৌন্দর্য্যরাশির উজ্জ্বলজ্যোতিতে দর্শকের চক্ষু ঝলসিয়া যায়। প্রীতিবিহ্বলচিত্তে যে এই চিত্রকে স্বপ্নের মোহময় আবরণ মনে করিয়া, ধীরে ধীরে চক্ষু মার্জ্জনা করে। তারপর যখন প্রকৃতসত্য তাহার হৃদয়ঙ্গম হয়, তখন সেই মর্ম্মর-রাশির ভিতর আপনার ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া, আপনাকে কতই না হীন ও অকিঞ্চিৎকর মনে করে।

শিল্পপ্রণালীর আদর্শভেদে আকবর ও সাহজাহাননির্ম্মিত প্রাসাদাবলীর মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহম্মদীয় ভূপতি-গণের ভারতশাসনের সঙ্গে সঙ্গে যে হিন্দু ও ইসলামীয় স্থাপত্যের এক অলৌকিক সম্মিলনের ক্রমবিকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল. সেই নীতির অনুসরণ করিয়াই আকবরসাহ আগ্রায় ও ফতেপুরসিক্রিতে রাজপ্রাসাদনিচয় রচনা করিয়াছিলেন। দুর্গস্থ বর্ত্তমান জাহাঙ্গীরমহলও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সাহজাহান ভূপতি, দেশে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন আদর্শের আমদানী করিলেন। সুদূর পারস্য, তাতার এবং তুরস্ক হইতে কারিকর আনয়নপূর্ব্বক তিনি দেওয়ানীখাস, খাসমহল, শীসমহল ও তাজের সৃষ্টি করিলেন। এই অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত স্থাপত্যের প্রভাবে দেশ হইতে প্রাচীন শিল্পনীতি একবারে বিদায় গ্রহণ করিল।

শিল্পজগতে এই যুগান্তর উপস্থিত করিয়া, সাহজাহান ভাল করিলেন, কি মন্দ করিলেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। হাভেল সাহেব বলেন—Were it not for the Taj, we might regret this new eliment which came into the Moghul architecture.

বাস্তবিক, ভাস্করবিদ্যার আলোচনা করিতে গেলে, আকবর-নির্ম্মিত সৌধাবলী যে কোন অংশে সাহজাহানের অট্টালিকা-সমূহ হইতে নিকৃষ্ট ছিল, এরূপ ধারণা করা যায় না। শ্বেতমর্ম্মরে বহুমূল্য রঙ্গিণপ্রস্তরের চিত্রাঙ্কনেই তাহার শিল্পাদর্শের এত আদর হইয়াছিল। সামান্য লোহিতপ্রস্তরে আকবর যে সকল অলৌকিক শিল্পচাতুর্য্যের সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহাকে পরাস্ত করিবার জন্য জাহাঙ্গীর ও সাহজাহান রত্নাদির ঔজ্জ্বল্য ও তদ্‌-সজ্জিত চিত্রবিদ্যার উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। সেই সকল উৎকৃষ্ট প্রস্তরখণ্ড-সজ্জিত উজ্জ্বলসৌধমালার অপূর্ব্বদীপ্তিতেই লোকের নয়ন, পুরাতনভাস্করনৈপুণ্যের প্রতি অন্ধ হইয়া পড়িল। এতদিন যে হিন্দুমহম্মদীয় যুক্তশিল্পপ্রণালী একাধিপত্য করিতেছিল, তাহাকে বিদূরিত করিয়া দিয়া, সাহজাহানভূপতি নূতন অট্টালিকানির্ম্মাণপদ্ধতি মোগলসাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সে স্রোতে আকবরের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট হর্ম্ম্যরাজি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নির্ম্মূলিত হইয়া গেল। তাহাদের উপর বর্ত্তমান প্রিয়দর্শন দেওয়ানীখাস, শীসমহল প্রভৃতি চারুহর্ম্ম্যগুলি স্থান লাভ করিল।

আমরা প্রবেশ করিয়াই, প্রসিদ্ধ মতিমসজিদের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এই উৎকৃষ্ট মন্দির, বাদসাহদিগের পারিবারিক উপাসনালয়রূপে ব্যবহৃত হইত। বহির্দ্দেশ হইতে ইহার লোহিতপ্রস্তরনির্ম্মিত হীনপ্রাচীর ও উচ্চপ্রাঙ্গণ অবলোকন করিয়া কে ভাবিয়াছিল যে, ইহার মধ্যে এক অপার্থিবচিত্র, রূপের ছটায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া রহিয়াছে। আমূল-ধবলপ্রস্তরনির্ম্মিত এই ভজনালয়ের নিরাভরণশোভা, সম্মুখস্থ বৃহৎ

চৌবাচ্চার জলে প্রতিফলিত দেখিয়া, কে এমন অপ্রেমিক আছে যে, ক্ষণকালের জন্যও আত্মবিস্মৃত না হইয়া থাকিতে পারে? শিল্পহীন মতিমসজিদ শিল্পীর অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যজ্ঞানের উৎকৃষ্ট পরিচয়। শিল্পের অভাবই এই মন্দিরের একমাত্র শিল্পচাতুর্য্য! সাদাপ্রস্তরের সাদাকাজ হৃদয়ে যে কি এক আনন্দের সঞ্চার করিয়া দেয়, তাহা দেখিবার—বর্ণনা করিবার নহে।

তথা হইতে আমরা আমদরবারেউপনীত হইলাম। আগ্রার এই রাজদরবারে অতীতকালে কতকত লোকের ভাগ্যলিপি চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে, কত দেশদেশান্তরের সুখদুঃখের মীমাংসা হইয়াছে, তাহা কে বলিবে? স্তম্ভমালাপরিশোভিত এই বিশাল আমদরবার আজ শূন্য! শূন্যপ্রস্তরসিংহাসন এখন বিজনে বসিয়া, অতীতের সুখময়কাহিনী স্মরণপূর্ব্বক কেবলই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। সে শূন্যভাব যেন আমাদের হৃদয়েও আসিয়া স্পর্শ করিল ও এক অব্যক্ত বিষাদছায়ায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

বেগমমহলসংলগ্ন এই সিংহাসননীচে অমাত্যপ্রধান বীরবলের প্রস্তরাসনখানা এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেখিলাম, সবই কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে; কেবল মানুষ নাই ও সেই কাল নাই। হায়, যদি আবার সে ছবি ফিরিয়া আসিত!

আমরা বেগমমহলে প্রবিষ্ট হইলাম। আবার একজন শ্বেতাঙ্গের নিকট পাসখানা দেখাইয়া লইতে হইল। এইখানে আসিয়া অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাসাদবলির মধ্যে পড়িয়া, আমি কেমন যেন দিশাহারা হইয়া গেলাম! কি রাখিয়া কি দেখিব, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ঘরগুলি এখনও যেন সম্পূর্ণ নূতন রহি-

য়াছে! সাহজাহাননির্ম্মিত এই অপূর্ব্বপুরী, দেববাঞ্ছিত-কল্পরাজ্যবৎ শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সম্মুখেই রমণীগণের ভজনালয়—ক্ষুদ্র নগিনামসজিদ। ক্ষুদ্র হইলেও ইহার শোভা অতি চমৎকার! ইহারই পার্শ্বে একটী লোহিত-প্রস্তরনির্ম্মিত অপরিসর ঘরে, পিতৃদ্বেষী আরঙ্গজেব, পিতাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি। যদি একথা সত্য হয়, তবে হায়, হতভাগ্য সাহজাহান!—পৃথিবীতে তুমি কত অদ্ভুত কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছ, তোমার সুখাবাসমন্দিরের জন্য এত অর্থরাশি অকাতরে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল, মৃত্যুর পরও তোমার এমন সমাধি হইয়াছে,—শেষকালে তুমি কতই না যাতনা সহ্য করিয়া গিয়াছ!

ইহার নিকটেই নীলপীতপ্রস্তরচিত্রিত উৎসরাজিপরিশোভিত মর্ম্মরাধার। দেওয়ালসংলগ্ন উৎস বহিয়া কৌশলোদ্ধৃত যমুনাপ্রবাহ, সঙ্কীর্ণমর্ম্মরপথে মেজের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই পূতবারিতে হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া, যখন অসূর্য্য-স্পশ্যা ভুবনমোহিনীগণ ভজনালয়ে উপাসনার্থ গমন করিতেন, তখন এই উজ্জলপ্রস্তররাশিতে তাহাদের অলৌকিকসৌন্দর্য্যের অপরূপদীপ্তি বিক্ষিপ্ত হইয়া, কি শোভা বিস্তার করিত, তাহা কি একবারও কেহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেখিয়াছেন? প্রস্ফুটিতশতদল-বৎ বিকসিত এই সলিলাধারে তাহাদের বিশ্বমনোমোহিনী শোভা প্রতিফলিত হইয়া যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিত, তাহা আজ কল্পনার বিষয়মাত্র!

তারপর আমরা বেগমদিগের হাটের নিকট উপস্থিত হইলাম। কথিত আছে, এইখানে অনেকানেক সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ,

বাদসাহ ও বেগমদিগের নিকট পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইতেন। সে চাঁদের হাটই বা এখন কোথায়!

এখান হইতে আমরা দেওয়ানীখাস দেখিতে গেলাম। দেওয়ানীখাস, খাসমহল ও শীসমহল প্রভৃতি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজ-প্রাসাদগুলি অতি নিকটে নিকটেই অবস্থিত। পৃথিবীর তাবৎ রত্নাদি ব্যয় করিয়া, বিলাসপ্রিয় সাহজাহান এই সকল আরাম-নিকেতন স্থাপিত করিয়াছিলেন। তাজমহল ও দিল্লীর দেওয়ানী-খাস ব্যতীত এরূপ উৎকৃষ্টবাসভবন কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মুক্তাকাশপ্রবিষ্ট নির্ম্মলসুধাংশুকরে যখন এই সকল রম্যধামগুলি চতুর্দ্দিকে সুখের তরঙ্গ তুলিয়া বিজুলিপ্রায় হাসিয়া উঠিত, তখন স্বর্গনিবাসী অমরবৃন্দও হয়তঃ অসূয়াপরবশনয়নে এই অনির্ব্বচনীয় শোভা দর্শন করিতেন। গবাক্ষপথে উজ্জ্বলবরণা যুবতীললনগণের চারুমুখচ্ছবি দর্শন করিয়া চন্দ্রমাও বুঝি সরমভরে জলদমালায় মুখাবৃত করিতে চাহিত!

দেওয়ানী আম অপেক্ষা দেওয়ানীখাস আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ঐশ্বর্য্যসম্পদে ইহার স্থান অনেক উপরে। এইখানে সম্রাট্ প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গসহ কেবলমাত্র গুরুতর বিষয়াদির মীমাংসার্থ সমবেত হইতেন। অন্যান্য সাধারণ রাজকার্য্য আমদরবারে নিষ্পত্তি হইত।

দেওয়ানীখাসের সন্নিকটেই একটী ক্ষুদ্র অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বারান্দা। নানারত্নাদিখচিত অপূর্ব্বকারুকার্য্যময় এই বারান্দা দুর্গপ্রাচীরের উপর মুক্তাকাশে বিরাজ করিতেছে। কথিত আছে, কঠিনরোগাক্রান্ত হইলে সাহজাহান এইখানে বসিয়া সমীরণসেবন করিবার অনুমতি প্রাপ্তহইয়াছিলেন। যমুনানিলস্পর্শে

আপনার দুঃসহ চিন্তাভার লঘু করিতে করিতে যখন এই হত-ভাগ্য ভূপতি দূরস্রোতস্বিনীকূলে তাজমহলের রবিকরপ্রফুল্লিত মনোহারিণীমূর্ত্তি দেখিয়া, জীবনের গতসঙ্গিনীর স্নেহ ও সহানুভূতি-পূর্ণ বদনচন্দ্রমাখানি মনে করিতেন, তখন অলক্ষ্যে তাহার যাতনাক্লিষ্ট মুখ হইতে কতগুলি মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া যাইত, তাহা কে বলিতে পারে? নিষ্ঠুর আরঙ্গজেব! তোমার ওই কঠিন বক্ষঃস্থলের ভিতর কি হৃদয় বলিয়া একটা পদার্থ ছিল না?—অথবা তোমার এই হৃদয়খানি কি বিধাতা প্রস্তর দিয়া গঠন করিয়াছিলেন? রাজ্যলাভ কি এতই মধুর যে, এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নরকের অতলগর্ভেও প্রবেশ করিতে শঙ্কা ও দ্বিধা করা প্রয়োজন মনে কর নাই?

অশ্রুভারাক্রান্তনয়নে আমরা তারপর দেওয়ানীখাসের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে দুইটী বৃহৎ প্রস্তরাসন দৃষ্ট হয়। একখানি সাদা ও অন্যটী কাল প্রস্তরনির্ম্মিত। কালবর্ণের আসনখানি একটু ফাটিয়া গিয়াছে। এই ভগ্নস্থানের একটি রক্তবর্ণচিহ্ন দেখাইয়া দুর্গবাসিগণ এক অদ্ভুত গল্প বলিয়া থাকে, তাহা এইরূপ;—সম্রাট্ আকবরসাহ এবং তদীয় মন্ত্রী বীরবল কর্ত্তৃক এই আসনদ্বয় ব্যবহৃত হইত। সম্রাট্ স্বয়ং কাল আসন খানিতে এবং অমাত্যবর সাদা আসনটীতে বসিয়া নৈশসমীরণ সেবন করিতে করিতে রাজ্যের তাবৎ গোপনীয় ও গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন। কালে ভরতপুরাধিপতি জহরসিংহ দুর্গাধিকার করিলে; দেওয়ানীখাস ও খাসমহল প্রভৃতি প্রাসাদ-নিচয়ের অমূল্যরত্নাদি তৎকর্ত্তৃক হৃত হইল। বিজয়োন্মত্ত জহর-সিংহ, সিংহাসনাধিকারার্থ একলম্ফে এই কৃষ্ণাসনখানিতে

লর্ড এলেনবরার আদেশে জেনারেল নট (Nott) ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থান হইতে এই কপাটদ্বয় উদ্ধার করিয়া আনেন। সুলতান মামুদের সমাধিস্থলে ইহা এতদিন শোভা পাইতেছিল। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, ইহা চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত নহে—দেবদারুগঠিত। ইহার চতুষ্কোণপ্রতিকৃতি ও কারুকার্য্যেরআদর্শও হিন্দুদেবালয়োচিত নহে। এই জন্ত এরূপ সিদ্ধান্ত করা একবারে অসঙ্গত নহে যে, এই দেবদারুকাষ্ঠ-নির্ম্মিত দরজা, বাস্তবিক সোমনাথের পবিত্রচন্দনদ্বার নহে। লর্ড এলেনবরার সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়াই বোধ হয়।

এখান হইতে আমরা জাহাঙ্গীরমহল অথবা আকবরনির্ম্মিত পৌরাণিক প্রাসাদাবলী দেখিতে গেলাম। পূর্ব্বদৃষ্ট অট্টালিকা-গুলির তুলনায় ইহাদের কি পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা এই অধ্যায়ের প্রথমেই বর্ণিত হইয়াছে।

জাহাঙ্গীরের কেতাবখানা ও যোধবাইমহলই এই অংশে বিশেষ দ্রষ্টব্য। লালপ্রস্তরনির্ম্মিত কেতাবখানার পাষাণময় আলমারীগুলি দেখিলে, তিনি যে একজন বিদ্যানুরাগী পুরুষ ছিলেন, তাহা উত্তম অনুমিত হয়। ভাস্করবিদ্যার পরাকাষ্ঠা যোধবাইমহলে প্রদর্শিত হইয়াছে। আকবর বা জাহাঙ্গীর কেহই তাহাদের পরিণীতা হিন্দুললনাগণকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিতে প্রয়াস পান নাই; সেই জন্তই যোধবাইমহল আজও হিন্দুদেবদেবীর চিত্রে হিন্দুআদর্শে অলঙ্কৃত হইয়া আছে।

তারপর আমরা মচ্ছিভবন, আঙ্গুরীবাগ ও জাহাঙ্গীরের স্নানকুণ্ড নামক একটী বৃহৎ খোদিতপ্রস্তরাধার দর্শন করিয়া, দুর্গ পরিত্যাগ করিলাম।

বাহিরে আসিয়া ক্ষণবিশ্রামান্তর যমুনার অপর তীরে ইতমদ্দৌলা দেখিতে গমন করিলাম। নুরজাহান তদীয় পিতা মিরজা গায়েসউদ্দীন মহম্মদের সমাধিস্থলে এই ক্ষুদ্র অথচ তাজমহলোপম সুদৃশ্য সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরমধ্যস্থ অপরিসরকক্ষে এই ভুবনমোহিনী রূপসীর পিতামাতা উভয়েই চিরনিদ্রাভিভূত। সুন্দর পীতবর্ণের মার্ব্বল পাথরে তাহাদের কবরগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। ছাদের উপর একটী অতি মনোরম প্রাঙ্গণের চারিকোণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটী মিনার। মধ্যস্থলে নিম্নস্থ কবরের প্রতিকৃতিদ্বয় একটী ক্ষুদ্র, চারিদিকমুক্ত শ্বেতপ্রস্তর গৃহে স্থাপিত আছে। কথিত আছে, নুরজাহান এই মন্দিরটীকে আমূল রৌপ্যমণ্ডিত করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। পরে তস্করাদির ভয়েই প্রস্তরের গাত্রে রত্নরাশি ঢালিয়া দিয়া, এই ভক্তিমন্দির গঠিত করেন। এই ক্ষুদ্র মন্দিরের আদর্শেই পরে সাহজাহাননির্ম্মিত অলৌকিক প্রাসাদাবলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই নূতনাদর্শের পথপ্রদর্শক—একমাত্র ইতমদ্দৌলা।

এই সমাধিস্থলেরই কিছুদূরে—রামবাগ। রামবাগ সর্ব্বপ্রথম বিজয়ী বাবরসাহ প্রস্তুত করেন। পরে নুরজাহানবেগম এইস্থানে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। এখন এইস্থানে সে সব চিহ্ন কিছুই নাই—কেবল কতকগুলি ফলমূলবৃক্ষ বিরাজ করিতেছে। এইখান হইতে ফিরিবার সময়, আমরা আর একটী ভগ্নসমাধি দর্শন করিয়া গেলাম। কোন কালে যে ইহার বিশেষ সমৃদ্ধি ছিল, তাহা এখনও চূর্ণবিচূর্ণিত চিত্রিতপ্রস্তরস্তূপদর্শনে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। এই ভগ্নগৃহরক্ষার্থ গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কথিত আছে, এই মন্দির

সাহজাহানের প্রধান অমাত্য আফজলখান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার নাম—চিনি-কা-রোজা।

সেইখান হইতে বরাবর বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তরণীমালাগঠিত সেতুর উপর দিয়া, যমুনাবক্ষ অতিক্রম করিতে হইল। রেলওয়ে কোম্পানী নিকটেই দুইটী বৃহৎ বৃহৎ পুল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাদের একটীর উপর দিয়া লোক চলাচলের এবং নিম্নে বাষ্পীয় শকটাদির যাতায়াতের বন্দোবস্ত আছে। দ্বিতীয়টী এখনও সম্পূর্ণ নির্ম্মিত হয় নাই।

৭ই ফাল্গুন শয্যাত্যাগ করিয়া দেখি, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; অথচ কুয়াশায় চারিদিক ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। তাড়াতাড়ি হাতমুখ প্রক্ষালন করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। প্রভাত বারিসিক্ত মেকডনেলপার্ক আজ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। আমি যত অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই আমার সম্মুখে কেবলই ইহার সৌন্দর্য্যরাশি ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ হইল। কুয়াশাবদ্ধ দৃষ্টিতে বোধ হইতে লাগিল যেন, এক অনন্তবিস্তৃত নন্দনকাননে উপস্থিত হইয়াছি। এই সৌন্দর্য্যরাশির ভিতর পরিক্রমণ করিতে করিতে, আজ আবার হঠাৎ নবোদিততপন করে তাজমহলের কমনীয়মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। শিশিরবারিসিক্ত ধবলগম্বুজের উপর এই আলোকরশ্মিমালা গলিতসুবর্ণধারার সৃষ্টি করিতেছিল। শ্যামল বৃক্ষপত্ররাশির ভিতর দিয়া, এই স্বভাবসুন্দরকীর্ত্তিমন্দিরের অতুল সুষমারাশির পূর্ণবিকাশ দেখিয়া আমার নয়নদ্বয় সার্থক হইয়া গেল।

বেলা ১১টার সময় বাসায় প্রত্যাগত হইলাম। ভৃত্য খাবার আনিতে হইবে কি না জিজ্ঞাসা করিল। বলা বাহুল্য, বাজারের

পুরী কচুরী ভিন্ন আমার ভাগ্যে অন্ত আহার্য্য খুব কমই ঘটিয়া উঠিত। আমি একটী চৌয়ানি ফেলিয়া দিয়া স্নান করিতে গেলাম। স্নান অর্থে আজ কলের জলে মস্তক ও হস্তপদাদি প্রক্ষালন। এই ঠাণ্ডাদিনে বালুকারাশির ভিতর দিয়া যমুনায় যাইবার ইচ্ছাও ছিল না, শক্তিও হইল না। এবম্বিধ স্নানের পর, আপন কক্ষে যাইয়া অর্গলবদ্ধ করিয়া আহারে বসিলাম। বাজারের সামগ্রী হইলেও এখানকার খাদ্যদ্রব্যাদি বড়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও রসনাতৃপ্তিকর। বোধ হয়, অনেকে স্বহস্তেও এরূপ রসুই করিতে পারিবেন না। আমি আকণ্ঠ পূরিয়া ভোজন করিলাম। তারপর আবার সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইতে হইল।

আজ বেড়াইবার পাল্লাটা খুব বড় রকমের হইল। পাঠকদিগের মধ্যে অনেকেই ফতেপুর-সিকরির নাম শুনিয়াছেন। কিন্তু আগ্রা হইতে কতদূর এবং কিরূপেই বা তথায় পৌছান যায়, বোধ হয় ততটা খবর রাখেন না। আজ আমাকে সেইখানেই যাইতে হইবে।

ফতেপুর-সিকৃরি আগ্রা হইতে ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী। এই সুদূর পথ অতিক্রম করিতে হইলে, উটের গাড়ী, মটরকার, অথবা একাযানের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। মটরকার (Motorcar) বা ঘোড়ার গাড়ীতে ব্যয় অনেক; সুতরাং উহারা সাধারণ পথিকের জন্ম নহে। ঘোড়ার গাড়ীতে অন্ততঃ ৪।৫ টাকা খরচ পড়িয়া থাকে। সাধারণ লোকজন উটের গাড়ীতে বা একাতেই গমন করে। 'উটের গাড়ী' কথাটা বাঙ্গালীপাঠকের নিকট একটু অদ্ভুত শুনাইবে। কিন্তু এদেশে ইহাতে কিছুমাত্র বৈচিত্র্য নাই। দূরপথ অতিক্রম করিতে হইলে, এই উদারপ্রকৃতি মরালকণ্ঠ পশু-

গুলি যেমন প্রয়োজনীয়,এমন আর কিছুই নহে। ঘোড়ার মত ইহারা সহজে ক্লান্ত হইয়া পড়ে না, এবং মন্থরগতি হইলেও বৃহৎ বৃহৎ শকট একাকীই আকর্ষণপূর্ব্বক অনেকদূর লইয়া যায়। এক একটা উটের গাড়ীতে প্রায় ৮।১০ জন লোক বসিতে পারে। এদেশে নৌকার চলন না থাকায়,এই পরম হিতকারী জীবদ্বারাই মালপত্রাদি বাহিত হইয়া থাকে, এবং আমাদের দেশের গহনার নৌকার মত ইহাদের গাড়ীতে যাত্রীরা দল বাঁধিয়া আরোহণ পূর্ব্বক রেলষ্টিমারবর্জ্জিত দেশে গমন করে।

কিন্তু আমি এই অদ্ভুত শকট বা এক্কা কিছুই ভাড়া না করিয়া, বাষ্পীয় শকটে আরোহণপূর্ব্বক R. M. R. এর লাইনে ১৫।২০ মাইল দূরবর্ত্তী, আইসনারা ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। এখান হইতে ফতেপুর পর্য্যন্ত ১৩।১৪ মাইল ব্যবধান হইবে। এক্কাও পাওয়া গিয়া থাকে। আমি যতদূর বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে এই রাস্তায় ফতেপুর-সিকরি দর্শন করাই অল্পব্যয়লিপ্সু পরিব্রাজকের পক্ষে সুবিধাজনক। রেলভাড়া নাম মাত্র দিতে হয়। তা ছাড়া এক্কাভাড়াও কম।

ফতেপুর-সিকরি।

বেলা দুই ঘটিকার সময় ফতেপুর পৌছিলাম। আসিবার কালে পথে অনেক ভগ্ন ইষ্টকমন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যোধবাইএর সমাধিমন্দিরের শেষ চিহ্ন দেখিতে, পথিক বিস্মৃত হইবেন না। এইখানে ভগ্নাবশিষ্টনগরের কিছু ঐতিহাসিক পরিচয় দিতে হইতেছে।

ফতেপুর ও সিক্রি প্রাচীনকালে দুইটী ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল

ক্ষুদ্র হইলেও ভারতের ইতিহাসে ইহাদের নাম উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এইখানেই সর্ব্বপ্রথম হিন্দুরাজত্বের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়। মোগলবীরচূড়ামণি বাবর সাহকে এইখানেই প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপান্বিত মহারাণা সঙ্গ, অতুল বিক্রমে পরাজিত করিয়া, পুনরায় আপনি পরাজিত হন। সেই হইতে হিন্দু-পরাক্রমের পরিবর্ত্তে ভারতে মুসলমানপ্রতাপের একাধিপত্য স্থাপিত হয়। এক কথায় বলিতে গেলে, এই ক্ষুদ্র গ্রাম দুইটীর নামের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের ঐতিহাসিকচিত্র সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিতে থাকে।

কিন্তু আমি আজ যে লুপ্তকীর্ত্তির শেষচিহ্ন দেখিবার জন্য এইখানে ছুটিয়া চলিয়াছি তাহার সঙ্গে এ তত্ত্বের কিছু সংস্রব নাই। যে সকল রম্য রাজপ্রাসাদের ভগ্নস্তূপ এখানে দৃষ্ট হইবে, তাহা বাবরের পৌত্র আকবরসাহের কীর্ত্তি। তিনি আগ্রায় যেমন রাজপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এখানেও তদ্রূপ বিচিত্র প্রাসাদমালা রচনা করেন। কিন্তু কি অপ্রকাশ্য কারণে এই বহুদূরবিস্তৃত মনোরম আবাসভবন সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইতে না হইতেই তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। সেই অবধি ইহা পরিত্যক্ত। এমন বিশালপুরী পশুপক্ষীর আবাসস্থান হইয়া পড়িল!

কেন সম্রাট আকবর সাহ পূর্ব্বস্থাপিত রাজধানীর এত নিকটে দ্বিতীয় একটী রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং কেনই বা এত শীঘ্র উহা পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, তাহার কিছু কিছু তথ্য তদীয় পুত্র জাহাঙ্গীরবাদসাহের দৈনিক স্মরণলিপি হইতে সংগৃহীত হইতে পারে।

কথিত আছে, পুত্রমুখাকাঙ্ক্ষী সম্রাট্, দুইটি পুত্রসন্তানের অকালমৃত্যুতে বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলে, সভাসদ্‌গণ তাঁহাকে মৈনুদ্দীনচিস্তির দরগায় শরণ লইতে পরামর্শ দেন। এই মৈনুদ্দীনচিস্তি পারস্যদেশীয় একজন মহাপুরুষ ছিলেন। আজমীর নগরে এই দৈবশক্তিসম্পন্ন ফকিরের পবিত্রকবরের উদ্দেশে বহু দূরদেশ হইতে অনেক লোক আগমন করিত। আকবর সাহ মনে মনে এই মহাপুরুষের পবিত্রনামে শপথ করিলেন যে, যদি তাঁহার বাসনা পূর্ণ হয়, তবে তিনি স্বয়ং পদব্রজে আজমীর উপস্থিত হইয়া, দরগায় প্রার্থনা করিয়া আসিবেন। দৈববশে ইহার কিছুকাল পরেই সেলিমজননী অন্তঃস্বত্বা হন। ভক্তি ও উল্লাসে অভিভূত হইয়া, দীর্ঘ ১৪৪ মাইল পথ হাঁটিয়া, আকবর সাহ আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। এই সুদূর পথ বহিয়া, তিনি ও তাঁহার রাজ্ঞী আজমীরে উপস্থিত হইলেন ও ফকিরের উপাসনা করিলেন। বেগমসাহেবার পথকষ্ট নিবারণের জন্য, রাস্তার উপর বহুমূল্য গালিচা বিস্তৃত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দুইধারে উচ্চ পর্দ্দায় আবরণও নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাদসাহের এই ভক্তিপরায়ণতা দর্শন করিয়া, ফকির স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিলেন, এবং মনোনীত ফললাভার্থে সলিমচিস্তিনামক কোন জীবিত ফকিরের শরণাগত হইতে আদেশ করিলেন। এই সলিম-চিস্তি তৎকালে ফতেপুর সিক্রির কোন এক নির্জ্জন পর্ব্বতগহ্বরে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতায়, সম্রাট্ এতদূর মোহিত হন যে, সেই অবধি এইখানে আসিয়া আবাসগৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিজেও বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এইখানেই ফকিরের আলয়ে জাহাঙ্গীর ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। উদার-

প্রকৃতি আকবরসাহ, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ফকিরের নামের অনুকরণে পুত্রের নামও সেলিম ধার্য্য করেন।

সেই অবধি ফতেপুর সিকরির ক্রমিক উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। আকবর সাত মাইল বেষ্টন করিয়া, বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক নগর সুরক্ষিত করিলেন। প্রস্তরময় পাহাড়ের উপর বহুবিস্তৃত বিশালরাজপুরী স্থাপিত হইল। নানাদেশ হইতে নানালোক আসিয়া, এইখানে দোকানপাট খুলিল। কথিত আছে, এই সময় গোয়ানগরী হইতে পর্ত্তুগীজগণও এইস্থানে আগমন করিয়াছিলেন।

কিন্তু কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই, কি এক অজ্ঞাত কারণে এই সজ্জিতনগরী অকস্মাৎ পরিত্যক্ত হইল! কি কারণে এমন হইল, তাহা এপর্য্যন্ত কেহই সম্যক নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। অনেকে অনেক রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাহাদের মধ্যে দুইটী উল্লেখযোগ্য। এই নূতন প্রতিষ্ঠিত নগরীর নিকটে কোন স্রোতস্বতী ছিল না—এজন্য জলের বিশেষ অভাব ঘটা অসম্ভব নহে। কেহ কেহ বলেন, ইহাই নগরীপরি-ত্যাগের প্রকৃত কারণ। দ্বিতীয়দলের কথা এই যে,—তাহা নহে, লোকসমাগমে ফকিরসাহেবের কার্য্যাদির বিঘ্ন ঘটাতেই, আকবর এইস্থান পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হন। আমিও এই শেষোক্ত মতেরই পক্ষপাতী; কারণ, ইহাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। যদি কেবলমাত্র জলের অসদ্ভাবহেতু, কিম্বা অন্য কোন স্বাস্থ্য-রক্ষাবিষয়ক কারণে সম্রাট্ এইস্থান পরিত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে লোকসমাজে এইকথা প্রকাশিত হইবার পক্ষে কিছুমাত্র বাধা ছিল না; আর পরিত্যাগের রকমটাও এরূপ অকস্মাৎ ও

অদ্ভুতপ্রকৃতির হইত না। অন্যদিকে আকবর, এই ফকিরের উপর যেরূপ ভক্তিমান্ ছিলেন, তাহাতে তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী এরূপ কার্য্য করা কিছুমাত্র অসম্ভব বা অলৌকিক বোধ হইতে পারে না।

প্রাচীরদ্বারে উপস্থিত হইতেই আমরা শ্মশানের এক বিকট-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। বহুদূরবিস্তৃত প্রাচীর, স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। প্রস্তরখণ্ডপরিপূর্ণ পাহাড়ের উপরে ভগ্নস্তূপরাশিব্যতীত যতদূর দেখিতে পাইলাম, কেবল অরণ্যময়। এই জনহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া আমরা ঘুরিয়া যাইয়া সদরদ্বারে উপস্থিত হইলাম। উন্নত পর্ব্বতপৃষ্ঠে বৃহৎ সিংহদ্বার সগর্ব্বে আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জগতে এমন সিংহদ্বার কোথাও আছে কি না জানি না; কিন্তু আমার চক্ষে ইহা সম্পূর্ণ নূতন। বহুদূর হইতে ইহার কারুকার্য্যখচিত চূড়া যখন অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যকিরণে জ্বলিতে থাকে, তখন মনে হয় যেন কোন রাজাধিরাজ স্বর্ণমুকুট পরিয়া, অতুলগৌরবে দাঁড়াইয়া আছেন।

এই তোরণের নাম বুলন্দ দরজা। পর্ব্বতনিম্নে ইহারই সম্মুখে অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন ও আবর্জ্জনাদিপূর্ণ ক্ষুদ্র ফতেপুর সহর কতকগুলি কুঁড়েঘরের সমষ্টির ভিতর বিরাজ করিতেছে। আমরা পাহাড় বহিয়া উপরে উঠিতেই একটা হিন্দুস্থানীছোক্‌রা আসিয়া গাইডরূপে আমার সঙ্গ লইল। স্থানে স্থানে সে আমার পাদুকাজোড়া বহন করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার সে বিদখুটে ভাষা আমি যদি এক বর্ণও বুঝিতে পারিতাম! লিখিত বিবরণীপাঠে ও নিজবুদ্ধির দৌড়ে আমাকে সকল অর্থই সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

বুলন্দদরজা বা জয়তোরণ অতিক্রম করিলেই হঠাৎ এক নয়ন-তৃপ্তিকর প্রশান্ত দৃশ্য সম্মুখে আবির্ভূত হয়। বহুদূরবিস্তৃত প্রস্তরমণ্ডিত প্রাঙ্গণ; তাহার চারিদিকে সুদৃশ্য উন্নতসৌধশ্রেণী; মধ্যস্থলে গজদন্তনিভ মর্ম্মরপ্রস্তরের দরগা। এই দরগাতেই সলিমচিস্তির কবর স্থাপিত আছে। এখনও দূরদূরান্তর হইতে শত শত রমণী সন্তানলাভাশায় এইখানে আসিয়া হত্যা দিয়া থাকে। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণীয় সমাধিমন্দিরে যেন কেমন এক চিরশান্তি বিরাজ করিতেছে। ইহারই পশ্চিমপার্শ্বে প্রকাণ্ড, বিশাল ও অপরূপকারুকার্য্যময় জুমামসজিদ। লাল প্রস্তরের উপর শ্বেতপ্রস্তরের সূক্ষ্মকাজগুলি বড়ই মনোরম। এরূপ সুদৃশ্য ও প্রকাণ্ড উপাসনালয় ভারতে কচিৎ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, এই স্থানেই আকবরসাহ মোল্লা ও মৌলবীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া, নানারূপ ধর্ম্মালোচনা করিতেন। এই বৃহৎ আঙ্গিনায়ই একপার্শ্বে বিখ্যাত ফৈজী ও আবুলফজলের সমাধিগৃহ।

আমরা এই সকল দর্শন করিয়া, পূর্ব্বদিক দিয়া বাহির হইয়া, অন্য একটী মহলে প্রবেশ করিলাম।

এইখানে বাদসাহের আস্তাবলখানা, বীরবলপ্রাসাদ, হাতীয়া-দরজা ও অদূরেই কারবনসরাই ও হিরণমিনার দ্রষ্টব্য।

বীরবলপ্রাসাদকে, আমার গাইড, বীরবলের কন্যার প্রাসাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। বীরবলের কন্যা কেহ ছিল কি না তাহা আমি জ্ঞাত নহি। বেগমমহলের অতি নিকটে স্থাপিত বলিয়া, কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলেও বীরবলের স্বীয় একটী দ্বিতীয় আবাসভবন, নিশ্চয়ই বর্ত্তমান থাকিত। কিন্তু এই বহুমূল্য গৃহটী ব্যতীত

অন্য কোন ভবনই তাঁহার নামের সঙ্গে বিজড়িত দেখিতে পাই না। কাজেই, এই উত্তম বাসভবনই যে, বীরবলের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এমতই ধারণা জন্মে। অমাত্যপ্রবর, বাদশাহের যেরূপ অনুগ্রহভাজন ও বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন, তাহাতে রঙ্গমহলের সন্নিকটে স্থান পাওয়া, তাঁহার পক্ষে বিশেষ অসম্ভবজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। আগ্রাদুর্গেও আমরা এ বিষয়ের কিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে পাই।

বীরবলপ্রাসাদের অদূরেই হাতীয়াদরজা। এই দরজা দ্বারা প্রাসাদের উত্তরদিকস্থ কারবনসরাই ও হিরণ্মিনারে উপস্থিত হওয়া যায়। দরজার উপরে দুইটী বৃহৎ হস্তিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। হিরণ্মিনার কণ্টকাবৃতমৃণালবৎ একটি ছোট প্রস্তরস্তম্ভ। কথিত আছে, বাদসাহের কোনও প্রিয় হস্তীর মৃতদেহের উপর এই স্মরণচিহ্ন নির্ম্মিত হইয়াছিল। পাহাড়ের নীচে প্রান্তর সম্মুখীন করিয়া, এই মিনার, দুইটী উচ্চপ্রস্তরবেদীর উপর, দাঁড়াইয়া আছে। অন্যান্য মিনারের মত, উপরে উঠিবার জন্য ইহার ভিতরেও সিঁড়ি আছে। বাদসাহ ও কুলকামিনীগণ কখন কখন এই মিনারে আরোহণ করিয়া, নিম্নপ্রান্তরে শিকার সন্দর্শন করিতেন। সে জন্য হাতীয়াদরজা হইতে ইহার মূলপর্য্যন্ত একটী চতুর্দ্দিক আবরিত রাস্তা ছিল। আজকাল তাহার ভগ্নাবশেষমাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ভগ্ন রাস্তার বামপার্শ্বে বিস্তৃত কারবনসরাই। এক সময়ে এইস্থান শত শত লোকের আশ্রয়স্থল ছিল। রাস্তার দক্ষিণপার্শ্বে বাউরি বা বৃহৎকূপ। আশ্চর্য্য কৌশলে এই কূপ হইতে জল উত্থিত হইয়া, প্রাসাদের স্থানে স্থানে প্রেরিত হইত। এই আশ্চর্য্য জলযন্ত্রের এখনও কিছু

কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই অদূরে সঙ্গিনবুর্জ বা তোপখানা। উত্তরদিকস্থ প্রান্তর সম্মুখীন করিয়া, এস্থানে অসংখ্য কামান সজ্জিত থাকিত।

এইখান হইতে আমরা বেগমমহলে প্রবেশ করিলাম। এখানকার সুদৃশ্য ও সুমার্জ্জিতকারুকার্য্যসম্পন্ন অট্টালিকাগুলি দেখিলে বুঝা যায়, আকবর এইখানেই আপন পরিবারের জন্য প্রকৃত বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যে কালে এই সকল বাসভবনগুলি বহুমূল্য রত্নরাজি ও সাজসরঞ্জামে সজ্জিত ছিল, তখন এইস্থানে কি অপরূপ দৃশ্যই প্রকটিত হইত, তাহা কল্পনায়ও স্থান পায় না। সমস্তটা মহলই উৎকৃষ্ট লোহিতপ্রস্তরগঠিত; কেবল মধ্যে মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরের কারুকার্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রস্তরের উপর খোদাই করিয়া যে অদ্ভুত কারুকার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা অতুলনীয়। একটী বৃহৎ আঙ্গিনার চতুষ্পার্শ্বে এই সকল গৃহশ্রেণী, এবং ইহারই মধ্যস্থলে একটী সুন্দর ক্ষুদ্র সরোবর। সরোবরের মধ্যস্থলে শ্বেতপ্রস্তরের একটী উচ্চ বেদী। চারিধার হইতে চারিটী রাস্তা এই বেদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। সন্ধ্যাসমাগমে চারিদিকের দীপরশ্মিমালা যখন ইহার শান্তজলে পতিত হইত, তখন শতাধিক রমণীপরিবেষ্টিত হইয়া বাদসাহ ইহারই একপার্শ্বে পচিশিখেলায় রত হইতেন। সেই বিস্তীর্ণ পচিশিক্ষেত্র আজও বর্ত্তমান আছে। এক একটি সুন্দরী কামিনী এক একটী ঘুটী সাজিয়া, ইহারই এক এক ঘরে বসিয়া যাইত, আর স্বয়ং বাদসাহ, প্রিয়তমা মহিষীগণসহ এই জীবন্ত ঘুটীগুলি চালনা করিতেন। তখন সেই টিপি টিপি মৃদু হাসি ও ক্রীড়াস্তের উচ্চ কলধ্বনি কি অপূর্ব্বভাবেরই সমাবেশ করিয়া তুলিত,

তাহা কবিতাপ্রিয় পাঠক একবারও কল্পনায় আনিতে পারেন কি?

সরোবরের উত্তরপার্শ্বে এই পচিশিক্ষেত্রের নিকটেই চতুর্দ্দিক-উন্মুক্ত বালিকাবিদ্যালয়। এইখানে মহালের রমণীগণ বিদ্যালোচনা করিতেন। চতুষ্কোণ প্রস্তরস্তম্ভসারির উপর এই বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহারই পশ্চিমে জলাশয়ের কোণে প্রসিদ্ধ অট্টালিকা—পাঁচমহল। এই পঞ্চতল পাঁচমহলের নির্ম্মাণকৌশল বড়ই অদ্ভুত রকমের। ইহার কোথাও প্রাচীর নাই; কেবল সারি সারি অনতিউচ্চ স্তম্ভশ্রেণীর উপর ছাদ-গুলি রক্ষিত হইয়াছে। যত উপরে উঠিয়াছে, ততই ছাদগুলি একটু একটু করিয়া ছোট হইয়া গিয়াছে। দেখিলে যেন একটা অদ্ভুত রথ বলিয়া ভ্রম হয়। এই স্তম্ভগুলির কারুকার্য্য এমন চমৎকার যে, দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। প্রত্যেক স্তম্ভের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মূল্যবান্ খোদাই চিত্রগুলি বড়ই বিস্ময়জনক। ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বনিম্নতলে চৌরাশিটী, এবং তদূর্দ্ধে প্রতিতলে ক্রমে ৬৫, ২০, ১২ এবং ৪টী। অনেকে অনুমান করেন যে, এই অট্টালিকা বালকবালিকাদিগের এবং দাসদাসীদের জন্ত নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পাঁচমহলের দক্ষিণেই মিরিয়াম বিবির মহল। এই মিরিয়াম বিবি, আকবরের অতি প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। তজ্জন্তই এই দ্বিতল প্রাসাদটী বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কারে চিত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু এই মিরিয়ামবিবি কোন্ প্রদেশাগত এবং কোন্ ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন, সে বিষয়ে মতভেদ আছে। ইনিই জাহাঙ্গীরের মাতা বলিয়া কথিতা হইয়া থাকেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি পর্ত্তুগীজদুহিতা। কিন্তু Keene প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ

এই মতের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা ইঁহাকে মানসিংহের ভগিনী অম্বরদুহিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহা হউক, তাঁহার এই আবাসগৃহে হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় উভয়বিধ চিত্রেরই নিদর্শন পাওয়া যায়। এ অবস্থায় প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা সহজ নহে।

ইহার পার্শ্বেই যোধাবাইমহল। যাঁহারা আগ্রায় যোধাবাই মহল দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহার আয়তন ও আকৃতি সম্বন্ধে অনেকটা অনুমান করিতে পারিবেন। সমস্ত বেগমমহলে এত বড় আবাসগৃহ আর কোনও রাজ্ঞীর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে উৎকৃষ্টশিল্পখচিত এই সুন্দর বাসভবন আজও ঠিক নূতন রহিয়াছে। পূর্ব্বদিক হইতে এই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে, সম্মুখেই হিন্দুললনার এই দেব-মন্দির দৃষ্ট হয়। প্রাচীরগাত্রে হিন্দুদেবদেবীর লুপ্তপ্রায় চিহ্নগুলি এখনও কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে। এই প্রাসাদসংলগ্ন হাওয়ামহল প্রভৃতি আরও কয়েকটী অট্টালিকা দর্শনযোগ্য।

পচিশিঘরের অপরদিকে একটী চতুষ্কোণ অনতিবৃহৎ গৃহ, দেওয়ানীখাস বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বাহির হইতে এই অট্টালিকাটী দ্বিতল বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিলে আর সে ভ্রম থাকে না। উপরের দরজাগুলির নীচেই চারিদিক ঘেরিয়া প্রাচীরসংলগ্ন চারিশ্রেণী গেলারী (Gallery)। ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে একটী স্থূলস্তম্ভের উপর বৃহৎশতদলপদ্মের আকারে একটী প্রস্তরাসন নির্ম্মিত হইয়াছে। এই আসনে পৌছিবার জন্য গেলারীর প্রান্তগুলি হইতে চারিটি সঙ্কীর্ণ পথ বাহির হইয়া ইহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। আবার ঘরের মেজের চারি কোণ হইতে চারিশ্রেণী ছোট ছোট

প্রস্তরসোপান এই গ্যালারী স্পর্শ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত ঘরের মেজে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত অন্য কিছুই বিদ্যমান নাই। কথিত আছে, এই পদ্মাকার আসনে বাদসাহ স্বয়ং উপবেশন করিয়া, গেলারী-উপবিষ্ট মন্ত্রিগণের সহিত কথোপকথন ও পরামর্শ করিতেন। গৃহতলে নিম্নে, অন্যান্য অমাত্যগণ স্থান পাইত। অনেকে আবার এই গৃহকেই বদাওনীকথিত ইবাদতখানা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

ইহারই কিছুদূরে—আঁখমুছ্‌লি। ইহা একটি তিনপ্রকোষ্ঠ-সম্বলিত বারান্দাপরিবেষ্টিত অট্টালিকা। সম্রাট্ এই স্থানে রমণীগণসহ লুকোচুরী খেলিতেন ;—এই জনরব হইতেই ইহার নাম আঁখমুছ্‌লি হইয়াছে।

দেওয়ানীখাসের অপর পার্শ্বে ইস্তাম্বুল বেগমের (Turkish Sultana's) গৃহ। গাইডগুলি এমন অশিক্ষিত যে, ইস্তাম্বুলকে তাম্বুলে পরিণত করিয়া,তাহারা ইহাকে জনৈক পানওয়ালীর গৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। এই ক্ষুদ্র বাসগৃহের প্রকৃত অবস্থিতির খবর পূর্ব্বে ভালরূপ না জানা থাকিলে,আমার পক্ষে ইহা চিনিয়া লওয়া দুষ্কর হইত। গৃহটি ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার নির্ম্মাণকৌশল বড়ই চমৎকার। এতদ্ব্যতীত, এককালে যে ইহার বহুমূল্য সাজসজ্জা ছিল, তাহার কিছু কিছু পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। ইহাতে একটি বৈ দু'টি ঘর নাই। দেওয়ালে—এমন কি ছাদেও, সর্ব্বত্র অতিসূক্ষ্মকারুকার্য্য দৃষ্ট হয়। এখান হইতে বাদসাহের শয়নগৃহ পর্য্যন্ত একটী গুপ্তরাস্তা ছিল। কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন আজকাল আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

সরোবরের পূর্ব্বধারে দেওয়ানী আম। পূর্ব্বপার্শ্বের

প্রশস্তপ্রাঙ্গণোপবিষ্ট অমাত্যগণকে তিনি এইখান হইতে সম্ভাষণ করিতেন।

ইহার দক্ষিণেই হামাম বা স্নানাগার। এই ভগ্ন তমসাবৃত গৃহ কোনকালে বিলাসিতার চরমনিকেতন ছিল। আজ ইহা শূন্য, ভগ্ন ও ধূলিমণ্ডিত। এই অন্ধকার ঘরে এখন আর গবাক্ষনিঃসৃত আলোকমালা সুগন্ধজলে প্রতিফলিত হয় না; আর পবনদেব ইহার মধুর সুরভি দিগদিগন্তরে বহন করেন না; সে সলিলাধারও এখন নাই। কালস্রোতে সব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। অমরবাঞ্ছিতধাম এখন জনমানবশূন্য; কলকণ্ঠকূজিতপুরী—সঙ্গীতমুগ্ধ রঙ্গমহাল এখন শৃগালকুক্কুরের অপ্রিয়রবে চিরধ্বনিত! এই তিন দিনের জন্যই ত আমরা কত অহঙ্কার করিয়া থাকি; এই ক্ষুদ্র মানবজীবন ধারণ করিয়াই চারিদিকে "আমার আমার" রব উত্থিত করি! একবারও ত একথা মনে হয় না যে, আজ যাহা আপনার ভাবিতেছি, কালের একটী ক্ষুদ্রতরঙ্গাঘাতে তাহাই কাল অন্যের হস্তে তাড়িত হইয়া যাইবে!

জলাশয়ের ঠিক দক্ষিণেই খোয়াবগা বা সম্রাটের শয়নগৃহ। এই দ্বিতল অট্টালিকায় নানাবিধ সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত ছিল। এখনও তাহাদের অস্পষ্টচিহ্ন কতক কতক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ঘরেরই একটী দ্বারসন্নিহিত কোনও আসনে বসিয়া, বাদসাহ দপ্তরের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন। সম্রাটের দপ্তর-খানা এই মহলের বহির্ভাগে—দক্ষিণদিকে অবস্থিত। খাসমহল বা বেগমমহলের অধিকাংশ ঘরই এই শয়নগৃহের সহিত গুপ্ত-দ্বারপথে সংলগ্ন ছিল।

আমরা এখান হইতে দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া, ক্রমে পর্ব্বত-

নিম্নে অবতরণ করিলাম। কত ভগ্ন বাড়ীঘর আমাদের পার্শ্বে পড়িয়া রহিল, তাহাদের কথা এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে বর্ণনা করা অসম্ভব। এরূপ ছোট আখ্যায়িকায় কেবলমাত্র প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলিরই উল্লেখ করিতে হইতেছে।

পর্ব্বতনিম্নে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও তত্তীরে হাকিমের বাসভবন দেখিতে পাইলাম। এখানে অসংখ্য মৃত্তিকাগর্ভস্থ ঘর অব্যবহারে ও সংস্কারের অভাবে দুর্গম হইয়া রহিয়াছে। আমি অতি দুঃসাহস করিয়া,একটী স্নানাগার ও অন্য কতকগুলি নিবিড় তমসাময়ঘরে কতকক্ষণ বিচরণ করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। স্নানাগারটী যে এককালে বড়ই মনোরম ছিল, তাহা এইটুকু দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারিলাম।

এতদ্ব্যতীত, টাঁকশাল, যোগী-কা-ছত্রী,নাগিনামসজিদ প্রভৃতি আরও অনেক দর্শনীয় স্থান আছে, তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই।

বাহির হইয়া দেখি, টুপ্ টাপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে। দৌড়িয়া কোনরূপে একারোহণ করিলাম। শকটচালক যন্ত্রাবরণে আমাকে উত্তমরূপ ঘেরিয়া, এই প্রবলবৃষ্টির ভিতর দিয়াই দ্রুতবেগে একা চালাইয়া দিল। আমরা ভিজিতে ভিজিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া ষ্টেসনে পৌছিলাম।

রাত্রি ৮টার সময় ট্রেন। কিন্তু অদৃষ্টদোষে গাড়ী আসিতে আসিতে ১১টা বাজিয়া গেল। সারাদিনের পরিশ্রমে ও রাত্রির শীতে আমার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল। কোনরূপে চৈতন্য রক্ষা করিয়া, রাত্রি ১২টার সময় আগ্রা পৌছিলাম।

তখন রাস্তার দীপাবলি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। অসংখ্য-

জনপূর্ণরাজবর্ত্ম—নীরব, নিস্তব্ধ। তাহার উপর আকাশের কাল মেঘগুলি চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। আমি কোনও প্রকারে পথ নির্দ্দেশ করিতে করিতে সরাইয়ে উপস্থিত হইলাম। বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া দেখি—ভয়ঙ্কর ক্ষুধাবোধ হইয়াছে। দোকানপাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং আহার্য্য পাওয়া অসম্ভব। অদূরে এক ফেরিওয়ালা কয়েকখানা ডালপুরী লইয়া তখনও বসিয়াছিল। অন্ধকারের ভিতর তাহার পবনসন্তাড়িত প্রদীপরশ্মি তখনও মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। আমি অগত্যা তাহার নিকট হইতেই দুই আনা দিয়া চারি পয়সার জিনিস খরিদপূর্ব্বক জঠরানল নিবৃত্তি করিলাম। তারপর সারাদিনের পরিশ্রমান্তে, আমার ক্লান্তিময় দেহ বিরামদায়িনী নিদ্রার কোলে অমিশ্রিতশান্তিলাভ করিল।

বুধবার ৮ই ফাল্গুন। গত কল্যের পরিশ্রমে আজ শয্যা পরিত্যাগ করিতে করিতে আটটা বাজিয়া গেল। উঠিয়া দেখি, রৌদ্রে চারিদিক ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া লইলাম। তারপর বেশভূষা করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগপূর্ব্বক বাহির হইলাম।

আজ আর বিশেষ কোথাও যাওয়া হইল না। সরাইয়েই একদিনের জন্য বিশ্রাম লইলাম। ক্রমাগত পরিশ্রমের পর এই বিশ্রাম বড়ই ভাল লাগিল। সন্ধ্যার সময় একটু এদিক ওদিক হাওয়া খাইয়া আসা গেল। এই সময় চকের যে শোভা হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আজও যেন এই দৃশ্য নূতন বলিয়া বোধ হইল।

আগ্রা, পাথরের সামগ্রীর জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। দোকানপাটগুলি

কি চমৎকার চমৎকার খোদাইদ্রব্যে পরিপূরিত! ইচ্ছা হয়, প্রতি দোকানে দোকানে কতক্ষণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া দেখিয়া লই। এতদ্ব্যতীত এই নগরী তুলা, গালিচা ও জুতার ব্যবসায়েও প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

রাত্রি দেড়টার সময় R. M. R. লাইনে জয়পুর যাত্রা করিলাম। কিন্তু পাঠক অবগত আছেন, ইতিমধ্যে আমাকে মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে হইয়াছিল। সেজন্য পূর্ব্বে তাহাদের কথা বলিয়া লইতে হইবে।

বৃন্দাবন।

আমার সঙ্গে যে বাঙ্গালীবাবুদুইটী বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম হরিবাবু ও অমৃতবাবু। বাবু দুইটী বেশ অমায়িক। সেই একটুখানি সাক্ষাতেই আমরা পরস্পরের নিকট কেমন আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহারা আমাকে বড়ই যত্ন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তবু তাঁহাদের সঙ্গে বেশী দিন থাকা আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। তাহার কারণ এই যে, আমাদের ভ্রমণ-প্রণালীর ভিতর একটু পার্থক্য ছিল। তাঁহারা আসিয়াছেন ধর্ম্মার্জ্জন করিতে, আমি আসিয়াছি দেশভ্রমণ করিতে। আমার মত তাঁহাদের দর্শনস্পৃহা তত ছিল না; আর থাকিলেও সে খুব মোটামুটিরকম। বাসা ভাড়া করিয়া সঙ্গীয় রাঁধুনীর পাক খাইয়া তাহারা এক এক স্থানে দীর্ঘকাল আরামে অবস্থান করিতেন; আর দিনান্তে প্রত্যহ একটু একটু ঘুরিয়া আসিতেন। সুতরাং আমার সঙ্গে তাঁহাদের বনিল না।

তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তিন চারি দিবস পরেই আমি একদিকে সরিয়া পড়িলাম। বিদায়কালে তাঁহাদের সরল ব্যবহার ও অপ্রতিম স্নেহ দর্শন করিয়া, আমার ভ্রমণের সহানুভূতিহীন জীবনটা একবারে দ্রব হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের ভিতর একজন বলিতেছিলেন, "সুরেনবাবুর কি একটুও মায়ামমতা নেই?" আমি নিঃশব্দে একটু মৃদু হাসিয়াই এ কথার উত্তর দিলাম। কিন্তু সে কথা যাক্, ইতিপূর্ব্বের কথা বলিতে হইতেছে।

রাত্রি ১০॥০টার সময় আমি, ব্রজবাসী, এই দু'টী বাবু ও তাহাদের সঙ্গীয় দাসীটী, এই পাঁচজনে ষ্টেসনে আসিয়া গাড়ী চাপিলাম। মথুরার গাড়ীগুলি জয়পুরের গাড়ীগুলির চেয়েও ক্ষুদ্রায়তন; কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে। এই গাড়ীতে একটা মজা এই যে, মথুরা পর্য্যন্ত তৃতীয়শ্রেণীর ভাড়া ও মধ্যমশ্রেণীর ভাড়া এক। কিন্তু সাধারণ লোকে এ খবরটা রাখে না বলিয়াই, মধ্যমশ্রেণীতে ভদ্রলোকগণ একাধিপত্য করিয়া থাকেন।

আমাদের সঙ্গীয় ব্রজবাসী ভারি সেয়ানা লোক। চরস, গাঁজা, অহিফেন, কিছুতেই তাঁহার বিদ্যার দৌড় কম নহে। সে খুব পাকা রকম একটা দম আঁটিয়া নিজেই আমাদের জিনিসপত্রগুলি গাড়ীতে তুলিয়া লইল, এবং দৌড়িয়া যাইয়া মধ্যমশ্রেণীর টিকিট করিয়া আনিল। তারপর বিছানাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বলিল, "ঘুমা বাবা, কুচ্ছু চিন্তা নেহি আছে—হামি তোকে তুলিয়া লিবে"। আমি অগত্যা শয়ন করিলাম।

কিন্তু এ কথা শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, ব্রজবাসীরা সাধারণতঃই ঐরূপ নেশাখোর হইয়া থাকে। পাণ্ডা কি তাহাদের

এইরূপ ভৃত্যাদের ভিতর প্রায় সকলেই অতিশয় হিতকারী, সাধু, সুশীল ও দয়াবান্। তবে কোথাও কোথাও পয়সার প্রবলস্রোতটা দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু সেজন্য তাঁহাদের যত্নের কোনরূপ ত্রুটি হয় না।

রাত্রি ১২॥০টার সময় মথুরাষ্টেসনে নামিয়া, আমাদিগকে মোসাফিরখানায়ই (Waiting room) একাংশে শয়ন করিয়া থাকিতে হইল। কারণ, প্রাতে বই বৃন্দাবনের গাড়ী নাই। এখান হইতে বৃন্দাবন চারিমাইল মাত্র দূরবর্ত্তী। গাড়ীভাড়া /৫ পয়সা। কিন্তু এই গাড়ী প্রভাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার মাত্র গমনাগমন করিয়া থাকে। গাড়ীগুলিও অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। আমরা কোনও রূপে এই দুর্জ্জয় শীত উপেক্ষা করিয়া, উন্মুক্ত ষ্টেসনগৃহে শয়ন করিয়া রহিলাম। কিন্তু তাও কি ঘুমাইবার সাধ্য আছে? দলে দলে পাণ্ডার ঝাঁক আসিয়া নাম, ধাম ও পিতৃপুরুষ চৌদ্দগোষ্ঠীর খবর দাবী করিতে লাগিল, এবং আমাদের মধ্যে কেহ কখন কোন বাপ-দাদার কালে ব্রজে আসিয়াছি কি না বারংবার জানিতে চাহিল। ইহাদের ভিতর কাহারও উপাধি দেড়ভাই, কাহারও উপাধি সাড়েচারিভাই, কাহারও আড়াইভাই ইত্যাদি। এই লাঙ্গুলরূপী আখ্যার [illegible] অর্থ এই যে, তাহাদের ভাইদের ভিতর যিনি বিবাহিত [illegible]হেন, তিনি পূরা নহেন—আধা। এই হিসাবে গণনা করিয়াই তাহারা দেড়, আড়াই ও সাড়েচাররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

যাহা হউক, সময় ত আর বসিয়া থাকে না। তাহাদের এই অত্যাচার ও মাঝে মাঝে রেলওয়েপুলিসের উপদ্রবের মধ্যে

বাকি রাত্রিটুকু প্রভাত হইয়া গেল। আমরা গাড়ী প্রস্তুত দেখিয়া, তাড়াতাড়ি যাইয়া আরোহণ করিলাম।

মথুরাতে দু'টী রেলওয়ে ষ্টেসন—মথুরাসিটি ও মথুরাকেণ্টনমেণ্ট। আমরা কেণ্টনমেণ্ট হইতে গাড়ীতে উঠিয়াছি। হিন্দুতীর্থ মথুরাতে ছাউনির অবস্থান আমার চক্ষে কেমন অপ্রীতিকর বোধ হইতেছিল। যেথানে প্রবল পরাক্রান্ত কংসের ভয়ে ভগবানকেও একদিন প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইতে হইয়াছিল, তাহা আজ আর কাহারও অগম্য নহে।

মথুরাসিটি হইয়া আমাদের গাড়ী বৃন্দাবনাভিমুখে প্রস্থান করিল। ষ্টেসন হইতে সহর ভালরূপ দেখিতে পাইলাম না। আজ আমরা ব্রজধামে,—যেখানে ভগবান্ অনন্তলীলাখেলা করিয়া গিয়াছেন,—সেই ব্রজধামে! জীবনের মুকুলাবস্থায় জ্যোৎস্না-পুলকিত নিশায় ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া, যখন পিসিমার সুধাময় মুখে এইস্থানের বর্ণনা শ্রবণ করিতে ২ মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম, তখন একবারও কি মনে হইয়াছিল যে, আমার জীবনেও এই [illegible] একদিন উপস্থিত হইবে? অতীতের সুধাময়স্মৃতিস্পর্শে এই পবিত্রপুরীর প্রত্যেক ধূলিকণা যেন আজও সেইরূপ দুর্লভ ও গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে। শ্যামলপ্রান্তরের মাঝে মাঝে বনভূমির অপূর্ব্ব শোভা, সার্দ্ধপঞ্চসহস্রবৎসরের ঐতিহাসিকালোকে দ্বিগুণ মনোরম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আবার এই সকল স্বভাবসুন্দর কাননগুলি যখন অকুতোভয়, হিংসাদ্বেষজ্ঞানবর্জ্জিত শিখিকুলের রমণীয় পদবিক্ষেপে ও আনন্দকোলাহলে ধ্বনিত হইয়া উঠে, তখন দর্শকের অন্তঃকরণ ভক্তি ও প্রেমে এক অপরূপ স্বর্গীয়ভাবে পরিপ্লুত হইয়া যায়।

আমরা এইসকল স্মৃতিউদ্দীপক দৃশ্যাবলীর ভিতর দিয়া বেলা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় বৃন্দাবন পৌঁছিলাম।

বৃন্দাবনের চতুর্দ্দিকে চৌরাশীক্রোশ পরিধির মধ্যে ব্রজভূমি সীমাবদ্ধ। মথুরা, গোকুল, মহাবন, ডিগ, গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড এই ব্রজপুরীর অন্তর্গত। যাত্রিকগণ বৎসরান্তে একবার করিয়া পদব্রজে এই পবিত্রধাম প্রদক্ষিণ করেন। এই চৌরাশী-ক্রোশের ভিতরেই ভগবানের বাল্যলীলা সমাপিত হইয়াছিল। সেই সুমধুর লীলাখেলার স্মৃতি, দর্শকের অন্তস্তল স্পর্শ করিয়া, যুগপৎ হর্ষবিষাদের সঞ্চার করিয়া দেয়। আমরা ব্যাকুলহৃদয়ে অবতরণ করিয়া, পাণ্ডার বাসায় গমন করিলাম।

কিন্তু প্রথম প্রথম বৃন্দাবন দর্শন করিয়া আমাকে একটু নিরাশ হইতে হইল। যে বিহারকাননে শ্রীকৃষ্ণ একদিন লুকো-চুরি খেলিতেন, তাহা আজ হর্ম্ম্যমালাপরিশোভিত নগরীতে পরিণত হইয়াছে; এখানেও পুলিসের থানা ও আফিস বসি-য়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বিহার কাননে এইসকল সাংসারিক আবর্জ্জনা তীর্থ যাত্রীর চক্ষে বড় মনোরম নহে।

আমরা পাণ্ডার বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখি, একটী ছোট সুন্দর যুবক সহাস্য বদনে বসিয়া আছে। সে আমাদিগকে দেখিয়া খুব আদর যত্ন করিল ও অন্য একটী বাসায় লইয়া গেল; কিন্তু সে বাসা আমার সঙ্গীয় বাবুদ্বয়ের পছন্দানুরূপ হইল না। আমরা অতঃপর আরও ২।৩ টী বাসা দেখিয়া অবশেষে নরহরি-দাসের কুঞ্জে আশ্রয় লইলাম। "কুঞ্জ" শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা লতাপত্রাদিশোভিত কোন বিহারকাননে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বৃন্দাবনের বাসাবাড়ীমাত্রই 'কুঞ্জ' বলিয়া অভিহিত হয়। আমরা যথায় বাসা গ্রহণ করিলাম, তাহা

বঙ্গদেশাগত বাবাজী নরহরিদাসের একটী চক্‌মিলান দ্বিতল অট্টালিকা।

এখানকার ঘরবাড়ীগুলি সাধারণতঃ একটু স্বতন্ত্রভাবে তৈয়ারি করিতে হয়। অন্ততঃ জানালাকপাটের সংখ্যা কম করা চাই। তাহাতে ঘরগুলি একটু অন্ধকার হয় সত্য. কিন্তু দস্যুরূপী ও ব্যঙ্গপ্রিয় কপিকুলের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। বেনারস হইতে আরম্ভ করিয়া, পশ্চিমের সর্ব্বত্রই ইহাদের অল্লাধিক আধিপত্য আছে ; কিন্তু এখানে তাহাদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এজন্য ঘরের দরজা কি জানালা কিছু উন্মুক্ত রাখিয়া, একপদও অগ্রসর হওয়ার সাধ্য নাই। আমরা উপস্থিত হইতে না হইতেই কোথা হইতে একটা ছুটিয়া আসিয়া, একখানা জুতা লইয়া প্রস্থান করিল। আমরা দৌড়িয়া বাহির হইতে না হইতে, কপিপ্রবর সুদূর গৃহচূড়ে আরোহণপূর্ব্বক আমাদিগকে মুখ খিঁচাইয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

বৃন্দাবনে জলের কল নাই। কূপের জলে কাজসম্পন্ন করিতে হয়। আমরা হাতমুখ ধুইয়া, একটু বিশ্রামান্তর বাহির হইলাম। সঙ্গীয় স্ত্রীলোকটী বাড়ী প্রহরায় রহিল।

রাস্তায় বাহির হইয়াই বুঝিতে পারিলাম, এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এমন কি, এখানকার অধিবাসীরা তাহাদের স্বরচিত একরূপ বঙ্গভাষা ব্যবহার করিতে পারে। রাস্তাঘাটে সর্ব্বত্রই অসংখ্য বাঙ্গালীনরনারী দৃষ্ট হইতে লাগিল। আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন পশ্চিমের এই সুদূরপ্রান্তে স্বদেশের একটুক্‌রা কেমনে আসিয়া ছুটিয়া পড়িয়াছে।

বৃন্দাবন খুব বড় সহর নহে, কিন্তু সমৃদ্ধিশালী বটে। এই

সমৃদ্ধি বাণিজ্যের নহে, রাজকীয় নহে—ভক্তির। ভক্তিপ্রসূত অসংখ্যকীর্ত্তি এইস্থানে বর্ত্তমান আছে। ভারতের সমুদয় প্রদেশবাসী ধনিগণ এইখানে ভক্তির স্রোতে কোটী কোটী মুদ্রা ভাসাইয়া দিয়া, কত কত কীর্ত্তিমন্দির স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখানকার দেবমন্দিরগুলি বেনারসের ন্যায় সঙ্কীর্ণ ও অপ্রশস্ত নহে। নানারূপরত্নাদিবিভূষিত মর্ম্মরপ্রস্তরমণ্ডিত বহুবিস্তৃত ঠাকুরবাড়ীগুলি বৃন্দাবনের অতুল সম্পত্তি; ভিতরে প্রবেশ করিলে নয়ন ঝলসিয়া যায়। ইহাদের এক একটী দেবতার ভরণপোষণার্থ বাৎসরিক সহস্র সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তি নির্দ্ধারিত আছে। এই সকল দেবমন্দিরে প্রতিদিন মহাসমারোহে পূজাচার, আরতি ও ভাগবৎপাঠ হইয়া থাকে।

বাজারে শাক, মূল, তরকারী প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্যাদি ও নামাবলী, তুলসীর মালা ব্যতীত আর বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। ব্রজধামের কুত্রাপি প্রাণিহত্যা হইতে পারে না। এইজন্য বাজারে মৎস্যমাংস পাওয়া দূরে থাকুক, এই চৌরাশীক্রোশমধ্যে শ্বেতাঙ্গগণও মৃগয়া করিতে অধিকারী নহেন।

অদ্য একাদশী—বৃন্দাবনে ভাত খাওয়া নিষিদ্ধ; হরিবাবু লুচি তৈয়ার করিবার জন্য ময়দা, ঘৃত ও কাষ্ঠাদি আহরণ করিলেন। নিজে পাক করার আমি কখনই পক্ষপাতী নহি; কাজেই বড় ধারে কাছে গেলাম না। হরিবাবু সব ক্রয় করিয়া, অমৃতবাবুর তত্ত্বাবধানে বাসায় পাঠাইয়াদিলেন। তারপর আমরা দুইজনে যমুনাতীরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

বৃন্দাবনে আজকাল যাহা কিছু পুরাতন-চিহ্ন বর্ত্তমান আছে,

তন্মধ্যে যমুনাকেই আমার সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছিল। যদিও বংশীধ্বনিসংযুক্ত স্রোতস্বিনীর উজানগতিদর্শনসৌভাগ্য আর ঘটিয়া উঠে না; যদিও সে চিরশ্রুত চিরপ্রসিদ্ধ কালজলের কৃষ্ণত্বের অস্তিত্ব অনেকদিন লোপ পাইয়াছে; তথাপি এই শোভাময়ী তরঙ্গিনী যেন সতত-ই করুণকণ্ঠে আপনার অতীতকাহিনী গাহিতে গাহিতে বহিয়া যাইতেছে। এখনও যেন দূরতটনিঃসৃত সঙ্গীত-ধ্বনির আবেগতরঙ্গ ক্ষুদ্রবীচিমালাগ্রস্পর্শ করিয়া, নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিতেছে। ক্ষণকালের জন্য যেন মনে হয়, আবার বুঝি সত্যসত্যই দ্বাপরযুগের একটা আনন্দময় স্বপ্ন দেখিয়া আপনা বিস্মৃত হইতেছি।

কিন্তু জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে যমুনারও বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে জল ছিল, সেখানে এখন মাঠ হইয়াছে; পূর্ব্বে যেখানে কানন ছিল, সেখানে এখন জলস্রোত। উপদ্বীপাকার বৃন্দাবন, এখন আর ত্রিকোণ নহে; তবে বর্ষাকালে জল বৃদ্ধি পাইয়া যখন প্রান্তরাদি মগ্ন করিয়া ফেলে, তখন ইহার পূর্ব্বরূপ কতক কতক প্রকটিত হয় বটে। পশ্চিমদিকস্থ তীর প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাটসমূহে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সোপানাবলীর নীচে জলের চিহ্নমাত্র নাই। নদী ও ঘাটগুলির মধ্যে বিস্তীর্ণ বালুকা-চরের আবির্ভাব হইয়াছে। পূর্ব্বদিকের তীর অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পাকা ইন্দারাগুলির ইষ্টকনির্ম্মিতপ্রাচীরগুলি মৃত্তিকা-রাশির সঙ্গে সঙ্গে সলিলগর্ভে লীন হইয়া যায় নাই—তরঙ্গিনীবক্ষে, কোথাও কোথাও বা অপরতীরস্থ বালুকারাশিতে তাহাদের উচ্চ মস্তকগুলি ভাসিয়া উঠিয়াছে। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, বর্ত্তমান যমুনা, আজ পুরাতন বৃন্দাবনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, এবং

কোনকালে পরাপর-পর্য্যন্ত এই বিহার-কাননের বিস্তৃতি ছিল। এই দিকে তটভূমি অনেকটা কাননময়। কথিত আছে, এই বনাচ্ছাদনে সূর্য্যদেবকে কিঞ্চিৎ বিলম্বে দর্শন দিতে হইত। কুল, আম্র ও শ্যামবৃক্ষে চারিদিক আচ্ছাদিত। এদেশে কুলের অভাব নাই। উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নারিকেলীকুল একপয়সা দুইপয়সা দরে প্রতি সের বিক্রীত হইয়া থাকে। তাও পয়সা দিয়া লোকে খুব কমই ক্রয় করে। কিন্তু বানরেরা বনস্বামীকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলে। এজন্য ধনুর্ব্বাণহস্তে সর্ব্বদাই একজনকে বাগানের তত্ত্বাবধানে থাকিতে হয়।

আমরা বস্ত্রহরণঘাটে নামিয়া, বালুকারাশির ভিতর কতক দূর হাঁটিয়া যাইয়া স্নান করিয়া আসিলাম। প্রবাদ এই যে, এই ঘাটেই শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের বস্ত্রহরণ করিয়া, কদম্বশাখায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। উহার চিহ্নস্বরূপ পাণ্ডাগণ একটী পুরাতন কেলিকদম্ববৃক্ষ আজও যাত্রিকগণকে দেখাইয়া থাকে; কিন্তু এই বৃক্ষ যে তত পুরাতন, সেরূপ নিদর্শন কিছুই দৃষ্ট হয় না। আমি অতঃপর একজন শিক্ষিত পুরাবিদের নিকট হইতে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই বৃক্ষের বা ঘাটের সঙ্গে যে বস্ত্রহরণের কিছুমাত্র সংস্রব ছিল, তেমন বোধ হয় না। নন্দভবনের নিকটস্থ যমুনাপুলিনেই এই ব্যাপার সংঘটিত হয়; এবং তথায় এখনও একটী পুরাতন বৃক্ষ আছে,—এমত শ্রুত হইলাম।

যমুনার জলে অসংখ্য কচ্ছপ কিলিবিলি করিতেছে। এক একটা এত বড় যে, কালের আধিক্যে তাহাদের পৃষ্ঠে শৈবালরাশি জমা হইয়া গিয়াছে। দূরে বালুকার উপর

কয়েকটা কুম্ভীরও সূর্য্যাতপে আরাম উপভোগ করিতেছে, দেখিতে পাইলাম। কিন্তু বৃন্দাবনের অলৌকিক মাহাত্ম্যে তাহারা অতি নিরীহ ও হিংসাদ্বেষবর্জ্জিত কচ্ছপগুলিকে ঠেলিয়া স্নান করিয়া উঠ, কেহ কিছু বলিবে না; কেবল আপন মনে কিলবিল করিয়া বেড়াইবে। স্নেহের বন্ধনে কি না হয়? তুমি যদি জানাইতে পার যে, তোমার দুরভিসন্ধি নাই, বিষধর পর্য্যন্তও তোমার অনিষ্টাভিলাষ পরিত্যাগ করিবে—অন্যে পরে কা কথা?

আমাদের পক্ষে এই দৃশ্য নূতন; সুতরাং একটু কেমন কেমন করিতেছিল। যাহা হউক, কোনরূপে সাহসে ভরপূর্ব্বক স্নান করিয়া উঠিলাম। নিকটে একটা পাণ্ডা দাঁড়াইয়াছিল। সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া, যমুনাতীরে উপবেশন করিবার জন্য আমাদিগকে ব্যগ্রভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। আমরা তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়াই বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

আসিয়া দেখি, মেজের উপর লম্বা বিছানা সজ্জিত হইয়াছে। অমনি সটান শুইয়া পড়িলাম। এদিকে রান্নাঘরে খুব ধূম পড়িয়া গিয়াছে। অমৃতবাবু পাচিকাকে লুচি তরকারী প্রস্তুতের নানারূপ পরামর্শ দিতেছিলেন। হরিবাবুও তথায় যাইয়া যোগ দিলেন। আমি এই অবসরে একটু ঘুমাইয়া লইলাম।

বেলা চারিটার সময় আমাদের আহারাদি সমাপন হইলে, পাণ্ডামহাশয় আগমন করিলেন। ইনি খুব ভাল লোক; চরিত্রও যেমন নির্ম্মল, আকৃতিও তেমনি নির্দ্দোষ ও ত্রুটিশূন্য। তখন হরিবাবু ও অমৃতবাবু একত্রিত হইয়া, পাণ্ডামহাশয়ের

সঙ্গে যথাকর্ত্তব্য পরামর্শ আঁটিতে লাগিলেন। পাণ্ডামহাশয় যাহা কহিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ ;—বৃন্দাবন অতি পবিত্র তীর্থ, এরূপস্থান জগতে আর নাই। ভগবান্ বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনবাস আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। এখানে আসিয়া রীতি-মত কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিলে, মোক্ষলাভ হয়। যাহারা সকল কাজ করিতে অক্ষম, তাহাদেরও অন্ততঃ গোবিন্‌জী, গোপীমোহন, মদনমোহন প্রভৃতি আদিদেবতার সমীপে ও যমুনাতে ভেট দেওয়া কর্ত্তব্য। তারপর নিধুবন, নিকুঞ্জবন ও পঞ্চক্রোশীও ভ্রমণ করা চাই। নতুবা বৃন্দাবনগমনের উদ্দেশ্যই থাকিতে পারে না।

তারপর যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করিয়া তিনি যে একখানি খরচের তালিকা প্রস্তুত করিলেন, তাহা এইরূপ। এতদপেক্ষা কম খরচ সম্ভবপর নহে বলিয়াই, যাত্রিকদিগের সুবিধার্থ লিপিবদ্ধ করিলাম।

পঞ্চদেবতার সমীপে পাঁচটী ভেট	১।০
যমুনা-পূজা	১৲
পুষ্পাদি	৵১০
নিধুবনপ্রবেশের ফি	।৴০
নিকুঞ্জবন প্রবেশের ফি	।৴০
পাণ্ডাঠাকুরের প্রণামী	১৲
	৪৲১০

পাণ্ডাঠাকুরের বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না। বেশ লোক—দিব্য হাসিখুসী; অথচ গাম্ভীর্য্যের অভাব ছিল না। দেখিয়া আমার খুব ভক্তি হইয়াছিল। তাঁহার ছোট ভাই

আমারই সমবয়স্ক। তিনি আমাদিগকে লইয়া অপরাহ্নে পরিভ্রমণার্থ বাহির হইলেন। আমরা প্রথমেই যাইয়া নিধুবনে উপস্থিত হইলাম।

তীর্থস্থানগুলি আজকাল Lady Minto র *Fancy fete* এর মত হইয়া উঠিয়াছে। পয়সা খরচ করিতে পার, ঢুক—নতুবা কোথাও প্রবেশ করিবার যো নাই। পার্থিব পয়সার সঙ্গে এই সকল অপার্থিব দর্শনীয় বস্তুগুলির কি সম্পর্ক আছে, তাহা একবারও কি কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন? এই অর্থোপার্জ্জনের ফলে, এই সকল পবিত্রস্থানগুলি প্রতারণার লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে। জীবনোপায়ের এক নূতন পন্থা দর্শন করিয়া, অনেকে সামান্য শিলাখণ্ডমাত্রকেই কৃত্রিম দেবদেবীতে পরিণত করিয়া, যাত্রিকদিগকে প্রতারিত করিতেছে। যাহা হউক, উপায় নাই, আমরা পাঁচ আনা ফি দিয়া কাননপ্রবেশ করিলাম।

নিধুবন আর সে নিধুবন নাই; কৃত্রিমতার স্পর্শে স্বভাবের স্বভাবসৌন্দর্য্য তিরোহিত হইয়াছে। যে মুক্তকাননে ভগবান্ সখাপরিবেষ্টিত হইয়া, কত কত অদ্ভুত লীলা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ প্রাচীরবেষ্টিত; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তাগুলি আজ প্রস্তরমণ্ডিত। যেখানেই শ্রীকৃষ্ণ কোনও লীলাখেলা করিয়া গিয়াছেন, সেইস্থানেই একটী নবপ্রতিষ্ঠিত ইষ্টকালয়ের উদ্ভব হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া বড়ই নিরাশ হইতে হইল। ছোট ছোট মুক্তাবৃক্ষগুলি পুরাতন বলিয়া বোধ হইলেও, তেমন পুরাতন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে তাহাদের শোভা বেশ মনোরম বটে। এই সামান্য কুঞ্জের ভিতরেই এমন লুকোচুরি খেলা যায় যে, খুঁজিয়া বাহির করিবার সাধ্য

নাই। এখানকার একটী সম্পূর্ণ প্রস্তরমণ্ডিত ছোট জলাশয়ের নাম—বিশাখাকুণ্ড। একদা মাধববিনোদিনী বনভ্রমণকালে পিপাসিত হইলে, মাধব, বিশাখাসখির হস্তস্থিত দণ্ডগ্রহণ করিয়া, এইখানে কূপখননপূর্ব্বক জলোত্তোলন করেন। সেই অবধি ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এইখানে যাত্রিকদিগকে জলস্পর্শ করিয়া মন্ত্রাদি পাঠ করিতে হয়।

এখান হইতে বাহির হইয়া আমরা বংশীবট, গোপেশ্বরশিব, ব্রহ্মচারীর মন্দির, লালাবাবুর বাড়ী ও শেঠের দেবালয় দর্শন করিলাম।

বংশীবটে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রাঙ্গণ-মধ্যে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ, তদুপরি অসংখ্য রাধিকামূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। বৃক্ষনিম্নে সুন্দর প্রস্তরখোদিত রাধার চরণযুগল স্থাপিত হইয়াছে। একপার্শ্বে দেবালয়; প্রাঙ্গণের চারিদিকে উচ্চপ্রাচীরে অসংখ্য রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি চিত্রিত আছে। ইহার নিকটেই গোপেশ্বরশিবের বাটী। শ্রীকৃষ্ণের একাধিপত্য বৃন্দাবনরাজ্যে এই একটীমাত্র শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এখানে অন্য কোন দেবতার অধিকার নাই। এই শিব-লিঙ্গসম্বন্ধে পাণ্ডারা গল্প বলিয়া থাকে যে, একদিন ভগবানের নামগানে ব্রজকামিনীগণ মত্ত হইলে, দেবাদিদেব মহাদেব ভক্তি-গদ্গদচিত্তে বৃন্দাবনে আগমনপূর্ব্বক তাহাদের সহিত স্ত্রীবেশে নৃত্য করিতে থাকেন। পরে ধরা পড়িয়া বিশেষ লজ্জিত হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্টহৃদয়ে তাঁহাকে এইস্থানে বাসের অনুমতি প্রদান করেন। তদবধি বৃন্দাবনে গোপেশ্বরশিবের অধিষ্ঠান হইয়াছে।

ব্রহ্মচারীর বাড়ীতে সর্ব্বদা রাসলীলার অভিনয় হইয়া থাকে। আমরা যখন উপস্থিত হইলাম, তখন ছোট ছোট ছেলেগুলি রাধাকৃষ্ণ সাজিয়া বসিয়া আছে, দেখিতে পাইলাম। এখানে শ্রীকৃষ্ণের তিনটি মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহাদের নাম, ক্রমে—হংসগোপাল, রাধিকাগোপাল ও নৃত্যগোপাল।

লালাবাবুর বাড়া খুব প্রকাণ্ড। [illegible] দিন অপরাহ্নে ভাগবত পাঠ হইয়া থাকে। বহুলোক ভক্তি-সহকারে মধুরকণ্ঠোচ্চারিত সে অমৃতলহরী পান করে। আমরাও কিয়ৎকাল শ্রবণ করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

শেঠের দেবমন্দির বৃন্দাবনে এক মহতী কীর্ত্তি। প্রবেশ করিয়াই কেল্লাপ্রাচীরের মত প্রকাণ্ড দেওয়াল দেখিতে পাইলাম। সম্মুখেই বৃহৎ ফটক। ইহার পরেই প্রস্তরমণ্ডিত আঙ্গিনার পার্শ্বে প্রস্তরসোপানাবলিশোভিতা পুষ্করিণী। এই আঙ্গিনা অতিক্রম করিলেই, একটু পর পর দুইটি বহু পুরাতন অত্যুচ্চ সিংহদ্বার,—ইহাদের কারুকার্য্যের শোভা অনির্ব্বচনীয়। এই ফটক দুইটির আকৃতি ও গঠনপ্রণালী দেখিলেই উহাদের প্রাচীনত্ব স্পষ্ট উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহার পরেই দেবালয়ের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে কুবেরপ্রতিম শেঠের অদ্ভুতকীর্ত্তি স্বর্ণনির্ম্মিত তমালবৃক্ষ। ছোটকালে যখন এই বৃক্ষসম্বন্ধে গল্প শ্রবণ করিতাম, তখন ইহাকে পত্রগুচ্ছপরিপুষ্টবৃক্ষ বলিয়াই মনে হইয়াছিল; কিন্তু আজ এই চিরাভিলষিত ছবি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, সে ভাব তিরোহিত হইল। ইহাকে বৃক্ষশ্রেণীভুক্ত না করিয়া, স্তম্ভনামে পরিচিত করিলেই ন্যায়সঙ্গত হইত। কারণ, ইহাতে পত্রপুষ্পাদি কিছুই নাই;—সমস্তটা গাছ, কেবলমাত্র রজ্জুআকর্ষণে দেহরক্ষা

করিয়া, উচ্চস্তম্ভাকারে দাঁড়াইয়া আছে। যাহা হউক, বহু অর্থ-নির্ম্মিত এই অদ্ভুতস্তম্ভ দেখিতে নয়নরঞ্জন বটে।

দেবালয়েও কম টাকা ব্যয় হয় নাই। সর্ব্বত্র শ্বেতপ্রস্তরের ছড়াছড়ি। বৃহৎমন্দিরের দুইপার্শ্বে দুইটি সুদীর্ঘঘরে অন্যান্য দেব-দেবীও স্থাপিত আছেন। বামপার্শ্বে সুদর্শনচক্রের সাকাররূপ, শ্রীকৃষ্ণের নৃসিংহমূর্ত্তি, এবং দক্ষিণপার্শ্বের ঘরে শেঠের কুলগুরুর ও রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নাদির শিলামূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

অবশেষে আমরা গোবিন্দজীর বাড়ী যাত্রা করিলাম। গোবিন্দজী বৃন্দাবনের সর্ব্বপ্রধান দেবতা। এতবড় দেবালয় আর ব্রজপুরীর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যাইতে যাইতে রাস্তার একস্থানে আসিয়া পাণ্ডা বলিল, "ইহারই নাম যমুনাপুলিন; এইখানে বসিয়া শ্রীরাধিকা ক্রন্দন করিয়াছিলেন।" "যমুনা-পুলিন" শব্দে যে কেবলমাত্র একটি নির্দ্দিষ্টস্থানকে বুঝাইত, এমন কথা আমি আর কখন শ্রবণ করি নাই। বলিতে কি, এই পাণ্ডারা আপনাদের দেশসম্বন্ধে কিছুই খবর রাখে না। বোধ হয়, বাঙ্গালীগোস্বামীগণের আবির্ভাব না হইলে, সমস্ত ব্রজপুরী আজ অজ্ঞানতার তমসায় লুক্কায়িত থাকিত। চৈতন্যশিষ্য রূপ-সনাতনের অনুগ্রহেই আজকাল আমাদের ভাগ্যে এই সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতনপবিত্রধামদর্শন ঘটিয়া উঠিতেছে। যাহা হউক, যমুনা-পুলিনে ত যমুনার চিহ্ন কিছুমাত্র দেখিতে পাইলাম না। এইস্থান হইতে যমুনা সরিয়া যাওয়া অপেক্ষা, কালস্রোতে এই স্থানটুকুরই যমুনাগর্ভে লীন হওয়া অধিক সম্ভবপর ছিল বলিয়া আমার মনে হইল। যাহা হউক, দেবমন্দিরাদিবেষ্টিত এই বালুকা-ক্ষেত্রে কিয়ৎকাল উপবেশন করিয়া আমাদিগকে "ব্রজ" (বৃন্দা-

বনের ধূলি) গ্রহণ করিতে হইল। দেখিলাম, এই ধূলিসম্পত্তি লইয়াই একজন বুদ্ধিমান্ লোক একটি ঢিবির উপর উপবেশন-পূর্ব্বক বেশ দু'পয়সা ব্যাপার করিয়া লইতেছে।

সুলতানমামুদ, আরঙ্গজেব ও কালাপাহাড়ের কৃপায় ভারতে প্রাচীন দেবমন্দিরের অস্তিত্ব একরূপ লোপ পাইয়াছে। বৃন্দাবনে গোবিন্দজী, গোপীনাথজী ও মদনমোহনের প্রাচীনমন্দিরত্রয়ের এখন আর সে সমৃদ্ধি নাই—হিন্দুদ্বেষী আরঙ্গজেবের ধ্বংসক্রীড়ার সাক্ষীস্বরূপ কেবলমাত্র ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। তাহাদেরই সন্নিকটে নূতনবাড়ীতে বিগ্রহগণ আশ্রয় পাইয়াছেন। এই সকল দেবালয়ের গাত্রে যে আশ্চর্য্য শিল্পলিপি মুদ্রিত ছিল, তাহা এই গর্ব্বান্ধসম্রাটের কিঞ্চিন্মাত্রও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ধর্ম্মদ্বেষের নিকট গুণের মর্য্যাদা স্রোতস্তাড়িত বৃক্ষপত্রবৎ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে।

গোবিন্দজীউর প্রাচীনমন্দির সমগ্রভূমণ্ডলে একটা বিশেষ দর্শনীয় সামগ্রী। অদ্ভুতশিল্পালঙ্কৃত এই বিশালসৌধ, প্রাচীন হিন্দু-স্থাপত্যোৎকর্ষের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। ইহার সে সৌষ্ঠব, সে মহিমান্বিতকলেবর এখন অনেকটা খাটো হইয়া গিয়াছে সত্য; আরঙ্গজেবের কঠোর আদেশে এই গগনস্পর্শী অট্টালিকার গর্ব্বোন্নতমস্তক একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে বটে; তথাপি এখনও যে সৌন্দর্য্যরাশি ও স্বর্গীয় বিভা ইহার প্রতি প্রস্তরখণ্ডে ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা জগতে অতি দুর্ল্লভ। আজও এই ভগ্নস্তূপরাশি-দর্শনাভিলাষে দূরদূরান্তর হইতে শত শত বৈদেশিক পুরাবিদ্গণ-এইস্থানে আগমন করেন ও শতমুখে ইহার আশ্চর্য্য নির্ম্মাণ-কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যান। যতদূর জানা গিয়াছে,

তাহাতে এই অপূর্ব্ব দেবমন্দির অম্বরাধিপতি মানসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়াই অনুমিত হয়। অম্বর দুর্গের রম্যাবাসগুলিও এই রাজপুতবীরের প্রগাঢ় স্থাপত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করে।

এই ভগ্নমন্দিরের পশ্চাতেই নবপ্রতিষ্ঠিত দেবালয়। আমাদের প্রবেশপথেই, অসংখ্য ফুলওয়ালী সদ্যপ্রস্ফুটিত কুসুমরাশি, স্তবকে স্তবকে সাজাইয়া বসিয়া আছে। সন্ধ্যার লোহিতরাগে দিগন্ত উদ্ভাসিত। আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে, বহুলোক ভিতরে ছুটিয়াছে। চারিদিকে গভীরকল্লোল উত্থিত হইয়াছে। এই স্বর্গীয় শোভা দর্শন করিতে করিতে আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই দপ্তরখানা; এখানে আমাদের নামধাম ও ভেটের পয়সা পেশ করিতে হইল। হরিবাবু, গোবিন্‌জীর একটী ভোগের জন্য নয় আনা পয়সা জমা দিলেন। ভোগ পাঠাইবার সুবিধার জন্য আমাদিগকে বাসার ঠিকানা দিতে হইল। তারপর আমরা দু'টী দু'টী সুস্বাদু লাড্ডু প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, অন্যদ্বার পথে বৃহৎ দেবপ্রাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলাম।

এইখানে প্রকৃতই এক আনন্দবাজার বসিয়াছে। অগণিত প্রদীপরশ্মিমালা, জনতা ভেদ করিয়া, শ্বেতকৃষ্ণপ্রস্তরমণ্ডিত স্বচ্ছ প্রাঙ্গণে অবসরমত মুক্তারাশির সৃষ্টি করিতেছে। দেবমন্দিরের বারাণ্ডায় দরজার নিকট বহুনরনারী দেবদর্শনাকাঙ্ক্ষায় যুক্তকরে উপবিষ্ট। স্থান মিলিতেছে না;—তবু অনেকে কষ্টে স্রষ্টে দেহরক্ষা করিয়া আছে।

মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। আরতি আরম্ভ হয় নাই;—দেবদর্শনের এখনও কিছু বিলম্ব আছে। পর্দ্দান্তরালে ঠাকুর সাজগোছ করি-

তেছেন। বৃন্দাবনের ঠাকুরবাড়ীর আইনকানুনগুলি কিছু কড়াকড়। ৺কাশীধামের বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা বা অন্যান্য বিগ্রহের মত এখানকার দেবতারা তত নিবারেল নহেন। যে কেহ হঠাৎ মন্দিরে ঢুকিয়া তাঁহাদের দর্শনলাভ করিতে পারিবেন না। ঠাকুরদের আহারবিহার ও নিদ্রার জন্য বিভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট আছে; তখন দু' একজন সেবক ব্যতীত অন্যের প্রবেশাধিকার নাই। সময় সময় জনপ্রাণীমাত্রেরই গৃহপ্রবেশ নিষেধ।

কিছুকালপরেই, চারিদিকে তুমুল রব উত্থিত হইল। ফটকের নিকট নহবতখানায় ভেরী ও নহবত বাজিয়া উঠিল। শাঁক ও ঘণ্টার রোলে দেবপ্রাঙ্গণ ঘন ঘন ধ্বনিত হইতে লাগিল। 'জয় জয়' রবে উন্মত্ত হইয়া দীনবেশে কৌপীনধারী হরিভক্তগণ নাম-গান জুড়িয়া দিলেন। সে মধুর সঙ্গীতরবে আকৃষ্ট হইয়া, দর্শক-গণ চারিদিক হইতে দৌড়িয়া আসিতে লাগিল। তখন যে ঠেলা-ঠেলি ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ হইল, তাহা অবক্তব্য। আমরা কোন-রূপে দেহ রক্ষা করিয়া, এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

হঠাৎ দরজার যবনিকা অন্তর্হিত হইয়া গেল। তখন সেই বিশ্বমনোমোহন গোবিন্দজীর ও রাধারাণীর দুর্লভ যুগলমুরতি দর্শন করিয়া মনে যে অভূতপূর্ব্বভাবের সঞ্চার হইল, তাহার বিকাশ একমাত্র কল্পনাতেই সম্ভবে—লেখনীঅগ্রে পুস্তকাঙ্কে নহে। দর্শনমাত্র শত শত মস্তকগুলি, ছিন্নকদলীবৃক্ষপ্রায় একসঙ্গে মৃত্তিকাস্পর্শ করিল; যেন মহারাজাধিরাজসমীপে শত শত অপরাধী শঙ্কাকুলিতপ্রাণে আত্মসমর্পণ করিয়া পতিত রহিল। প্রাঙ্গণে অসংখ্য নরনারী লুণ্ঠিত হইয়া জিহ্বাগ্রে রজ (ধূলি) স্পর্শ করিতে লাগিল। সে কি দৃশ্য,তাহা ত বুঝাইতে পারিব না।

নিখিলব্রহ্মাণ্ডপতির এই গৌরবময়প্রকাশের নিকট পার্থিব রাজামহারাজার প্রশংসাকাহংসব কত তুচ্ছ, কত সামান্য। ধন্য ভক্তি! ভক্তি?—এমন ভক্তি কে কবে দেখিয়াছে? আর কোথাও দেখিয়াছ কি? আমরা গদ্‌গদ্‌চিত্তে দেবদর্শন করিয়া গোপীনাথ জিউর মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

পুরাতনমন্দির দর্শন করিয়া, দেবদর্শন করিতে গেলাম। ভেটের স্থান হইতে অট্টালিকামধ্যস্থ একটী সঙ্কপথ অতিক্রম করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়।

ততক্ষণ আরতি শেষ হইয়া গিয়াছিল; আমরা দেবদর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। সারাদিনের পরিশ্রমে সুনিদ্রায় শর্ব্বরী প্রভাত হইল।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই পাণ্ডাঠাকুরের ছোট ভাই ছন্নুলাল আসিয়া উপস্থিত—পঞ্চক্রোশীভ্রমণে যাইতে হইবে। পঞ্চক্রোশী-ভ্রমণ অর্থে—বৃন্দাবনের পঞ্চক্রোশপরিধি প্রদক্ষিণ করা। হাত মুখ ধুইয়া নগ্নপদে বাহির হইলাম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৃন্দাবন উপদ্বীপাকার—যমুনা উত্তর-দিগে বক্রগামিনী হইয়া পূর্ব্বেপশ্চিমে প্রবাহিতা হইতেছেন। এই বক্রগতিতে যে কোণের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই স্থান হইতে নদীতট বহিয়া বরাবর পূর্ব্বাভিমুখে যাইয়া, আমাদিগকে ঘুরিয়া পশ্চিমদিকের যমুনাতটে উপস্থিত হইতে হইল। নদী—চঞ্চলা, কুলুনাদিনী ও প্রহ্লাদিনী। সৌরকরপ্রদীপ্ত দেবমন্দির-নিঃসৃত সোপানময় ঘাটগুলি প্রফুল্লভাব ধারণ করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বতীরে কেশীঘাট, ধীরসমীরঘাট ও রাজঘাট দর্শন করিলাম। কেশীঘাটে ভগবান্‌, কেশীদৈত্যের প্রাণবিনাশ করিয়াছিলেন

বলিয়া কথিত হয়। ধীরসমীরঘাটে একটী প্রাচীন বটবৃক্ষ প্রদর্শন করিয়া ছন্নুলাল কহিল, "এই বৃক্ষে বসিয়া কানাই বলাই সমীর সেবন করিতেন।" রাজঘাটের নিকটে এখন আর নদীর চিহ্নমাত্র নাই। পাণ্ডারা এই স্থানের সহিত একটী বাঙ্গালা শ্লোকের সম্বন্ধ তৈয়ার করিয়া লইয়াছে, তাহা এইরূপ।

শ্রীকৃষ্ণ, গোপিনীগণকে নদী পার করিয়া দিতেছেন, আর প্রিয়সখী রাধাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন ;—

আর সখিকে পার করিতে
ল'ব আনা আনা ;
ঐ সখিকে পার করিতে
ল'ব কাণের সোণা।

বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র এইরূপ বাঙ্গালা ছড়া প্রচলিত আছে। পৌরাণিক তত্ত্বের সঙ্গে ইহাদের যে কিছুমাত্র সংস্রব নাই, তাহা বুদ্ধিমান্ পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। বঙ্গদেশাগত, বৈষ্ণবকবিগণের কল্পনাপ্রসূত অনেক কথাই এখন স্থানীয় লোকের নিকট ঐতিহাসিক তত্ত্বরূপে পরিগণিত হইতেছে।

এইখান হইতে আমরা পূর্ব্বতট পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখী হইলাম। পথেই অটলবন, এবং বনের ভিতরেই অটলঘাট। এই বনে কৃষ্ণ, রাখালবালকগণের সহিত গোচারণ করিতেন। প্রান্তরের মধ্যে ছোট ছোট ঝোপগুলি বেশ মনোমুগ্ধকর, দেখিলে কল্পনার দ্বার প্রসারিত হইয়া যায়। ইহারই সন্নিকটে দাবানলকুণ্ড ও কামরিবন। দাবানলকুণ্ডের চারিদিক পাথরে বাঁধান। যমুনার ঘাটে ঘাটে যেমন যাত্রিকগণকে মন্ত্রপাঠ করিতে হয়,

এখানেও তদ্রূপ। কামারবনে সাধুদিগের একটী প্রকাণ্ড আড্ডা আছে। কেবলমাত্র যাত্রিগণের দানের উপরই তাহাদের উপজীবিকা নির্ভর করিয়া থাকে। ইহারই কিছু দূরে জয়পুরের মহারাজার প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। আমরা প্রবেশ করিয়া কিছু কিছু দেখিয়া আসিলাম। যে অপর্য্যাপ্ত অর্থরাশি ব্যয়িত হইতেছে, তাহাতে এই মন্দির যে কালে বৃন্দাবনের একটী প্রধান দেবালয়ে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মহারাজ আপন রাজ্যের যত বহুমূল্য প্রস্তর এই মহৎকার্য্যসম্পাদনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। তদুপরি স্বর্ণরৌপ্যের আমদানীও যথেষ্ট হইয়াছে।

এই সব দেখিতে দেখিতে আমরা পশ্চিমতীরে উপনীত হইলাম। দূর হইতেই মদনমোহনের পুরাতন মন্দির দৃষ্ট হইল। নদীকূলে অত্যুচ্চ মৃত্তিকাস্তূপের উপর এই মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। এখন ইহা ভগ্ন। গোবিন্দজী ও গোপীনাথজীর ন্যায় মদনমোহনও নূতন বাটীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। মদনমোহনের বাটীর সম্মুখেই শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সমাধিমন্দির ও তদীয় শিষ্য সনাতনের আশ্রম। স্তূপনিম্নে কিছুদূরেই 'কালিয়াদহ' ঘাট ও গোপালঘাট। এদিকের ঘাটগুলি সকলই পাষাণমণ্ডিত; কিন্তু নিকটে নদী নাই। যমুনা অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। মধ্যে কেবল বিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রান্তর। কালিয়দহে শ্রীকৃষ্ণ কালিয়দমন করিয়াছিলেন; সেই স্মৃতি রক্ষার জন্য, ঘাটের উপরে একটী ছোট মন্দিরে সহস্রবদন সর্পরাজের উপর শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। নিকটেই একটী পুরাতন বৃক্ষ। পাণ্ডারা বলিয়া থাকে, এই

গাছ হইতেই ভগবান্ যমুনাগর্ভে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন। গোপালঘাটে নন্দ ও যশোদার বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। কৃষ্ণ, কালিয়দমনার্থ জলমগ্ন হইলে, যশোদা "হা কৃষ্ণ, হা গোপাল" রবে এইস্থানে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সেইজন্য ইহার নাম—গোপালঘাট।

এখান হইতে আমরা অসংখ্য সিঁড়ি বাহিয়া মদনমোহনের বাটীতে গেলাম। তথা হইতে নৃসিংহঘাট প্রভৃতি আরও দু'এক স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় কেশীঘাটের নিকটেই বস্ত্রহরণঘাটে —পাঠক জানেন, ইহা প্রকৃত বস্ত্রহরণঘাট নহে—আসিয়া পৌছিলাম। এখানে যমুনার জলে আমাদিগকে পাণ্ডার চরণ-পূজা করিয়া, পঞ্চক্রোশী সমাপন করিতে হইল।

বেলা ১১৷৷ টার সময় বাসায় ফিরিলাম। পথেই বিহারী-সাহার প্রসিদ্ধ দেবমন্দির: আমরা ঘুরিয়া ফিরিয়া কতক্ষণ দেখিয়া লইলাম। এমন সুন্দর ও নয়নস্নিগ্ধকর আধুনিক মন্দির বৃন্দাবনে আর নাই। এমন ভক্তও বুঝি আর নাই। মন্দিরের বারাণ্ডায় দরজার সম্মুখে, হরিভক্তগণের পদরজ প্রত্যাশায় তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে। এই পুণ্যময় দেহছবির উপর পদক্ষেপ করিতে আমার প্রবৃত্তি ও সাহসে কুলাইয়া উঠিল না। এক একবার মনে হইতে লাগিল, যদি এই মহাপুরুষের একবার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিতাম, তবে বরং তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়াই ধন্য মানিতাম।

মন্দিরটী আগাগোড়া শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত। এই সকল সুদৃশ্য প্রস্তরখণ্ডে যে মনোরম কারুকার্য্য প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার অতুলনীয় হরিভক্তির মতই দুর্লভ। বারাণ্ডার

প্রস্তরস্তম্ভগুলি দেখিলে, কেমন এক অভিনব ভাবের সঞ্চার হয়। স্বচ্ছ নির্ম্মলপ্রস্তরের সাজসজ্জাহীন এই বাঁকা বাঁকা থামগুলি, মানবের সৌন্দর্য্যপিপাসার তৃপ্তিসাধন করে। অট্টালিকার সম্মুখে সুসজ্জিত ক্ষুদ্র বাগান। সিংহাদি নানারূপ প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তি ইহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে এইরূপ নানা প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন কোন স্বর্গীয় চিত্র, কোন অপার্থিবভাস্করের অপূর্ব্বরচনাকৌশলে প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে।

বাসায় ফিরিয়া দেখি, গোবিন্দজীর প্রসাদ আসিয়াছে—অন্ন, ডাল, শাক, তরকারী, টক্ ও পরমান্ন। আমরা ভক্তিভাবে উদরপূর্ণ করিয়া আহার করিলাম। তারপর এই দীর্ঘভ্রমণের পরিশ্রমভার লঘু করিবার জন্য শয্যা গ্রহণ করিতে হইল।

বৈকালে আবার মদনমোহন সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কথিত আছে, গোবিন্দজীর মুখমণ্ডল, গোপীনাথজীর বক্ষঃস্থল, এবং মদনমোহনের পদযুগলের সহিত, ভগবানের ঐ ঐ প্রত্যঙ্গের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আমাদের কেবল হাঁ করিয়া দেখাই সার হইল। ব্রজবাসিদের সহস্র সহস্র গল্পের ভিতর কোন্‌টা সত্য এবং কোন্‌টা কল্পনাগঠিত, তাহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বিদ্যা ছিল না। কাজেই চুপ করিয়া দেখাই সুবোধের কার্য্য মনে করিলাম। তবে একটা কথা আমার বেশ জানা ছিল যে, প্রকৃত গোবিন্দজী এখন বৃন্দাবনে নাই। বর্ত্তমান বিগ্রহ তাঁহার নকল প্রতিমূর্ত্তি মাত্র। হিন্দুদ্বেষী আওরঙ্গজেব দেব-মন্দির লুণ্ঠন করিতে আসিলে, মিবারাধিপতি রাণা তাহাকে আপন রাজ্যে লইয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু পথে একস্থানে

রথচক্র মৃত্তিকাবদ্ধ হইলে পর, কিছুতেই তাঁহাকে আর স্থানান্তরিত করা গেল না। এই স্থানের নাম নাথুদ্বার। সেই অবধি গোবিন্দজী নাথুদ্বারেই অবস্থান করিতেছেন। আওরঙ্গজেবের প্রত্যাবর্ত্তনের পর, বৃন্দাবনে তাঁহার নকলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র। সুতরাং ভগবানের বদনমণ্ডলদর্শনসৌভাগ্য আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই, বলিতে হইবে। এই যবনভূপতির রোষানলে ব্রজধামের অনেক দেবতাকেই এইরূপ পলায়নতৎপর হইতে হইয়াছিল। তবে কেহ কেহ পরে আসিয়া স্বস্থান গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এখান হইতে আমরা নিকুঞ্জবনাভিমুখে ধাবিত হইলাম। নিকুঞ্জবনের নাম শ্রবণ করিলে অনেকেরই মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয়। ভাগবদ্বর্ণিত চিরকবিত্বময় নিকুঞ্জকানন কবির অনন্তসম্পত্তি! দূরদূরান্তর হইতে ভক্তগণ কল্পনানেত্রে এই বিহারকানন দর্শন করিয়া,আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়েন। কিন্তু হায়! মানবের হস্তে ইহার অশেষ অমঙ্গল সাধিত হইয়াছে। কুঞ্জদলশোভিত এই রম্য কানন নিধুবনের ন্যায়ই প্রাচীরবেষ্টিত ও পাণ্ডাগণের ব্যবসাক্ষেত্র।

এখানে অসংখ্য বানর বসতি করিয়া থাকে। তাহাদিগকে কোনওরূপ আহার্য্যদ্রব্যাদি না দিয়া, একপদও অগ্রসর হইবার যো নাই। হরিবাবু, পাণ্ডার উপদেশানুযায়ী এক পয়সার চানা (ছোলা ভাজা) ক্রয় করিয়া আগে আগে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দুর্ভাগ্য, তাই তিনি কাপড়ে করিয়া লইয়াছিলেন। খুলিতে খুলিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল,আর অমনি শত শত বানর একবারে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহার উপর পড়িয়া কাপড়চোপড়

ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। এই আকস্মিক দুর্ভাগ্যে আমরা এক বারে ভয়াড়ষ্ট হইয়া পড়িলাম। যাহা হউক, খাদ্যদ্রব্য পাইয়া তাহারা একে একে সরিয়া গেল; আমরা পথ পাইলাম। এই অদ্ভুত বীরত্ব প্রত্যক্ষ করিলে তাহারা যে একদিন লঙ্কাবিজয় করিয়াছিল, সে বিষয়ে অনেকেরই প্রতীতি জন্মিবে। এতদ্ব্যতীত তাহাদের আরও অনেক অদ্ভুতকীর্ত্তি এতদ্দেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনেক সময় কোনও অট্টালিকার ছাদ হইতে রাস্তা পার হইয়া অপর ছাদে গমন করিতে হইলে, তাহারা গমনশীল পথিকের মস্তকে লাফাইয়া পড়িয়া, পুনর্ব্বার দ্বিতীয় লাফে অপর পার্শ্বে গমন করে। আমরা স্বচক্ষে এরূপ একটী দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

নিকুঞ্জবনে প্রবেশ করিয়াই, সম্মুখে একটী শ্যামতমালবৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। পাঠক হয়ত, পুস্তকে শ্যামতমালের নাম কতই শ্রবণ করিয়াছেন—স্বচক্ষে কখন দর্শন করেন নাই। আমাদের দেশীয় তমালবৃক্ষের সঙ্গে ইহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। গাছগুলিও তত বৃহৎ নহে। তবে পত্রগুচ্ছের একটা শ্যামলশোভা আছে বটে। কিছু স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে, কিছু ইতিহাসের গুণে এই শোভা বড়ই মধুর লাগিয়াছিল। পাণ্ডা কহিল, এই বৃক্ষ বহু পুরাতন। শ্রীকৃষ্ণ নবনীত ভক্ষণ করিয়া ইহার অঙ্গে হস্তমর্দ্দন করিয়াছিলেন; সেই অবধি ইহার প্রতি গাঁইটে গাঁইটে এক একটী করিয়া শালগ্রাম শিলার সৃষ্টি হইয়াছে। বাস্তবিক, শাখা-প্রশাখার সন্ধিস্থলে চক্‌চকে কাল মসৃণ শিলাকার পদার্থ বর্ত্তমান রহিয়াছে, দেখিতে পাইলাম। হস্তার্পণ করিয়া দেখিলাম, উহারা বৃক্ষসংবদ্ধ কৃত্রিম প্রস্তরখণ্ড নহে। বৃক্ষের অংশবিশেষই ঐ রূপ

প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃক্ষটীও প্রাচীন বলিয়াই মনে হইল। ভোলা-নাথ চন্দ্র এই গাছটী দর্শন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"To all appearances the tree induces a belief of great antiquity." এখান হইতে আমরা ললিতাকুণ্ড দর্শন করিতে গেলাম। ললিতা-কুণ্ড ও বিশাখাকুণ্ড একই আকারবিশিষ্ট। তাহাদের ইতিহাসও প্রায় তুল্য। নিধুবনে বিশাখার বংশী লইয়া শ্রীকৃষ্ণ তৃষিতা-প্রণয়িনীর জন্য মৃত্তিকাখননপূর্ব্বক সলিল উত্তোলন করিয়াছিলেন, আর নিকুঞ্জবনে বংশী যোগাইয়াছেন—সখি ললিতা। এ বিষয়ে আর বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই।

কাননের পশ্চাদ্ভাগে একেকোণে শ্রীকৃষ্ণের বিহারকুঞ্জ, একটী ছোট অনতিপরিসর ইষ্টকালয়রূপে বিরাজ করিতেছে। এখানে ভগবান্ আজও গোপিনীগণের সহিত রজনীবিহার করিয়া থাকেন। অট্টালিকাভিতরে একটী ছোট পালঙ্কে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নানাবিধ সুগন্ধিকুসুমে অপূর্ব্ব শয্যা রচিত হইয়া থাকে। রাত্রি ৯টার পর আর কেহ এ কাননে প্রবেশ করিতে পায় না। নিশাশেষে যখন পাণ্ডাগণ উপস্থিত হন, তখন না কি এই রচিত কুসুমাবলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হয়। একথা অবিশ্বাস করিলে, পাণ্ডাগণ যাত্রিদিগকে সন্ধ্যাকালে গৃহে তালাবদ্ধ করিয়া যাইতে অনুরোধ করে। যে কেহ পাঁচটাকা ব্যয় করিয়া এই রহস্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। প্রাতঃকালে তিনি স্বহস্তে কুলুপ খুলিয়া গৃহ পরীক্ষা করিয়া লইবেন। আমরা নানাকারণে এ কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারি নাই। শুনিলাম, ২।৩ জন কৌতূহলাক্রান্তব্যক্তি এই রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য নিশাকালে কাননমধ্যে লুক্কায়িত ছিল। পরদিন তাহাদিগকে

আর জীবিত দেখা গেল না। সেই অবধি কেহই আর এই দেবকাননে রজনীযাপন করিতে সাহসী হন না।

এখান হইতে আমরা বঙ্কবিহারী ও রাধিকাবল্লভ দর্শন করিয়া, নিত্যানন্দের পীঠ দর্শন করিলাম। বৃন্দাবনবাসিগণ এই স্থানকে বড়ই সম্মানের চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে।

বৃন্দাবনের সোয়ামণি শালগ্রামের কথা হয়ত অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এতবড় শালগ্রাম আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ওজনে সোয়া মণ বলিয়াই ইঁহার নাম সোয়ামোণি শাল-গ্রাম হইয়াছে।

আজ আমার বৃন্দাবনে শেষদিন। কাল প্রত্যুষেই এই পবিত্রধাম পরিত্যাগ করিব; তাই পাণ্ডার বাসায় বিদায় লইতে গেলাম। আমাদের পাণ্ডামহাশয় বৃন্দাবনের ভিতর বেশ বিখ্যাত লোক। অনেক রাজা, মহারাজা, জমিদার তাঁহার শিষ্য। ঝাড়লণ্ঠনসুশোভিত তাঁহার সুসজ্জিত বৈঠকখানাঘরে বহুলোকের আগমন হইয়াছে। আমরা যাইতেই অতি সমাদর-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। কতক্ষণ সুমধুর বাক্যালাপের পর আমাকে যথারীতি বিদায় দিলেন। আমার নামধাম তাঁহার বিশাল খাতায় স্থান পাইল। ইনি অন্যান্য পাণ্ডাদের মত অর্থগৃধ্নু নহেন। আচারব্যবহারে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া, ৭॥ টার গাড়ীতে মথুরা-ভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

বর্ত্তমান বৃন্দাবনের সহিত ভাগবৎকথিত প্রাচীন বৃন্দাবনের কিরূপ সাদৃশ্য আছে, এবং এতৎসম্বন্ধে পাণ্ডাদিগের গল্পগুলি

কিরূপ বিশ্বাসযোগ্য, তাহা হয়ত অনেক পাঠকই জানিবার জন্য বিশেষ কৌতূহলী হইয়াছেন। কিন্তু এতাদৃশ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সে সব বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা অসম্ভব। এবিষয়ে কেবলমাত্র দু'একটী কথা আমার বক্তব্য আছে। তাহা এই;—

ভাগবতবর্ণিত বৃন্দাবনের সঙ্গে বর্ত্তমান বৃন্দাবনের অনেক সাদৃশ্যই লোপ পাইয়াছে—একথা স্বীকার্য্য। বহুকাল ব্রজধাম প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিল; চৈতন্যদেব ও রূপসনাতনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অমানুষিক ধারণাশক্তিতেই ইদানীং ব্রজের অনেক তত্ত্ব পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এজন্য পাণ্ডাদিগের সকল কথাই যে দৃঢ় সত্য, এমত বলা যাইতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ পাণ্ডাগণ স্বভাবতঃই অশিক্ষিত ও গল্পপ্রিয়। যাত্রিগণের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিবার জন্য অনেক অযথাবর্ণনার বিশেষ পক্ষপাত করিয়া থাকে। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর, প্রতি দর্শনীয়স্থানের সম্বন্ধেই অনেক অতিরঞ্জিতগল্পের অবতারণা করা হইয়াছে। বস্ত্রহরণঘাট তাহার প্রমাণস্থল। বাঙ্গালী বৈষ্ণবকবিগণের কল্পনাপ্রসূত অনেক কথাই যে বহুগল্পের মূলভিত্তি, তাহা নিশ্চিত। এজন্যই অনেকস্থলে পাণ্ডাদিগকে বাঙ্গালা ছড়ার আবৃত্তি করিতে দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, চৈতন্যদেবাবিষ্কৃত সকল কথাই ধ্রুব সত্য কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ থাকিতে পারে। তিনি নিজেও এবিষয়ে একদিন সন্দিহান হইয়াছিলেন। তবে এই চৌরাশীক্রোশ পরিমিত স্থানই যে ব্রজধাম, এবং বর্ত্তমান বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, মথুরা, গোকুল ও মহাবনাদিস্থানগুলি যে তাহাদের প্রাচীন সীমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। রূপসনাতন ও চৈতন্যদেব এ সম্বন্ধে অভ্রান্ত; এবং

তাঁহাদের পক্ষে প্রমাণাদিও যথেষ্ট আছে। যাহাহউক, এই পবিত্রপুরীর চিহ্নমাত্রও যে অবিকৃত হইয়াছে, ইহার ধূলিকণা-মাত্র স্পর্শ করিয়াও যে আমরা ধন্য মনে করিতে পারিতেছি, ইহাই আমাদের মহৎ সৌভাগ্য—ইহাই বাঙ্গালীগৌরবের একমাত্র স্তম্ভ। বাঙ্গালীর নিকট ভারতের এই চিরঋণের কথা এতদ্দেশ-বাসিগণ বিস্মৃত হয় নাই। এজন্যই বৃন্দাবনের সর্ব্বত্র আজ বাঙ্গালীর অধিকার, অসীম—অনন্ত। মন্দিরে মন্দিরে আজ বাঙ্গালী সেবক—বাঙ্গালী পূজক। এজন্যই গোবিন্দজীর মন্দিরের প্রধান সেবকের কার্য্য 'কামদারী' কখনও বাঙ্গালী ব্যতীত অপর কাহকেও অর্পিত হয় না।

এস্থলে আর একটী কথা বলা কর্ত্তব্য। যদিও বৈষ্ণবকবি-গণের কল্পনামাহাত্ম্যে বর্ত্তমান বৈষ্ণবধর্ম্ম অনেকটা কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি এ বিষয়ে ভোলানাথ চন্দ্র তাঁহার "Travels of a Hindoo" নামক ইংরেজীগ্রন্থে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। কেন নাই, সে বিষয়ে পূজনীয় বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে' বিশেষরূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ভোলানাথ চন্দ্র একস্থলে বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ, আমি তোমাকে কূটরাজনীতিজ্ঞ মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান করি, কিন্তু দেবতা বলিয়া বন্দনা করিতে পারিতেছি না।" আবার স্থানান্তরে কহিতেছেন,—কৃষ্ণলীলা, খৃষ্টলীলার কাল্পনিক অনুকরণ-মাত্র বলিয়াই বোধ হয়; কারণ, খৃষ্টের ও কৃষ্ণের নামের মাঝে ও কার্য্যাদির ভিতর বিশেষ একটা সাদৃশ্য আছে। এজন্য ইহাদের একটীর ইতিহাস আর একটীর উপর স্থাপিত, এমতই সম্ভব।*

* The presumption is strong that one of the two religions

ভোলানাথ চন্দ্র হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইলেও, তাঁহার এই অসংবদ্ধ কথাগুলি হিন্দুদ্বেষিতারই পরিচয় দিতেছে। বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণের সহিত আমাদের যতই মতভেদ থাকুক, মহাভারত যে খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় নামের সাদৃশ্যে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, খৃষ্টকেই কৃষ্ণের নকল ছবি বলিলে. অধিকতর সঙ্গত হয়। বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণের যে সকল কার্য্যাবলির ভিতর তিনি খৃষ্টীয় সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহাদেরও কতক কতক মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। মহাভারতে অনেক কথা প্রক্ষিপ্ত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ একটী প্রধান চরিত্র; অনেক সমালোচক তাঁহাকে এই গ্রন্থের নায়ক (Hero) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—সুতরাং মহাভারতোক্ত কৃষ্ণচরিত্র কেবলমাত্র কল্পনাসম্ভূত হইতে পারে না। বিশেষ কৃষ্ণকে কূটরাজনীতিজ্ঞ বলিয়া. ভোলানাথ চন্দ্র নিজেই যখন তাঁহার ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিয়াছেন, তখন এ কথা আর কোথায় দাঁড়াইতে পারে!

দ্বিতীয় কথা এই যে, ভাগবৎ যখনই লিখিত হইয়া থাকুক, ইহাকে আমরা কিছুতেই বাইবেলের অনুকরণ বলিতে পারি না।

has been founded upon the other—that the Vishnuvites in all probability have borrowed their story from the primitive Christian Emigrants to India * * * preserving however this grand line of demarcation that while the religion of Christ appeals to the nobler faculties of man, the religion of Krishna appeals to those the more easily take in people.

যখন ভারতবাসিগণ ম্লেচ্ছধর্ম্মমাত্রকেই ঘৃণা করিত, যখন বিমল-জ্যোতিঃ আদর্শপুরুষ বুদ্ধদেবকেও ব্রাহ্মণগণ আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না, যখন পার্শ্ববর্ত্তী পরাক্রান্ত মুসলমানগণ ভারতে ধর্ম্মস্থাপনার্থ বহুচেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তখন কোন এক দূরদেশ-সম্ভূত নবধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণগণ তাহার অনুকরণার্থ হঠাৎ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিবেন, ইহা কিরূপে সম্ভবে? আর কিরূপেই বা ভাগবতকার এই নবধর্ম্মের আমূলবৃত্তান্ত অবগত হইবেন? তখনও এদেশে খৃষ্টীয় প্রচারকগণের আবির্ভাব হয় নাই, তখনও হিব্রু বাইবেল বহুভাষায় সঙ্কলিত হয় নাই—কে তাহাকে এ সুসমাচার বিস্তারিত জ্ঞাপন করিল? তিনি কি করিয়াই ম্লেচ্ছভাষা সম্যক বুঝিতে পারিলেন?

আর যদি এমত সম্ভব হয় যে, ভাগবৎ অতি আধুনিক, তবে চৈতন্যদেবের কালে অবশ্যই কেহ কেহ এ কথা লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন। এত বড় একজন গ্রন্থকারের ইতিহাস পাঁচ সাত শতাব্দীর ভিতর বিস্মৃতির অতল-গর্ভে একবারে লোপ পাইয়া যাইবে, ইহা বড়ই অসম্ভব।

হিন্দুগণ ধর্ম্মের জন্য কখন কাহারও নিকট ঋণী নহেন। হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ মৌলিকতা আছে সেরূপ আর কোথায় পাইবেন? বিশেষতঃ হিন্দুগণ ধর্ম্মান্তরমাত্রকেই অসত্য বলিয়া গণ্য করিতেন। এমতাবস্থায় তাহাদের দ্বারা এই প্রতারণামূলক ঘৃণিত অনুকরণ সম্ভবপর নহে। কবিদের কল্পনাস্পর্শে কৃষ্ণ-চরিত্র যতই দুষ্ট হউক, ভাগবতকারকে আমরা এজন্য দোষী করিতে পারি না।

ভোলানাথ চন্দ্র বলিতেছেন:—"While the religion of Christ appeals to the nobler faculties of man, the religion of Krishna appeals to those the more easily take in people."

যিনি গীতা পাঠ করিয়াছেন, তিনি এই অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তে কিরূপে উপনীত হইতে পারেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে!

গোকুল।

বেলা ৮টার সময় মথুরা ষ্টেসনে নামিয়াই একাযোগে গোকুল রওয়ানা হওয়া গেল। মথুরা হইতে গোকুল পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী। যমুনাকূলে উপস্থিত হইতেই, অপর তীরে গোকুলের প্রাসাদমালা দৃষ্ট হইল। নদীকূলে এই হর্ম্ম্যরাজি একটী সুদৃঢ় দুর্গবৎ শোভা পাইতেছিল।

যমুনার উপর তরণীমালা সংযোজিত করিয়া সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা পার হইতে যাইতেছি, এমন সময় একজন পাণ্ডা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া, আমার পিছনদিকে একা চাপিয়া বসিল। তীর্থস্থানে ভিক্ষার জ্বালায় ও পাণ্ডাদের অন্যায় দাবীতে পূর্ব্বেই যথেষ্ট জ্বালাতন হইয়া গিয়াছিলাম। এখন ঘাড়ের উপর এক নূতন প্রভুর পতনোপক্রম অনুভব করিয়া, একটু চোকমুখ লাল করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলাম, "আমার পাণ্ডার দরকার নাই—তুমি অন্যত্র যাও।" কিন্তু কাহার সাধ্য তাহাকে স্থানান্তরিত করে? সে আমার কথা আমলেই আনিল না। পরন্তু দেনাপাওনার একটা বন্দোবস্ত করিতে বলিল।

বুঝিয়া দেখিলাম, আমি সহায়হীন—একজন স্থানীয় লোকের সাহায্য চাই বটে, চোকমুখ রাঙ্গানীটা একটা পলিসি (Policy) মাত্র। তখন আমিও, যাহাতে দু'পয়সা কম করিয়া লইতে পারি, তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু আমাদের সন্ধিপত্রের পাকা বন্দোবস্ত হইতে না হইতেই, গাড়ী গোকুল পৌঁছিল। আমরা আর এ বিষয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য না করিয়া গ্রামে ঢুকিলাম।

গোকুলের দালানগুলি প্রায়ই আধুনিক। পুরাতন প্রাসাদ-নিচয়ের যাহা কিছু চিহ্ন ও ভগ্নস্তূপ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা চারি পাঁচশত বৎসরের অধিক প্রাচীন হইবে না। গাড়ী হইতে নামিয়াই সম্মুখে একটী চতুর্দ্দিক প্রস্তরবদ্ধ জলাশয় দেখিতে পাইলাম, ইহার নাম "পোতরাকুণ্ড।" যেদিন শ্রীকৃষ্ণ মথুরাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইদিন সেই সময়েই গোকুলেও নন্দ-গৃহিণী যশোদা একটী কন্যাসন্তান প্রসব করেন। কৃষ্ণবৈরী দুর্দ্দান্ত কংসের ভয়ে বসুদেব, এই কন্যার সঙ্গেই স্বীয় নবজাত সন্তান পরিবর্ত্তিত করেন। নবপ্রসূতি যশোদা, পরদিন এই কুণ্ডেই আপন বস্ত্রাদি ধৌত করিয়াছিলেন। সেই অবধি ইহার জল হিন্দু-নরনারীর চক্ষে বিশেষ পবিত্র হইয়াছে। সন্তানলাভাশায় ও সন্তানের মঙ্গলার্থ বহু সধবা রমণী আজও এই স্থানে স্নান করিয়া থাকেন।

গোকুলের দেবমন্দিরগুলি বড়ই ছোট ছোট। সঙ্কীর্ণ পথের দু'ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষে এক একটী দেবতা লইয়া, এক একজন পাণ্ডা ব্যবসা জুড়িয়া বসিয়া আছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, প্রাণান্তেও এখানে অযথা পয়সা খরচ করিব না—

করিও নাই। কিন্তু এজন্য আমাকে বেশ দু'চার কথা শুনিতে হইয়াছিল। দেবতাদিগের মধ্যে, কোথাও নন্দ-যশোদা, কোথাও গোপিনীগণপরিবেষ্টিত বালক কৃষ্ণ, কোথাও বা দধিমন্থন-দণ্ডধারিণী যশোদার মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। একস্থানে পুতনা রাক্ষসীর বিনাশদৃশ্য দৃষ্ট হইল। আর এক মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবকালীন দোলনা নির্ম্মিত করিয়া রাখা হইয়াছে। যাত্রিকদিগকে পুণ্যের লোভ দেখাইয়া, এই দোলনায় ঝুলন দিতে বলা হয়; আর স্পর্শ করা মাত্রেই পয়সা ফেলিবার অনুজ্ঞা প্রচারিত হইয়া থাকে। আমি গোটাকত রাঙ্গা রাঙ্গা চোক ও কড়া কড়া বচন হজম করিয়া, গন্ধস্পর্শ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল-মাত্র চোখের দেখা দেখিয়াই যমুনাকূলে উপনীত হইলাম।

এতক্ষণে পাণ্ডামহাশয় নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। যমুনা অনেকটা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; বালুকাচর ভাসিয়া উঠিয়াছে। এই বালুকাচর হইতে পাড় অনেক উঁচু। তটে সারি সারি অনেকগুলি পাষাণ-গঠিত ঘাট আছে। পাণ্ডামহাশয় নীচে নামিয়াই, বালুকারাশির ভিতর হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন; তারপর আমাকে উপবেশনপূর্ব্বক অঙ্গুলিসংযোগে একটা চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিতে বলিলেন। দুঃখের বিষয়, আমি তার কথায় কিছুমাত্র সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়াই, অন্যদিকে প্রস্থান করিলাম। তখন তিনিও অগত্যা আমার পশ্চাৎগামী হইলেন। যে ঘাটে এই কাণ্ড হইতেছিল, তাহার নাম কেলীঘাট। গোপিনী-গণ এই ঘাটে শ্রীকৃষ্ণের বংশী চুরি করিয়া নানারূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন—এইরূপ কিংবদন্তি।

ইহারই কিয়দ্দূরে নন্দযশোদা ঘাট। কথিত আছে, এই ঘাটে

কৃষ্ণসহ যশোদা স্নানার্থ আগমন করিতেন। ইহারই উপরে দুর্গ-প্রাকারাকারে উন্নত বাসভবন। পাণ্ডারা নন্দভবন বলিয়া, ইহার পরিচয় দিয়া থাকেন। আমার নিকট উহা মোগল-রাজত্বের কোন সুদৃঢ় অট্টালিকার উত্তম গঠিত প্রাচীর বলিয়াই বোধ হইল।

এই সব দেখা হইলে আমি চারিগণ্ডা পয়সা ফেলিয়া দিয়া, পাণ্ডার হস্ত হইতে কোনরূপে মুক্তি পাইলাম। তাহাদের একটী গুণ এই যে, কোনরূপে একবার রফাশেষ করিতে পারিলে, পূর্ব্বগোলযোগ সকলই বিস্মৃত হইয়া যায়। তখন সন্তুষ্টচিত্তে যাত্রিগণকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত 'সফল' প্রদান করিয়া থাকে।

মহাবন।

গোকুল হইতে মহাবন একমাইল মাত্র দূরবর্ত্তী। রাস্তায় ছোট ছোট বালকগণ যাত্রীর উদ্দেশে দল বাঁধিয়া বসিয়া থাকে, আর কাহারও সাক্ষাৎ পাইলেই পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে থাকে। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এই সুকুমারমতি বালকগণ জীবনের মুকুলেই এই ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে শিক্ষা পায়। গাড়ীর পিছনে পিছনে অদ্ভুত অধ্যবসায়ের সহিত দৌড়িয়া, তাহারা যে পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহার তুলনায় তাহাদের সামান্য প্রাপ্তি কত অকিঞ্চিৎকর! অথচ এই পরিশ্রমে জগতের কিছুমাত্রই উপকার সাধিত হয় না। আমার মনে হয়, এই ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে যদি কোনও দেশহিতকর

কার্য্যে উপযুক্তবেতনে নিযুক্ত করা যায়, তবে একদিকে তাহাদের যেমন অভাব দূরীভূত ও কষ্টের লাঘব হয়, অন্যদিকে তেমনই দেশেরও অশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

যাহা হউক, এই সকল ছেলেগুলি বেশ স্ফূর্ত্তি ও সহৃদয় বটে। বাঙ্গালীর ছেলের মত কুটপ্রকৃতি ও বিদ্রূপপ্রিয় নহে। তাহারা আমাকে অতি সমাদরপূর্ব্বক মহাবন দেখাইতে লইয়া গেল। গ্রামের বাহিরে একাওয়ালা বিশ্রাম করিতে লাগিল।

মহাবনের নাম শুনিয়া প্রথমতঃ ইহাকে একটা প্রকাণ্ড কানন বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্যান্য তীর্থের ন্যায় ইহার ভাগ্যেও নির্জ্জনতা ঘটিয়া উঠে নাই। উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এও এক সহর বটে। চারিদিকে ভগ্নাট্টালিকার স্তূপরাশি। এইখানেই না কি কোনদিন নন্দভবন প্রতিষ্ঠিত ছিল—তাহার অবস্থিতির চিহ্ন আজও যাত্রিগণকে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। একটী প্রকাণ্ড মসজিদের ভগ্নাবশেষরূপে এই চিহ্ন পতিত আছে। কোনকালে যে ইহা একটী সুন্দর হিন্দু মন্দির ছিল, তাহা নিশ্চয়। সারি সারি স্তম্ভগুলির কারুকার্য্যের দিকে লক্ষ্য করিলে, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। চোরাশীটী সুদৃশ্য স্তম্ভের উপর স্থাপিত বলিয়া ইহার নাম চোরাশীথাম্বা হইয়াছে। পাণ্ডারা এই গৃহকেই নন্দভবন বলিয়া নির্দ্দেশ করে, এবং ইহার ভিতরের কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঠরীকে "যশোদার সূতিকাগার," "কৃষ্ণের ষষ্ঠীঘর" প্রভৃতি নানা নামে পরিচয় দেয়। যাত্রিদিগকে দেখাইবার জন্য একটী দোলনা ও একটী দধিমন্থনদণ্ডও একদিকে রক্ষিত হইয়াছে। আমি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

ছেলেরা তার পর আরও কয়েকটী দেবমন্দির দেখাইয়া, আমাকে যথায় একা রাখিয়া আসিয়াছিলাম, সেখানে লইয়া গেল। তাহাদের বালসুলভ ব্যবহারগুলি বড়ই মিষ্ট ও প্রীতি-প্রদ বোধ হইতেছিল।

দাউজী।

মহাবন হইতে পূর্ব চারিক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া—দাউজী। এখানে বলরামের বিশালপ্রতিমূর্তি ও বৃহৎমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবালয়ের পার্শ্বেই ক্ষীরসমুদ্রনামক জলাশয়। যাত্রিক-গণকে এইখানে দুগ্ধদান করিতে হয়; তা'র পরিমাণ যাহাই হউক—এক পয়সার হইলেও ক্ষতি নাই। মন্দিরের অন্যপার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণেরও একটী ক্ষুদ্র মন্দির স্থান পাইয়াছে।

দুইধারে বহুদূরবিস্তৃত শোভাসমন্বিত অসংখ্য প্রান্তরগুলি অতিক্রম করিয়া, আমাদের গাড়ী গ্রামের সমীপবর্ত্তী হইতেই ছোট ছোট ছেলেরা আবার আসিয়া পিছনে পিছনে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। মহাবনের বালকগণের ন্যায় ইহাদের অভিপ্রায় তত মহৎ নহে। অনেকেই এক পয়সা, আধ পয়সা, এমন কি সিকি পয়সা ভিক্ষা পাইবার জন্য এতাধিক পরিশ্রম করিতে ছিল; যাত্রিগণের সাহায্য করা তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। সে কি দৌড়! এই সামান্য উপার্জ্জনের জন্য কেহ কেহ একক্রোশ পর্য্যন্ত দৌড়াইল। আমি রঙ্গ দেখিতে লাগিলাম; সঙ্গে সঙ্গে ভারতের এই দুর্দ্দশাময় চিত্র দেখিয়া চক্ষে জল আসিতেছিল। কে তাহাদিগকে এ পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবে? কে তাহাদিগকে

কর্ত্তব্য-পথ প্রদর্শন করিয়া জ্ঞানের, সুখের ও সভ্যতার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবে? এই দুর্লভ, আয়াসসাধ্য পরিশ্রমরাশি কতই না মূল্যবান্! কিন্তু অপাত্রচালিত হইয়া তাহারা দেশের কোন্ উপকার সাধিত করিতেছে? যাত্রিগণের কোষলুণ্ঠন করিয়া বৈদেশিকগণের ও সমাজের কি অনিষ্টই না উৎপাদন করিতেছে? ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে করিলাম, দিব না—এক পয়সাও ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে এই অসৎপথে চালিত হইতে উৎসাহিত করিব না। কিন্তু তাহাও কি পারা যায়? এই কোমলাঙ্গ শিশুগণের প্রাণপণ দৌড়, আর সঙ্গে সঙ্গে সকরুণ 'বাবুজী, লালাজী—ও বাবুজী, ও লালাজী' সম্বোধন দেখিলে ও শ্রবণ করিলে হৃদয় দ্রব হয়; তখন Reformaton এর Spirit কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, কে বলিবে? তখন কি আর এত ভাবিবার অবসর থাকে? একটী ১১।১২ বৎসরের শিশুকে প্রায় তিন মাইল পথ এই রূপে দৌড়াইয়া, আমাকে বিলক্ষণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইয়াছিল।

দেবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঝুমুল উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। দোলযাত্রা প্রায় সমাগত। এই সময় ব্রজধামে সর্ব্বত্র আমোদলহরী প্রবাহিত হইতে থাকে। দেখিলাম, শত শত লোক, বৃহৎ নাটমন্দিরে, আবীরমণ্ডিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছে। কেহ কেহ বা আনন্দস্রোত সংযত করিতে না পারিয়া, উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতেছে। তাহাদের ফাগমণ্ডিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও বেশভূষা, অপূর্ব্ব শোভাবিস্তার করিয়াছে।

আমি যাইতেই পাণ্ডাদের মধ্যে সহসা একটা উৎকট আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। তখন তাহারা সঙ্গীতাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক,

মৃগানুসরণকারী মৃগরাজবৎ আমার দিকে ধাবিত হইল। কোথায় বাঙ্গালা দেশ, আর কোথায় দাউজী? এমন শিকারের বোধ হয়, তাহারা অনেক দিন সাক্ষাৎ পায় নাই। তাহাদের রকম সকম দেখিয়া, বাস্তবিকই আমার ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল।

যাহাহউক, আমি কাহাকেও আমল না দিয়া, নিজে নিজেই দেব-দর্শনে চলিলাম। তখন তাহারা যে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল, তাহা চিত্রে হইলে দেখাইতে পারিতাম। দুঃখের বিষয়, আমি ইউরোপীয় পরিব্রাজক নহি—ফটোগ্রাফের ক্যামারা ট্যামারার ধার ধারি না। সুতরাং পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিলাম না।

মন্দিরের মধ্যে বলরামের বৃহৎ কৃষ্ণমূর্ত্তি একাকীই দণ্ডায়মান আছেন। ঘরের আর এক কোণে, রেবতীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি। বহু স্ত্রীপুরুষ দেবদর্শনে আসিয়াছে। আমি এক পয়সার মিছুরি ভোগ দিয়া, বাহিরে আসিয়া ক্ষীরসমুদ্র ও শ্রীকৃষ্ণের মন্দির দর্শন করিলাম। দু'একজন পাণ্ডা তথাপি আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল ও অযাচিতভাবে এটা, ওটা, প্রদর্শন করিতে লাগিল। ব্যবহার দেখিয়া বোধ হইতেছিল,যেন আমার দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ সন্দেহ ছিল।

সন্ধ্যার প্রাকালে পুনরায় মথুরাতে উপনীত হইলাম। এখানে ভাল ভাল ধর্ম্মশালা আছে; কিন্তু একক বলিয়া তথায় আমার আশ্রয় মিলিল না। অগত্যা সরাইয়ে স্থানগ্রহণ করিলাম। এখানকার সরাইটীও ইটাওয়ার মতই খোলার ছাদ ও মেটে প্রাচীরবিশিষ্ট। সুতরাং এ বিষয় বিস্তারিতবর্ণনার কিছু আবশ্যক নাই।

বৃন্দাবনের ও গোকুলের পথে ইতিমধ্যে আমাকে দুইবার মথুরাতে অবতরণ করিতে হইয়াছে; কিন্তু এই ধবলসৌধরাজি-সমন্বিত মনোহর সহরদর্শনসৌভাগ্য এখনও আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই—পাঠকমহাশয়ও এ সম্বন্ধে কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন নাই।

মথুরা অতি প্রাচীন স্থান। বাল্মীকি ও মনু স্ব স্ব গ্রন্থে ইহাকে 'শূরসেন' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বসময়ে এইখানেই লবণরাক্ষস বাস করিতেছিল, এবং পরে তদীয় অনুজ শত্রুঘ্নকর্তৃক নিহত হয়। Ptolemy, Arrian এবং Pliny প্রভৃতি গ্রীকগণ এবং ফা হিয়ান ও হিউএন্থ্‌সঙ্গ প্রভৃতি চীন পরিব্রাজকেরা এই স্থানের কথা বিশেষরূপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফা হিয়ান ও হিউএন্থ্‌-সঙ্গের সময় মথুরাতে বৌদ্ধধর্ম্মের চরমোন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তখন বহুসংখ্যক বৌদ্ধভিক্ষু ও বৌদ্ধমঠ এই নগরে দৃষ্ট হইত। হিউএন্থ্‌সঙ্গের সময় একজন বৌদ্ধরাজা, এই স্থানের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেছিলেন। সেই কালের কিছু কিছু চিহ্ন অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে; কিন্তু ইহার অব্যবহিত পর হইতেই, বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হয়; এবং দশমশতাব্দীর শেষভাগেই হিন্দুপ্রাধান্য এই নগরে পুনঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে ইহার ন্যায় সমৃদ্ধিশালিনী নগরী কুত্রাপি দৃষ্ট হইত না—অতুলনীয় শোভা ও সম্পদে বৈজয়ন্তধামও বুঝি ইহার নিকট পরাজয় মানিত! সুলতানমামুদের পত্রাংশ হইতে আমরা এ বিষয়ের

অনেক কথা অবগত হইতে পারি। শত শত দেবমন্দিরে অভ্রভেদী সুবর্ণচূড়া, শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকাশ্রেণীর অপরূপ কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য, এবং বহুমূল্য মণিমুক্তাদি গঠিত অসংখ্য দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, এই কঠোরহৃদয়, বিশ্ববিজয়ী ভূপতিও একদিন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। এই বিপুল ঐশ্বর্য্যরাশির প্রবল আকর্ষণেই অর্থলিপ্সু বৈদেশিক নরপতিগণ বার বার ইহাকে লুণ্ঠন করিতে কিঞ্চিৎমাত্রও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। সুলতানমামুদ, সেকেন্দরলোদী, আরঙ্গজেব ও আমেদ সা দুরাণী—ইহাদের প্রত্যেকেই এই অতুলবৈভবরাশি হস্তগত করিবার জন্ত এবং ধর্ম্মদ্বেষিতা চরিতার্থাভিলাষে, সহস্র সহস্র নরহত্যাও অতি তুচ্ছ এবং সামান্ত কার্য্য মনে করিয়াছেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হইয়াই ইহার পূর্ব্ব-সম্পদ একেকালে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি মথুরা চিরমনোরম—চিরমাধুর্য্যময়! মানবের হস্তখচিত কৃত্রিমসৌন্দর্য্যরাশি অদৃশ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার স্বাভাবিক শান্তিময় ভাব এখনও নষ্ট হইতে পায় নাই। এইটুকুই আমাদিগের একমাত্র সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে।

সরাইয়ে আসবাব পত্রগুলি রক্ষা করিয়া, বৃদ্ধা গৃহস্বামিনীকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের উপদেশপ্রদানান্তর সহর দেখিতে বাহির হইলাম।

ক্রমাগত ভ্রমণে আজ আমাকে স্নানাহার পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। সেই যে দাউজীতে একটুকরা মিশ্রির প্রসাদ গলাধঃকরণ করিয়াছি, তারপর আর জলগ্রহণও ঘটিয়া উঠে নাই। উদর বিশেষ অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে দেখিয়া, নিকট-

বর্ত্তী কোন ময়রার দোকানে প্রবেশ করিলাম। বরাত ভালই বলিতে হইবে—বেশ টাট্‌কা টাট্‌কা আটার লুচি পাওয়া গেল; বিশেষ মালাই ও দুগ্ধের অভাব ছিল না। সারাদিনের উপবাসের পর পরিতোষসহকারে ষোলআনারূপ উদরপূর্ত্তি করিলাম।

জঠরানল নির্ব্বাপিত হইলে, তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে, নগরের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এখন কি করি? করিবার যে কাজ ছিল না, তাহা নহে। বরং সময়েরই অভাব ছিল। বসিয়া বসিয়া এই দুর্লভ সময়ের এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করার বাসনা মোটেই আমার ছিল না। কিন্তু এদিকে দিবা প্রায় অবসান—স্থানও সম্পূর্ণ অপরিচিত। সন্ধ্যার কাল ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল; অসংখ্য প্রদীপমালা ইতস্ততঃ ফুটিয়া হাসিতেছিল। চারিদিকে বহুলোকের বিচরণ; উপরে প্রশান্ত নীলাকাশ ও উন্নতফটকপথে নগরের সুদৃশ্য অট্টালিকা শ্রেণী এবং অভ্রভেদীমন্দিরচূড়াচ্ছবি দেখিয়া দেখিয়া আমি কেমন বিহ্বল হইয়া গেলাম। একা একা কোথায় যাইব, ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না।

চিরসমৃদ্ধিশালিনী মথুরানগরী হিন্দুর চক্ষে কি পবিত্রস্থান! সুদূর বঙ্গদেশে অবস্থানকালে কল্পনাসাহায্যে কতবার ইহাকে দর্শন করিয়াছি; কল্পনার কল্পনায়, ইহার অস্তিত্ব আমার নিকট একবারে যেন কল্পনাময় হইয়া উঠিয়াছিল। আজ সত্য সত্যই এই চিরাকাঙ্ক্ষিত রাজ্যের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া নয়নদ্বয়কে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমার চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃশ্যাবলী সেই কবিত্ব-ময়ী নগরীর সঙ্গে একসুরে কেমন মিলিয়া গেল! আমি মুগ্ধ হইয়া কেবলই দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রদোষের শীতলসমীরণ আমার

ললাটদেশ স্পর্শ করিয়া, ঘর্ম্মবারি অপনোদন করিতেছিল। বোধ হইল যেন, এরূপ আরাম বহুদিন উপভোগ করি নাই।

যাহা হউক, সৌভাগ্যবশতঃ এই সময় একজন পাণ্ডা আসিয়া দর্শন দিলেন। বিদেশীয় পরিব্রাজক ও তীর্থযাত্রিদের মনের কথা পাণ্ডারা যেমন বুঝিতে পারে, তেমন আর কেহই নহে। পাণ্ডাঠাকুর আসিয়াই, আমি বাঙ্গালী কি না, কেন এখানে আসিয়াছি, কোথায় অবস্থান করিতেছি, ইতিপূর্ব্বে আর কোন পাণ্ডামহোদয় আমার ঘাড়ে চাপিতে পারিয়াছে কি না, না পারিলে এখনই তিনি সে স্থান অধিকার করিতে সম্পূর্ণ রাজি আছেন—একশ্বাসে এমত অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া ফেলিলেন। অধিক বাক্যব্যয় বাহুল্য; বিশেষ আমিও এইক্ষণ তাহাদের দর্শনানুগ্রহই সর্ব্বান্তঃকরণে স্পৃহা করিতে ছিলাম—কাজেই কালবিলম্ব না করিয়া একটা বোঝাপড়া করিয়া লইলাম ও তাঁহার পশ্চাৎগামী হইলাম।

এখন আমি বড়ই গোলে পড়িয়াছি। এই শ্বেতসৌধ-কিরীটিনী আনন্দকোলাহলমগ্না নগরীর কথা কিরূপে বর্ণনা করিব? কোলাহলময় অথচ শান্তিময়, ধূলিরঞ্জিত অথচ নয়নাভিরাম, ভাস্করকিরণদীপ্তধবলপ্রস্তরশোভিত, অথচ নিদাঘে মলয়ানিল তুল্য প্রীতিপদ—এমন আর দেখিয়াছ কি? সুদৃশ্য—সমৃদ্ধিসম্পন্ন—আনন্দময়! এমন ব্রাহ্মস্পর্শ আর কোথায়? যমুনাবক্ষ হইতে একবার ইহার অতুলসুষমারাশি দর্শন কর, নিশ্চয়ই মোহিত হইবে।

নদীতটশোভা বারাণসীরও আছে, মথুরারও আছে; কিন্তু এমন শান্তিময় ও আরামপ্রদ ভাব বুঝি আর কোথাও নাই।

মথুরার ঘাটগুলি বারাণসীর মত উচ্চ, সুদৃঢ় এবং প্রশস্ত নহে, কিন্তু সৌন্দর্য্য ও শোভাতে ইহাদের তুলনা নাই। অনতিউচ্চ-পাড় হইতে মন্দিরগুলির প্রতিবিম্ব স্থিরযমুনাবক্ষে কেমন চিত্রিত হইয়াছে! এ বিষয়ে Cunningham সাহেব যাহা বলেন, তাহা কতক কতক সত্য বটে ;—"In Mathura the Ghats are light and graceful ; in Benares they are severe and simple."

মথুরাতে অনেকগুলি সুদৃশ্য ঘাট আছে। তন্মধ্যে, বিশ্রাম-ঘাট ও ধ্রুবঘাটই যাত্রিকদের নিকট বিশেষ পবিত্রস্থান ; এই দুই ঘাটে স্নানতর্পণই এই তীর্থের প্রধান কার্য্য।

বিশ্রামঘাটের সান্ধ্যশোভা এ জীবনে বিস্মৃত হইব না। বিস্তীর্ণ সোপানাবলির ভিতর চত্বরের পর চত্বর—তাহাদের পার্শ্বেই কতকগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই চত্বর ও সোপানাবলির উপর পাণ্ডারা পূজাতর্পণোপচারাদি এবং ভুবনমোহিনী চম্পকবরণা রূপসীগণ রাশি রাশি ফুল লইয়া বসিয়া আছে ; দেবমন্দিরগুলি হইতে অসংখ্য ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইতেছে—তৎসহ মধুরহাসিনী মথুরাবাসিনী কামিনীগণের কল-কণ্ঠস্বর মিশ্রিত হইয়া যমুনার তরঙ্গে তরঙ্গে কোথায় বাহিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, কে জানে? সম্মুখে স্থিরা—ধীরা—অতুল-শোভাসমন্বিতা যমুনা! সকলে মিলিয়া কি এক প্রশান্তভাবের সৃষ্টি করিতেছে! চঞ্চলতার সহিত মধুরতার, উচ্ছ্বাসের সহিত গাম্ভীর্য্যের সম্মিলন, এরূপ বুঝি আর দেখি নাই। এ দৃশ্য বড়ই মহান্, এ শোভা বড়ই দুর্লভ। দেখিয়া শুনিয়া ভুলা যায় কি?

বিশ্রামঘাট প্রকৃতই বিশ্রামঘাট বটে। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ কংসাসুরকে বধ করিয়া এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন; এই জন্যই ইহার নাম বিশ্রামঘাট হইয়াছে। যে আরামের উপকরণ-গুলি একদিন ভগবানের স্বেদসিক্ত বদনমণ্ডল শান্ত ও শীতল করিয়াছিল, বোধ হইল যেন তাহারা আজও অলক্ষ্যে থাকিয়া এই ঘাটে শান্তিবারি সিঞ্চন করিতেছে। যেন, সেই বিশ্রামের আরামপূর্ণ ভাবটী আজও মনুষ্যের শত বাধা উপেক্ষা করিয়া এইখানে লুক্কায়িত রহিয়াছে। পাঠক, তুমি যদি সংসারের কুটিলপ্রবাহে সুখশান্তি বর্জ্জিত হইয়া থাক, যদি কোন নিষ্ঠুর আঘাতে তোমার কোমল হৃদয় চূর্ণীকৃত হইয়া থাকে, যদি জীব-নের চির-সঙ্গিনী একমাত্র প্রেমময়ীভার্য্যাবিয়োগে তোমার জীবন চিরদুঃখময় হইয়া থাকে; আর অধিক কি বলিব, যদি তুমি পুত্রশোকাতুর হও, তবে একবার এইখানে ছুটিয়া আইস—আসিয়া এই শান্তিময় নিকেতনে উপবেশন কর; একবার এই প্রস্তরসোপানাবলীর এক পার্শ্বে উপবেশনকরতঃ, সম্মুখে নেত্রপাত কর; একবার মৃদুমারুত-সঞ্চালিত ক্ষুদ্রবীচিমালিনী যমুনাবক্ষে রূপসী ব্রজবাসিনীগণের দোলায়মান প্রদীপমালার ভাসান দর্শন কর; সন্ধ্যারতির সেই মধুরগর্জ্জন, বহুলোকের সেই আনন্দসঞ্চালিত উন্মত্ত পদবিক্ষেপ, তদুপরি ভক্তগণের ঘন ঘন বিজয়ধ্বনি, দেখ, শ্রবণ কর। আবার তোমার বাঁচিতে সাধ হইবে, আবার তোমার উত্যক্ত জীবন শান্তিলাভ করিবে—তোমার প্রাণের ভিতর এক নূতন কপাট উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। উপরে, তারকাখচিত অনন্ত নীলনভোমণ্ডল, নীচে প্রদীপশিখা-মণ্ডিত কালশোভাময়ী কালিন্দী, তীরে এই সহস্রকণ্ঠবিস্ফুরিত

আনন্দধ্বনি—সকল দেখিয়া শুনিয়া, তুমি জগতের ক্ষুদ্র কীট—তখন কি দুঃখে অভিভূত থাকিবে বল দেখি ?*

বিশ্রামঘাটের নিকটেই যমুনাকূলে সতীবুর্জ্জনামক স্মরণ-মন্দির। কাহার স্মরণমন্দির, সে বিষয়ে একটী জনশ্রুতি আছে। প্রবাদ এই যে, মহারাজ কংস নিহত হইলে, তদীয় মহিষী এই-স্থানে বসিয়া, প্রিয়পতির নিধনসংবাদ প্রাপ্ত হন, এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন। সেই হইতেই ইহার নাম সতীবুর্জ্জ হইয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের কথা অন্যরূপ। তন্মতে এই মন্দির, অম্বরাধিপতি ভগবানদাসকর্ত্তৃক নির্ম্মিত। যদি পূর্ব্বোক্ত জনরব সত্যমূলক হইয়া থাকে, তবে ইহা অসম্ভব নয় যে, হয়ত রাজা ভগবানদাস কংসমহিষীর দেহত্যাগস্থলেই পরে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন।

ধ্রুবঘাট, বিশ্রামঘাটের মত তত জনকোলাহলময় ও সাজ-সজ্জায় ভূষিত নহে ঘাটের উপর একটী উন্নত মৃত্তিকাস্তূপ; স্তূপের উপরে বহুতলসমন্বিত অট্টালিকা, তার সর্ব্বোচ্চতলে সর্ব্বোচ্চপ্রকোষ্ঠে সর্ব্বোচ্চস্থলের অধিকারী ধ্রুবের ছোট প্রতি-মূর্ত্তিখানি স্থাপিত আছে। এই অদ্ভুত মন্দির দূর হইতে ক্ষুদ্রায়তন কেল্লা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মথুরার রাজপথগুলি বড়ই জনাকীর্ণ। ধবলশোভান্বিত অত্যুচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী পথের দুইধারে গগন ভেদ করিয়া দাঁড়া-ইয়া আছে। সারি সারি পণ্যবীথিকাগুলি শোভাসম্পদে অতুলনীয়; দেখিলে আনন্দে প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠে। রাস্তা-গুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ও বেনারসের মত কতকটা উচ্চনীচ। সম-স্তটা সহরই যেন সর্ব্বদা বিজয়োৎসবে সজ্জিত হইয়া আছে।

এখানে কংসালয়ের ভগ্নাবশেষ এখনও যাত্রিকগণকে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বহুদূরবিস্তৃত স্তূপগুলি পূর্ব্বসম্পদের পরিচয় দেয় বটে; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই এখন বৌদ্ধধর্ম্মের স্মৃতি-চিহ্নবাহক। বৌদ্ধগণ যে এককালে এই সকল স্থানে বহু-সংখ্যক মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। তবে এমত হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণদিগের দেবালয়াদি ভগ্ন করিয়াই পরে বৌদ্ধমঠের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

কট্‌রা বা ইদগা নামক বহুদূরবিস্তৃত উন্নতভূমির উপর উপগুপ্তের ভগ্ন মঠ, স্তূপের উপর স্তূপাকারে পতিত আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ প্রাচীর এবং একাংশে অওরঙ্গজেব-নির্ম্মিত লোহিতপ্রস্তরের সুন্দর মসজিদ। কিন্তু ইহাকে সুন্দর বলিয়া প্রশংসা করিতে হিন্দুমাত্রেরই প্রবৃত্তি হইবে না; কারণ, হিন্দু দেবালয় ভগ্ন করিয়া যে ইসলামীয় মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বিশ্বমোহন হইলেও হিন্দুর চক্ষে সুন্দর নহে। এই মসজিদ এখন অব্যবহার্য্য—অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় পতিত আছে।

এই উন্নত ভূমিখণ্ডকেই পাণ্ডারা শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। নিকটেই স্তূপনিম্নে—পোতরাকুণ্ড। নবপ্রসূতি দেবকী এই জলাশয়ে আপনার বস্ত্রাদি প্রক্ষালন করিয়াছিলেন। এইজন্য যাত্রিকদিগের নিকট ইহার জল অতি পবিত্র। স্তূপ-শিখর হইতে এই কুণ্ডের জল ষাট ফুট নিম্নে অবস্থিত; ইহা হই-তেই এই ভূমিখণ্ডের উচ্চতার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। জলা-শয়ের তিনদিকেই সারি সারি প্রস্তরসোপান; কেবল একটী পাড় ঢালু ও ইষ্টকনির্ম্মিত। কংসের এই বন্দীশালায়, যে অংশে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও যথায় সিংহাসনারোহণপূর্ব্বক

রাজত্বভার গ্রহণ করেন, পাণ্ডাঠাকুর আমাকে ক্রমে ক্রমে সে সব স্থানে লইয়া গেল। হায়, যেখানে এক দিন জননী যশোদাও কৃষ্ণদর্শনার্থ প্রবেশ করিতে পান নাই, সেই স্থানের আজ কি দুর্দ্দশাই হইয়াছে! একটিমাত্র সামান্য মন্দিরে আজ কেশবজী নেহাৎ দীন দুঃখীর মত প্রস্তররূপ ধারণ করিয়া, বিরাজ করিতেছেন! কালের কুঠারাঘাতে কাহারও রক্ষা নাই। ভগবান্, তোমার অদ্ভুতকীর্ত্তিকলাপও এই সর্ব্বসংহারকের দণ্ডস্পর্শে একে একে অন্তর্হিত হইয়াছে!

এখান হইতে কংসের বসতবাটী আরও কিছু দূর। সেই স্থানেও এমনই বহুতর স্তূপরাশি দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটী শিবমন্দির ছাড়া সেখানে আর কিছুই দর্শনযোগ্য বর্ত্তমান নাই। এই শিবের নাম কংসপ্রভু শিব। কথিত আছে, শাক্ত কংস এই শিবলিঙ্গকে সর্ব্বদা যথাবিধি পূজা করিতেন। বৃহৎ কাল লিঙ্গ; —তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে শ্বেতপ্রস্তরের ষাঁড় ও গণেশ প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। দেখিলাম, মন্দিরের এক পার্শ্বে কাহার গোশালা রহিয়াছে ও এই বিস্তৃতভূমিখণ্ডের চারিদিকে নূতন অট্টালিকানির্ম্মাণের উদ্যোগ হইতেছে। সুতরাং ভবিষ্যতে যে দর্শকগণ আর এই ভগ্নস্তূপরাশিও দর্শন করিয়া নয়নপ্রাণ তৃপ্ত করিবেন, সে আশা নাই। হয়ত কোন অপূর্ব্ব ধীসম্পন্ন ব্যক্তি এই নূতনালয় সৃষ্টি করিয়া, তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর সহিত নৈকট্যসম্বন্ধে আবদ্ধপূর্ব্বক আয়ের একটা নূতন পথ মুক্ত করিতে ত্রুটী করিবেন না।

ষ্টেসনের (R. M. Ry) নিকট আর একটী মৃত্তিকাস্তূপের উপর কংসের নিধনস্থান। এইখানেই কৃষ্ণ, কংসকে বিনষ্ট

করিয়াছিলেন। সেইজন্ত ইহার নাম 'রণভূমি' হইয়াছে। আমরা উপরে উঠিয়া স্থানটী দর্শন করিলাম। অন্ত চিহ্ন কিছুই নাই—কেবল একটী ক্ষুদ্রগৃহে কংসনিধনদৃশ্য মৃত্তিকায় গঠিত আছে।

বিশ্রামঘাটের অনতিদূরে, শেঠের দেবালয়—দ্বারকানাথের মন্দির। এই সুদৃশ্যমন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরটী দেখিতে বড়ই সুন্দর। মথুরাবাসিগণ প্রত্যহ এইস্থানে দেবদর্শন করিতে আসিয়া থাকে। বৃন্দাবনের ঠাকুরবাড়ীগুলির ন্যায় এখানেও প্রত্যহ বহুআড়ম্বরে আরতি সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যার পর পুষ্পাদি-হস্তে ভুবনমোহিনী মথুরাবাসিনীদিগের সমাগমে মন্দিরের উজ্জ্বল আলোকও বুঝি ম্লান হইয়া যায়। তখন চারিদিকে আনন্দের এক উৎকট তরঙ্গ খেলিতে থাকে। আমরা মন্দিরমধ্যে দ্বারকানাথ, মথুরানাথ, ব্রজনাথ ও যমুনামাইর, এবং বারান্দায় নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। মন্দিরের বাহিরেই শেঠের বহুদূরবিস্তৃত মনোরম অট্টালিকা। সহরের এক প্রান্তে যমুনাকূলে তাঁহাদের আর একটী প্রমোদকানন আছে; তাহার নাম—যমুনাবাগ। যমুনা-বাগের নয়নতৃপ্তিকর দৃশ্য এবং সুসজ্জিত আরামনিকেতন দেখি-বার জিনিষ বটে।

রাত্রি দশটার সময় সরাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তখন পাণ্ডা মহাশয় নানারূপ মিষ্টবাক্যে আমাকে তুষ্ট করিয়া বিদায় লইলেন; এবং যাইবার সময় পরদিন, তাঁহার আলয়ে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। আমি হাতমুখ প্রক্ষালন করিয়া বিছানা রচনা করিলাম ও জমাদারের জন্ত অপেক্ষা করিতে

লাগিলাম। সরাইয়ে রাত্রিবাস করিলেই চৌকীদারের নিকট নামধাম ব্যক্ত করিতে হয়। এই সকল কথা লিপিবদ্ধ হইয়া স্থানীয় থানায় প্রেরিত হইয়া থাকে। কোনরূপ দুষ্ট লোক সরাইয়ে আশ্রয় লইয়া যাত্রিগণের সর্ব্বনাশসাধন না করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যেই এই বিধি প্রচারিত হইয়াছে। কিয়ৎকাল পরেই জমাদার প্রভু আগমন করিলেন ও নামধাম লিখিয়া লইয়া গেলেন। আমিও শয্যা গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রত্যুষেই পাণ্ডা মহাশয় আসিয়া দরজা ধাক্কাধাক্কি আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমি চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া দোর খুলিয়া দিলাম। অতঃপর বিশ্রামঘাটে স্নানপূর্ব্বক তাহার মেটেপ্রাচীরবেষ্টিত মেটেকোঠাময় বাড়ীতে আহারার্থ গমন করিতে হইল। পাণ্ডাপত্নী, পাকা গৃহিণী—একহাতে দশ কাজ করিতেছেন। আমি যাইতেই আপনার গৃহ-সংসারের সমস্ত কাহিনীটী একে একে আমার নিকট ব্যক্ত করিলেন। পঁচিশবৎসরের একমাত্র সন্তান, গৃহে পুত্রবধূ ও পঞ্চমবৎসরের একটী কন্যা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এই কথা উত্থাপন করিয়া একটু কাঁদিলেন; নিজে যে এখনও জীবিত আছেন, সে সম্বন্ধেও কিছু আক্ষেপ করিলেন। তারপর পাতায় চারিটী ভাত, একটুকু তরকারী, (পশ্চিমে তরকারীকে শাক কহে) পাতার ডোঙ্গায় কিছু ডাল ও একটী ক্ষুদ্র বাটিতে খানিকটা দুগ্ধ আনিয়া আমার সম্মুখে হাজির করিলেন। দেশ হইতে বহুদূরে আত্মীয়স্বজন-বিহীনদেশে এই হৃদয়সম্পন্ন পরিবারের আদর ও যত্নের ভিতর এই সামান্য জিনিষগুলিও আমার নিকট অমৃততুল্য উপাদেয় বোধ হইতেছিল।

আহারের পর সরাইয়ে আসিয়া, পাণ্ডামহাশয়ের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক ঢোলপুর যাত্রা করিলাম। R. M. Ry এর দু'টী ষ্টেসন ব্যতীত মথুরাতে অল্পদিন হইল G. I. P. Ry এর আর একটী বৃহৎ ষ্টেসন স্থাপিত হইয়াছে। দিল্লী হইতে মথুরা ও আগ্রা হইয়া এই লাইন ঢোলপুর পথে বোম্বাই চলিয়া গিয়াছে। আমি একারোহণে তথায় প্রস্থান করিলাম। ষ্টেসনটী সহরের বাহিরে প্রান্তরমধ্যে অবস্থিত। কিছুদূর যাইতেই পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম—শ্যামল বৃক্ষরাজির উপরে প্রস্ফুটিতপ্রসূনদলবৎ মথুরার চারুছবি নীলনভোঅঙ্কে চিত্রিত হইয়াছে।

রাজপুতনা।

উত্তরপশ্চিম-ভ্রমণ।

রাজপুতনা।

আজ আমি রাজপুতনায়—বীরত্বের চিরবাস, চিরকবিত্বময়, চিরগৌরবময়, আর্য্যগরিমাপ্রদীপ্ত রাজপুতনায়! কিন্তু রাজপুতগণের সে ঐশ্বর্য্যসম্পদ্ এখন কোথায়? চারিদিকে কেবল ভুখার দল, অনশনক্লিষ্ট বদনমণ্ডল, এবং ধূ ধূ দরিদ্রতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেথানে অহরহঃ বীরত্ব ও মহিমার উচ্ছ্বাস বহিত, সেথানে আজ কেবল দরিদ্রতা, অন্নকষ্ট ও নির্জ্জীবতার বিষাদময় ভাব ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সে স্বাধীনতা ও স্বদেশহিতৈষিতার জীবন্তছবি রাজপুতনায় আর নাই। কেবল অতীতের স্মৃতিমাত্রই ইহার মুখোজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে—প্রতি প্রস্তরখণ্ড কালের গর্ভে লীন হইয়া গেলেও এই স্মৃতি এমনি তেজোময় থাকিবে, এই মুখ এমনি উজ্জ্বল রহিবে।

ঢোলপুর।

২৯শে মাঘ অপরাহ্নে ঢোলপুর পৌঁছিলাম। ঢোলপুর ছোট সহর। তেমন দেখিবার জিনিস এখানে কিছুই নাই। ক্রমাগত ভ্রমণে শরীর মন, উভয়ই বিশেষ অবসাদগ্রস্ত হইয়া আসিতেছিল; মনে করিলাম, এইস্থানে স্বদেশবাসীর সহবাসে কতদিন বিশ্রামোপভোগ করিয়া লই।

ঢোলপুরে আমার নিজের পরিচিত কেহ ছিল না। কোনও বন্ধুর এক পিতৃব্য এইখানে সরকারীডাক্তাররূপে অবস্থান করিতেছিলেন; বন্ধুবর হইতে তাঁহারই নিকট একখানা পরিচয়-পত্র লইয়া আসিয়াছিলাম।

ডাক্তারবাবুর নাম মনোমোহন রায়। ক্ষুদ্র সহর, অথচ তিনি বেশ পরিচিত লোক—বাসা চিনিয়া লইতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না। কিন্তু উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে আর একটি বাঙ্গালী যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমাকে দেখিয়াই তিনি ছুটিয়া আসিলেন, এবং কোথা হইতে আসিতেছি, কি নাম, ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি সকল কথা ব্যক্ত করিলে পর, তিনি হাস্য করিয়া কহিলেন, 'সেজন্য আপনাকে চিন্তিত হইতে হইবে না, আমি কর্ত্রীঠাকুরাণীকে সংবাদ দিতেছি।' এই বলিয়া তিনি আমার চিঠিখানা ভৃত্যহস্তে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। এই যুবকের নাম, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী; ইনি মনোমোহন বাবুর অধীনেই হাঁসপাতালে কেরাণীরূপে নিযুক্ত আছেন।

কিছুক্ষণ পরেই ২।৩টী ভৃত্য দৌড়িয়া আসিয়া, আমার আসবাবপত্র ঘরে লইয়া গেল, এবং বাহিরের বৈঠকখানাঘরে খট্টার উপর বিছানা বিস্তৃত করিল। ডাক্তারবাবুর বাড়ীটী ছোট হইলেও বেশ সাজান ও পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। ঘরগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত; অট্টালিকার সম্মুখে ক্ষুদ্র বাগান। মোটের উপর বেশ পছন্দসই বটে। আমি যাইয়া উপবেশন করিতেই ডাক্তারবাবুর তিনবৎসরবয়স্ক ছেলে লক্ষ্মীনারায়ণ, ছুটিয়া আসিয়া আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইল। লক্ষ্মীনারায়ণ বড় ভালমানুষ; এমন শান্তশিষ্ট ও মধুরভাষী বালক আমি অল্পই দেখিয়াছি। সে আমাকে পরমাত্মীয় বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল। আমিও অতঃপর আমার বিশ্রামের দিনগুলি তাহারই বালসুলভ গল্প শ্রবণ করিতে করিতে কর্ত্তন করিতাম। সেই প্রকৃত লক্ষ্মীছেলে লক্ষ্মীনারায়ণকে আজও ভুলিতে পারি নাই।

২৯ শে মাঘ হইতে ৪ঠা ফাল্গুন পর্য্যন্ত আমাকে ঢোলপুরে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে একদিনমাত্র গোয়ালিয়রদর্শনে গমন করিয়াছিলাম—সে কথা পর পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। রায়গৃহিণীর সুবন্দোবস্তে আমাকে কিছুমাত্র অসুবিধাই ভোগ করিতে হয় নাই। নিজের আবাসভবনে যেমন না সুখে দিন কাটে, ততোধিক যত্নে আমার দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এদেশের লোকেরা বড় গরীব; ডাক্তারবাবুর চাকরগুলি আমাকে পাইয়া, বক্‌সিসের লোভে নানারূপ আদরযত্ন করিতে লাগিল। তাহাদের অত্যধিক আদরে আমি প্রায় জ্বালাতন হইয়া গিয়াছিলাম। স্নান, আহার, ভ্রমণ, উপবেশন, কোন সময়েই নিষ্কৃতি নাই। স্নানের সময় তৈল-

মর্দ্দন, আহারের সময় "এটা চাই ওটা চাই" বলিয়া সহস্র আদর, এবং ভ্রমণের সময় নেহাত সামান্য জিনিসটীকেও দশবার প্রদর্শন করা, তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ঢোলপুরে গোহদের রাণাবংশীয় ভূপতিগণ পাঁচপুরুষ রাজত্ব করিতেছেন। কোন কালে ইঁহাদের প্রবলপ্রতাপ ছিল, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা তাদৃশ উন্নত নহে। বার্ষিক রাজস্ব ১২ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না। তবে বিচার এবং শাসনভার সম্পূর্ণই রাজার উপর প্রদত্ত হইয়াছে।

সহরটী ক্ষুদ্র এবং তত সমৃদ্ধিসম্পন্ন নহে। রাজবাটীতে তেমন কিছু দেখিবার নাই। পুরাতন রাজবাটী নরসিংবাগে একটি বৃহৎ কূপ আছে—ইহা দর্শনযোগ্য বটে। কূপের চারিধার পাষাণমণ্ডিত, এবং জলের একটু উপরেই দেয়ালসংলগ্ন সারি সারি গ্যালারী। একদিকের প্রশস্তসোপানপথে এই সকল গ্যালারীতে অবতরণ করা যায়। কূপের সলিলরাশির সহিত একটি বৃহৎ চৌবাচ্চা সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং মৃত্তিকা উপরে বৃত্তাকারমুখের চারিদিকে দ্বিতল অট্টালিকা ঘেরিয়া আছে।

পশ্চিমের অন্যান্য স্থানের মত এখানেও মেয়োলোকেরা জুতা পরে, কাছা দেয়। এখানকার অধিবাসিগণ মস্তকে এক একটা প্রকাণ্ড উষ্ণীষ ধারণ করে;—সেরূপ পাগড়ী সচরাচর দৃষ্ট হয় না। দুইজনের ভিতর পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, 'রাম রাম' বলিয়া অভিবাদন করে। এইখান হইতেই কথিত ভাষার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইতেছে, দেখিতে পাইলাম। কথা তিনবার উচ্চারিত হইলেও আর ভালরূপ বুঝিতে পারিতাম না।

স্থানটী স্বাস্থ্যকর। জিনিসপত্র বেশ সস্তা। দুধের সের চারি পয়সা; মাংসের সের দুই আনার অধিক নহে। এতদ্ব্যতীত, তরকারি প্রভৃতিও পর্য্যাপ্ত পাওয়া যাইয়া থাকে।

আমি এই কয়দিনে সহরটী মোটামুটী রকম দেখিয়া, ৫ই ফাল্গুন আগ্রাভিমুখে প্রস্থান করিলাম; সেকথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। যাইবার সময় লক্ষ্মীনারায়ণ ছুটিয়া আসিয়া আমার কাপড়খানা ধরিয়া রাখিয়াছিল—কিছুতেই যাইতে দিবে না। আমি অনেক যত্নে, আবার তাহার সঙ্গে শীঘ্র সাক্ষাৎ করিতেছি—এরূপ মিথ্যাবাক্যে তুষ্ট করিয়া মুক্তি পাইলাম।

ঢোলপুরে অবস্থানকালেই একদিন যাইয়া গোয়ালিয়র দর্শন করিয়া আসি—এ কথা উক্ত হইয়াছে। গোয়ালিয়রভ্রমণ-কাহিনী, সেজন্যই রাজপুতনাঅধ্যায়ে স্থান পাইল। আমি এখন সেই কথাই বলিব।

গোয়ালিয়র।

গোয়ালিয়রের ষ্টেসনমাষ্টারটী বাঙ্গালী—নাম, বামাচরণ বাবু। সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তাঁহার কিছু কিছু পরিচয় ছিল; তাই যাইবার সময় তাঁহার নিকট হইতে একটা পরিচয়পত্র লইয়া গেলাম।

ঢোলপুর হইতে গোয়ালিয়র—সমস্তটা পথ উচ্চনীচ, অসমতল। কোথাও মৃত্তিকাস্তূপগুলি গগনভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে; কোথাও বা গর্ত্তগুলি পর্ব্বতগহ্বরাকার ধারণ করিয়াছে। এই উন্মুক্তমৃত্তিকাময় সহস্র সহস্র স্তূপরাশির ভিতর

দিয়া, বহুকষ্টে রেলের লাইন বসান হইয়াছে। স্থানে স্থানে প্রস্তর কাটিয়া ও গহ্বরগুলি পরিপূরিত করিয়া, তবে রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত চতুর্দ্দিকেই পাহাড়। বলিতে কি, এই শ্যামল-শোভারহিত তৃণশস্যাদিবর্জ্জিত রাজপুতনার আতপসন্তপ্তশোভা দর্শন করিয়া, কেমন যেন তৃপ্ত হইতে পারিলাম না।

ঢোলপুরের নিম্নে কৃশাঙ্গী চম্বলনদী মৃদুপ্রবাহিতা। উচ্চ গগনভেদী স্তূপসারির পদমূলে দীনাহীনা চম্বলনদী বেশ শোভা বিস্তার করিয়া আছে—যেন অনাদৃতা, লাঞ্ছিতা তন্বী, কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট স্বামীর চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক করুণকণ্ঠে আপনার শোক-কাহিনী ব্যক্ত করিতেছে। এই অদ্ভুত প্রাকৃতিকসমাবেশ, কবির কল্পনাতূলিকারঞ্জিত হইবার উপযুক্ত বটে। সুদৃঢ়, সুন্দর লৌহবর্ত্মের উপর দিয়া আমাদের দ্রুতগামী ট্রেন এই নদী অতি-ক্রম করিবার সময়, এই স্বপ্নময়শোভা দর্শন করিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম।

বেলা ১১টার সময় গাড়ী গোয়ালিয়র পৌঁছিল। উন্নত পর্ব্বতশিখরে গোয়ালিয়রের প্রাচীন দুর্ভেদ্য দুর্গ আজও সগর্ব্বে দণ্ডায়মান; নীচে বৃক্ষরাজিপরিবেষ্টিত মনোরম সহর। বহু-দূর হইতেই, এই বিশালদুর্গচূড়া একটা ভীষণদৈত্যের মত দাঁড়া-ইয়া আছে, দেখিতে পাইলাম। কালের পর কালের তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজিও ইহার ধ্বংস হয় নাই; বহুকালের স্মৃতি বহন করিয়া, যেন একটা সজীব ঐতিহাসিকচিত্র প্রায় গগন-পটে ন্যস্ত রহিয়াছে।

কথিত আছে, খৃষ্টীয় তৃতীয়শতাব্দীতে শূরজসেন নামক

কোন হিন্দুনরপতি কর্ত্তৃক এই দুর্গ স্থাপিত হয়। উইলফোর্ড সাহেবের মতে, ইহা ৭৭৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। যাহা হউক, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ইহা যে হিন্দুনরপতিগণের একটী সুদৃঢ় আশ্রয়স্থল ছিল, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। ১০২৩ অব্দে সুলতানমামুদ বহুচেষ্টা করিয়াও ইহা হস্তগত করিতে পারেন নাই। ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদঘোরী এই দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু দ্বাদশ বৎসর অন্তেই আবার তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। ১২৩১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর সামসুদ্দীন আল্‌তামাস, একবৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে গোয়ালিয়রে আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন; কিন্তু ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে নরসিংহরায় নামক অন্য একজন স্থানীয় হিন্দুরাজা, দুর্গটী তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া পুনঃ হিন্দুপ্রাধান্য বিস্তার করিল। তারপর বহুদিন যাবত ইহা হিন্দুদিগের করায়ত্ত থাকে। নরসিংহরায়ের বংশধর মহারাজা মানসিংহের সময় রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। দুর্গস্থ মানসিংহ-প্রাসাদ তাঁহারই আবাসস্থল। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে এইস্থান পাঠানসম্রাট্ ইব্রাহিমলোদী হস্তগত করেন। ইহার সাতবৎসর পরেই বাবরকর্ত্তৃক ইহা মোগলকরায়ত্ত হয়। বাবরের পর হুমায়ুন, হুমায়ুনের পর সের-সা, সেরসাহের পর আকবর, ক্রমান্বয়ে এই দুর্গ অধিকার করিলেন। তারপর মোগলরাজত্বের অন্তিমাবস্থায় গোহদের জাঠ রাণা ইহা দখল করিয়া লয়েন। সেই অবধি ইংরেজে, মারহাট্টায়, রাজপুতে এইদুর্গ যে কয়বার হস্তান্তরিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। বাস্তবিক, এতাদৃশ প্রভুবংশপরিবর্ত্তন অতি অল্পরাজ্যের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বশেষে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইহা দৌলতরাও সিন্ধিয়ার রাজ্যমধ্যে

পরিগণিত হইল। সেই অবধি মহারাষ্ট্রভূপতি সিন্ধিয়াগণ এই স্থানে রাজত্ব করিতেছেন। বর্ত্তমান নূতনগোয়ালিয়র বা লস্কর-নগরী, দৌলতরাও কর্ত্তৃকই স্থাপিত হইয়াছিল।

ভারতে সিন্ধিয়া একজন পরাক্রান্ত ভূপতি। তাঁহার রাজ্যের আয় প্রায় দুই কোটী মুদ্রা। ২৯০৪৬ বর্গ মাইল বিস্তৃত এই বৃহৎ রাজ্যে ন্যূনাধিক ১০৩৪৬টী গ্রাম ও সহর আছে। একদল সৈন্যরক্ষার নিমিত্ত সিন্ধিয়ামহারাজ, বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে প্রতিবৎসর ১৮লক্ষ টাকা করস্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন। গোয়ালিয়র রাজ্যের অধীনে আবার কতকগুলি ক্ষুদ্ররাজ্যও আছে। তাহাদের অধিপতিগণ সিন্ধিয়াকে নিয়মিতরূপ রাজস্ব প্রদান করেন; কিন্তু শাসনসম্বন্ধে তাঁহাদের উপর তাঁহার কোনরূপ হাত নাই। বর্ত্তমান সিন্ধিয়া একজন উচ্চশিক্ষিত নব্য-যুবক। তাঁহার উৎসাহ, উদ্যম ও প্রতিভার কথা শ্রবণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। ঐশ্বর্য্যসম্পদে, পরাক্রমে ও সম্মানে যদিও সিন্ধিয়ার মত ব্যক্তি ভারতে দু' চার জনের অধিক দৃষ্ট হয় না, তথাপি তিনি নিজেই নানারূপ কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন। নিজরাজ্যের যাবৎ গুরুভার তিনি স্বহস্তে বহন করেন। তাঁহার রাজ্যের তিনিই মন্ত্রী তিনিই সেনাপতি,—বলিতে গেলে তিনিই সব। তিনি সৈন্যগণের সহিত কৃত্রিম রণাভিনয় করেন; ভীষণ হিংস্র-জন্তুসমাকুল কাননে একাকী প্রবেশ করিয়া শিকার করেন, কখনও হয় ত কাননে কান্তারে নিজেই রুটীতরকারী প্রস্তুত করিয়া সৈন্যগণকে ভোজন করান, এবং আপনিও কিছু খান। যুবরাজ যখন ভারতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি ও তাঁহার পারিষদবর্গ, তাঁহার এই অমানুষিক উদ্যম দর্শন করিয়া, মোহিত

হইয়া গিয়াছিলেন। 'India under the Royal Eyes' নামক গ্রন্থে এবিষয়ের একটী সুন্দর চিত্র বাহির হইয়াছে। নবশিক্ষায় শিক্ষিত নবীন সিন্ধিয়া, আপনার রাজ্যে যে সকল লোকহিতকর-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী প্রথমশ্রেণীর কলেজ ও একটী শতমাইল ব্যাপী 'লাইট' রেলবর্ত্মের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাজ কখনও কখনও ইঞ্জিনে উঠিয়া, নিজহস্তেই এই খেলনাপ্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাড়ীগুলি চালনা করিয়া থাকেন।

ষ্টেসনে নামিয়াই দেখিলাম, একজন বাঙ্গালীবাবু প্লাটফরমের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। সাজসজ্জা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, ইনিই ষ্টেসনমাষ্টার বটে। নিকটে উপস্থিত হইয়া পত্র-প্রদান করিলে, তিনি আমাকে অতি যত্নের সহিত গ্রহণ করি-লেন। বামাচরণবাবু এককালে খুব সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার ছিল। কিন্তু দয়াদাক্ষি-ণ্যের মাহাত্ম্যে এবং আরও দু'একটী অসম্ভাবিত কারণে এক্ষণে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গিয়াছেন। যাহাহউক, তথাপি জনসমাজে তাঁহার খুব সম্মান আছে। এমন কি স্বয়ং সিন্ধিয়াও তাঁহাকে খুব অনুগ্রহের চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। এ হেন উত্তম ব্যক্তির আতিথ্যসৎকারে আমি যে পরমপরিতোষ উপ-ভোগ করিয়াছিলাম, সে কথা বলাই বাহুল্য।

কতক্ষণ পরেই বামাচরণবাবুর ছেলে আসিয়া, আমার সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। ষ্টেসনের বাহিরেই বাসা। কোম্পানীর বাসা, সুতরাং তেমন জাঁকজমক নাই; কিন্তু বামাচরণবাবুর নিজবায়ে বেশ সাজান বটে। একটী ঘরে ঢুকিয়া দেখি, তথায় আর একজন বাঙ্গালীবাবু বসিয়া আছেন। আলাপ হইলে

জানিতে পারিলাম, তিনিও অল্পদিনযাবতই এখানে আগমন করিয়াছেন, পুনঃ শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। তিনিও নবাগত; আমিও নবাগত; বেশ মিলিয়া গেল। দুইজনে পরামর্শ করিলাম, উভয়েই একসঙ্গে সহর দেখিতে বাহির হইব। জানিতে পারিলাম, তিনি বামাচরণবাবুরই দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় বটেন।

স্নানাহার করিতে করিতে ১২টা বাজিয়া গেল। আমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া, একারোহণে দুর্গাভিমুখে গমন করিলাম। এখানকার একাগুলি আবার একটু নূতন রকমের; নৌকার মত উপরে বেশ ছাদ আছে। এতদ্ব্যতীত ভিতরে বসিবার স্থানগুলিও বেশ আরামপ্রদ।

দুর্গমূলে পৌছিয়া উপরে চাহিতেই, এক মহান্ ছবি হঠাৎ যেন যাদুকরের মায়াস্পর্শে নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিল। তিন শত ফুট উচ্চ, পাষাণময়পাহাড়ের উপর উন্নতপ্রাচীরবেষ্টিত এই দুর্গ নীলাকাশে চিত্রার্পিতের স্থায় দণ্ডায়মান আছে। মূল হইতে শিখরপর্য্যন্ত সমস্তটা পাহাড় পাষাণস্তূপময়, অটল—অচল—সরল। পর্ব্বতগাত্র একটুও ঢালু নহে, বরং অনেকস্থলে প্রাচীর ও অট্টালিকাগুলি উপর হইতে ঝুলিয়া পড়িয়াছে—দেখিলেই যেন মনে একটা ভীতির সঞ্চার হইয়া উঠে। পাহাড়ের উত্তরপূর্ব্ব, উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিম মূল হইতে তিনটি সুরক্ষিত রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া দুর্গোপরি উত্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমোক্তটী দিয়া আমরা প্রবিষ্ট হইলাম। এই পথ, ছয়টি দৃঢ়, উন্নত ও দুর্ভেদ্য ফটকে সুরক্ষিত। তাহাদের নাম ক্রমে—আলমগিরি ফটক, হিন্দোলাফটক, বানেশ্বরফটক, গণেশফটক, লক্ষ্মণফটক ও হাতীয়াফটক।

আমরা বৃহৎ আলমগিরি ফটকে প্রবেশ করিয়াই এক আঙ্গিনার মধ্যে উপস্থিত হইলাম। এই ফটক সশস্ত্রপ্রহরীরক্ষিত। একপার্শ্বে একটী দপ্তরখানা; তথায় আমাদিগকে দুইআনা পয়সা দর্শনী দিয়া, নাম ধাম লিখাইয়া লইতে হইল। তারপর আর একটী দরজার ভিতর দিয়া ঢালুরাস্তার উপরে উঠিতে লাগিলাম। আমাদের একদিকে পাষাণমণ্ডিত পর্ব্বতগাত্র, অন্যদিকে উন্নত প্রাচীর। প্রাচীরশিখরে না উঠিয়া, বাহিরের কিছুই দেখিবার সাধ্য নাই। যুদ্ধকালে প্রাচীর আরোহণ পূর্ব্বক অস্ত্রচালনার জন্য, সুন্দর সিঁড়ি নির্ম্মিত আছে। এই উচ্চপথ আরোহণ করিতে করিতে আমাদের পা অবশ হইয়া আসিল। পর্ব্বতে ও প্রাচীরগাত্রে অসংখ্য খোদিতমূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। দুর্গের অন্যান্য পার্শ্বেও তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত বিরল নহে। তাহাদের এক একটা এত বড় যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। একটীর আকার পূর্ণ ৫৭ ফিট পরিমিত। অনুসন্ধানে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ১৪৪১ — ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাহারা হিন্দুনরপতিগণের তত্বাবধানে খোদিত হইয়াছিল। রাস্তার একপার্শ্বে পর্ব্বতগহ্বরের ভিতর একটী জলাশয় (বাউরি) দেখিতে পাইলাম। অতি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণপথে নীচে নামিয়া, সিঁড়ি অবলম্বনে এইস্থানে পৌঁছিতে হয়। ইহার জল তত ভাল নহে—নানারূপ জিনিসপত্রধৌতাদিকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহারই কিছু দূরে রাস্তার মোড়ের নিকট একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে বিষ্ণুর চতুর্ভুজমূর্ত্তি। গোয়ালিয়রদুর্গে এতদপেক্ষা প্রাচীন মন্দির আর নাই; এজন্য এই সামান্যমন্দিরটী দর্শকগণের নিকট বড়ই আদরের সামগ্রী। খৃষ্টীয় নবমশতাব্দীতে এই দেবালয়

নির্ম্মিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র মন্দিরে এই দেবমূর্ত্তিটী ব্যতীত দেখিবার মত আর কিছুই নাই। শেষফটক হাতীয়াদরজার নিকট পৌঁছিতেই আমরা তৎসংলগ্ন চারুনির্ম্মিত মানমন্দির বা মানসিংহপ্রাসাদ্ দেখিতে পাইলাম। এই প্রাচীন অট্টালিকা আজও দূর হইতে দর্শকের নয়নমন তৃপ্ত করে। আমরা দুর্গে প্রবেশ করিয়া, ক্রমে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম।

মানমন্দির দুই তিনটী ভিন্ন ভিন্ন মহলে বিভক্ত। প্রতি মহলেই অসংখ্য তল; ইহাদের কতকগুলি আবার মৃত্তিকানিম্নে নির্ম্মিত হইয়াছে। ছোট ছোট আঁকা বাঁকা সিঁড়িপথে এই সকল মহলে প্রবেশ করিতে হয়। পর্ব্বতগাত্র খোদিত করিয়া এই ভূগর্ভস্থপুরীতে আলো আসিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল; কিন্তু সে সকল ছিদ্র আজকাল প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। ঘরগুলি প্রায়ই অন্ধকার, বে-মেরামতে ধূলিলুণ্ঠিত ও অব্যবহার্য্য—কিন্তু ভগ্ন হয় নাই। হিন্দুআদর্শের, হিন্দুশিল্পবিদ্যার ইহা এক উত্তম মনুমেণ্ট। প্রস্তরের উপর খোদাইকাজ করিয়া যে সকল জাল (Screen), লতা, পাতা ও চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহারা অতি মনোরম। পুরীতে প্রবেশের দ্বারগুলি বড়ই ছোট ছোট; মধ্যে মধ্যে আমার মস্তকে ভয়ানক লাগিতেছিল। আমরা মস্তক অবনত করিয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম এবং মহারাজ মানসিংহের বহির্ব্বাটী, ভিতর বাটী, অন্দরমহল ও স্নানাগার ইত্যাদি স্থান দর্শন করিয়া বাহিরে আসিলাম।

দুর্গটী দীর্ঘে দেড় মাইলেরও উপর হইবে; কিন্তু তেমন চওড়া নহে। জৈন, মুসলমান, রাজপুত, মারহাট্টা, ইংরেজ, প্রত্যেকেই

মানরূপ হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মিত করিয়া ইহার উরস্কুবক্ষ সুশোভিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার কতক কতক এখনও বর্ত্তমান আছে। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বহুকাল মুসলমানগণের করায়ত্ত থাকিলেও, ইহার প্রাচীনহিন্দুমন্দিরগুলি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। আরঙ্গজেবের ন্যায় হিন্দুবৈরীর পক্ষেও এতদূর সহনভাব (Toleration) বিস্ময়জনক বটে। যিনি বারাণসী, বৃন্দাবন, মথুরা প্রভৃতি স্থানের উত্তম উত্তম দেবালয়গুলি লুণ্ঠন করিতে সক্ষম ছিলেন, লুণ্ঠন করিয়া হিন্দুমন্দিরের উপর যিনি দেবদ্বেষিতার বিজয়চিহ্নস্বরূপ মসজিদাবলি নির্ম্মাণ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই, তিনি গোয়ালিয়রে আসিয়া এতাদৃশ অত্যাচার দূরে থাক্, বরং রাজপ্রাসাদনিচয়ে ইহার শোভা অধিকতর বর্দ্ধিত করিলেন! —গোয়ালিয়রের পক্ষে ইহা বিশেষ সৌভাগ্যমূলক সন্দেহ নাই।

এই সকল প্রাচীনহিন্দুমন্দিরের মধ্যে দুইটীর কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহাদের একটীর নাম—তেলী-কা-মন্দির—খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল; এখন মাত্র ভগ্নস্তূপ-রাশিতে পতিত আছে। দ্বিতীয়টীর নাম—'শাসবহু'মন্দির, অর্থাৎ শাশুড়ী ও বধূর অট্টালিকা—অনতিবৃহৎ দুইটী মন্দিরাকারে এখনও অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। মন্দিরটী একাদশশতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এমতই অনুমিত হয়। Major Keith এর তত্ত্বাবধানে বৃটিশগবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক এই উভয় স্থানই এখন যথাসাধ্য মেরামত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহাদের অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্য দেখিলে, আজও হিন্দুগৌরবের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। 'শাসবহু'মন্দিরের উপরিভাগ মুসলমানেরা চূণাবৃত

করিয়া রাখিয়াছিল। এ বিষয়ে দ্বারে যে লিখিত প্রস্তরফলক Keith সাহেব কর্ত্তৃক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা এইরূপ ;—

This temple
Was cleaned and stripped
Of the chuna,
With which the Mehamedans
Had defaced it
For centuries.

ইহারই পার্শ্বে প্রায় চারিহাত দীর্ঘ, দেড় হাত প্রস্থ, একটী প্রস্তরে নানাকথা লিখিত আছে। অপরিচিতভাষা বিধায় পাঠ করিতে পারিলাম না।

ইহার সম্মুখে একটী আধুনিক বসিবার স্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাচীরসংলগ্ন বলিয়া, এইখান হইতে বাহিরের শোভা বড়ই মনোরম। ReynoldsBall কহিয়াছেন, গোয়ালিয়রকে 'Gibraltar of India' বলা যায়—এইখানে দাঁড়াইলে তাহা স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এই দুর্গ যে একদিন ইংরেজহস্তে পতিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ-ভাগে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই-খানে এখনও ২১১টী সেনাবাস (Barrack) বর্ত্তমান আছে। ইহাদের সম্মুখে মহারাজ সিন্ধিয়ার ২১৪টী কামান স্থাপিত রহি-য়াছে, দেখিতে পাইলাম।

দুর্গমধ্যে অনেকগুলি স্বচ্ছ ও মনোরম সরোবর আছে। সবগুলিই প্রস্তরমণ্ডিত—প্রস্তরের পাড়, প্রস্তরের তল, প্রস্তরের সিঁড়ি। ঝরণা ও বৃষ্টির জলে ইহারা সতত পূর্ণ থাকে। তাহা-

দের ভিতর মতিঝিল, সূরযকুণ্ড ও গঙ্গাসাগরই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। সূরযকুণ্ড, দুর্গনির্ম্মিতা সূরযসেনের কীর্ত্তি। ইহার ভিতরে সলিলবেষ্টিত একটী ছোট মন্দির শোভা পাইতেছে। তীরে সূরয-দেবের ক্ষুদ্র দেবালয়। তেলিকা-মন্দিরের সম্মুখেই গঙ্গাসাগর। ইহার দক্ষিণপূর্ব্বকোণে একটী জৈনমন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট দৃষ্ট হয়। চূড়া ভগ্ন হইয়া গিয়াছে—কেবল ঘরটী মাত্র বিদ্যমান আছে। গঙ্গাসাগরের উত্তরতীরে 'ছৈয়দের কবর' নামক একটী স্থানকে মুসলমানগণ বড়ই সম্মানের চক্ষে দর্শন করে। ইহারই পার্শ্বে সাহেবদের 'টেনিস' খেলিবার ঘর।

দুর্গের ভিতর মৃত্তিকাগর্ভে আর একটি মহল আছে বলিয়া শুনিতে পাইলাম। কিন্তু অব্যবহারে সে স্থান এখন সম্পূর্ণ দুর্গম—কিছুতেই প্রবেশ করা যায় না।

আমরা দুর্গবক্ষ অপেক্ষা নূতনসহর লস্করনগরী পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম। মহারাজার শ্বেতোজ্জ্বলপ্রাসাদদ্বয় এবং সুন্দর ভিক্‌টোরিয়া কলেজ দৃষ্ট হইল। সহরটী যে পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন ও মনোরম তাহাতে সন্দেহ নাই।

মানমন্দিরের উত্তরদিকে মুসলমান বাদসাহদিগের প্রাসাদ-মালা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারা অতি জীর্ণশীর্ণা-বস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে—প্রবেশ অসাধ্য। আমরা কিছু কিছু এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

এস্থলে দুইটী মুসলমান গাইডের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্ত্তব্য। তাহারা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, আমা-দিগকে সকল দর্শনীয় দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিয়াছিল, কিন্তু এক পয়সাও পারিশ্রমিক গ্রহণ করে নাই। পশ্চিমে এমন মহানু-

ভদ্রতা ও স্বার্থশূন্যতা অতি বিরল। আমরা কত খেদ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

দিনমণি অস্তগতপ্রায়। আমরা দুর্গের বাহিরে আসিয়া বাসাভিমুখে রওয়ানা হইলাম। পথে, তানসেনের ও তদীয় গুরু গায়েস-উদ্দিনের সমাধিমন্দিরদ্বয় দেখিয়া লইলাম। গায়েস-উদ্দিন, তানসেনের সঙ্গীতাচার্য্য ছিলেন। তাঁহার সমাধি-মন্দিরটী দেখিবার জিনিস বটে। বৃহৎমন্দিরের সুন্দরকারুকার্য্য প্রশংসাযোগ্য। ইহারই দক্ষিণপশ্চিমকোণে, একটী খোল-খাবা, ক্ষুদ্র অথচ সুদৃশ্য মন্দিরের নীচে, ভুবনবিখ্যাত তানসেনের দেহরত্ন সমাহিত। মৃত্তিকার সর্ব্বসংহারিণীশক্তিগর্ভে তাঁহার বিশ্ববিজয়ীকণ্ঠ লীন হইয়া গিয়াছে। সকলকেই মাটি হইতে হইবে; জীবজন্তু, স্থাবরজঙ্গম সকলই ত এ নিয়মাধীন। ললিত-ঝঙ্কার, প্রাণস্পর্শী সুর, অপ্সরানিন্দিত রাগিণী, সকলই ইহাতে বিলীন হইয়া গিয়াছে—তুমি আমি কোন্ ছার!

নিকটেই একটা তিন্তিড়ীবৃক্ষ। আমরা স্থানীয় লোকের অনুরোধক্রমে ইহার দু'একটী পাতা ও মহম্মদগায়েসের মন্দিরস্থ কিছু ধূলি, আস্বাদ করিলাম। কথিত আছে, এইরূপ করিলে সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া যায়! বাহিরে আসিয়াই আমার সঙ্গীপ্রবর গলা ঝাড়া দিয়া, একটু গুণ্ গুণ্ করিলেন;—উদ্দেশ্য, দেখেন, কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। আমি কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিলাম।

তারপর নানারূপ হাস্যপরিহাসে ও কৌতুকে পথ অতি-বাহিত করিয়া, আমরা ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। পথিমধ্যে মহারাজ সিন্ধিয়ার Guest House দেখিয়া আসা গেল। হিন্দুআদর্শ-গঠিত অট্টালিকা আধুনিক সাজসজ্জায় অপূর্ব্বসজ্জিত হইয়া,

রাজঅতিথিগণের অভ্যর্থনার্থ প্রস্তুত হইয়া আছে।

রাত্রি আটটার গাড়ী ছাড়িয়া ১২টার সময় ঢোলপুরে পৌঁছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। প্রকৃতির দুর্য্যোগ ও রাজপুতনার অন্ধকারমাখা জনমানবহীন উচ্চনীচ প্রান্তরগুলির বিভীষিকাময়ভাব একত্রিত হইয়া, আমাকে কেমন দিশাহারা করিয়া ফেলিতেছিল।

ষ্টেসনে নামিয়া, সহর কোন্ দিকে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। অন্ধকারে প্রান্তর অতিক্রম করিতে, মধ্যে মধ্যে পদস্খলন হইতেছিল। সুপ্ত প্রকৃতি; তদুপরি প্রকৃতির এই ভীষণমূর্ত্তি!—হৃদয়ের উদ্বেগে ও শারীরিক পরিশ্রমে আমাকে সে রাত্রিতে যথেষ্ট ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, অনেক ঘুরাঘুরির পর, প্রায় দেড়টার সময় বাসায় প্রত্যাগত হইয়া শয্যা লইলাম।

জয়পুর।

জয়পুর, কি সুন্দর তুমি! তোমার ওই অমরাবতীতুল্য সজ্জিতবক্ষে স্বপ্নচ্ছায়ার মত এমন একটা মোহময় আবরণ আছে, যাহা এজীবনে আর ভুলিতে পারিব না। "নিদাঘনিশীথস্বপ্ন"বৎ সে ছবি এখনও আমার মনপ্রাণ পুলকিত করিতেছে! তোমার সুদৃশ্য, সুদৃঢ়, সুপ্রশস্ত অনুপম রাজবর্ত্মগুলি জগতে দুর্লভ; তোমার সেই সহস্র সহস্র শিল্পালঙ্কৃত লোহিতরাগমণ্ডিত সৌধাবলি এ মরজগতে স্বর্গীয়প্রভা বিস্তার করিয়াছে—কুত্রাপি তাহাদের তুলনা নাই; তোমার হাট, বাজার, মাঠ, মন্দির সকলই

অদ্ভুত, সকলই অলৌকিক। তোমার এ চিরবাঞ্ছিত, চিরাকাঙ্ক্ষিত অপূর্ব্বসুষমারাশি কোথা হইতে আহরণ করিলে নগরেন্দ্র?

৯ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, দিবা দু'প্রহরান্তে জয়পুরে পদার্পণ করিলাম। ষ্টেসন হইতে সহর দুই মাইল দূরবর্ত্তী; সুতরাং নামিয়া সহরের কোনই চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। চারিদিকে কেবল বৃক্ষরাজিশূন্য উন্নতপর্ব্বতমালা দৃষ্ট হইতেছে; তাহাদের শিখরে শিখরে প্রাচীরবেষ্টিত দুর্গশ্রেণী। ষ্টেসনের সম্মুখ হইতে একটী প্রশস্ত রাস্তা বরাবির সহরপানে চলিয়া গিয়াছে।

আমি নামিয়াই ধর্ম্মশালার অনুসন্ধান লইলাম। কুলির মাথায় মোটটি চাপাইয়া বাহির হইতেই বহুসংখ্যক সরাইওয়ালা আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল এবং ভাল স্থান দিতে পারিবে এমত জিদ করিতে লাগিল। ষ্টেসনের সম্মুখেই রাস্তার দুই ধারে এই সকল সরাইগুলি অবস্থিত। নিকটে কতকগুলি দোকানপাটও আছে। আমি অগত্যা চারি আনা রোজে একটী কুঠরী ভাড়া লইয়া, তথায় জিনিসপত্র রক্ষা করিলাম। ধর্ম্মশালার কদর্য্য অবস্থা দেখিয়া, যাহা করিলাম, ভালই বোধ হইল।

গৃহস্বামী আদরযত্ন করিয়া স্নানের জল আনিয়া দিল, দোকান হইতে খাবার লইয়া আসিল; আমি স্নানাহার করিয়া সামান্যবিশ্রামান্তর সহরের উদ্দেশে বাহির হইলাম।

চারিদিকে পর্ব্বতশ্রেণী; মধ্যস্থলে সুদৃশ্য জয়পুরনগরী বৃক্ষাদির ভিতর এমনি লুকোচুরি খাইয়া রহিয়াছে যে, কোন্‌দিকে সহর আমি কিছুই নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলাম না। রাস্তাটি মধ্যে মধ্যে অন্য রাস্তার সংযোগে কর্ত্তিত হইতে লাগিল, আর তাহাদের

সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম—কোন্ দিকে অগ্রসর হই?

যাহা হউক, পরে লোকের ও শকটাদির গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া বরাবর যাইতে যাইতে হঠাৎ প্রাচীরবেষ্টিতনগরের বিশাল ফটকের সম্মুখীন হইয়া পড়িলাম। প্রাচীরের বাহির হইতে তখনও জয়পুরনগরী সম্পূর্ণ লুক্কায়িত। পশ্চাতে উন্নতশৈলশিখর;—বোধ হইতেছিল যেন তাহার পদমূলে একটী প্রাচীরবেষ্টিত ক্ষুদ্র উপবন শোভা পাইতেছে।

এই সুবৃহৎ উচ্চ ফটকের নাম, 'চাঁদপোল।' ফটক পার হইয়াই একটী ক্ষুদ্র আঙ্গিনা। অত্যুচ্চপ্রাচীরে ইহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত। তৎপরেই আর একটী ফটক। জয়পুরের প্রত্যেক দেউরীই এই একই প্রণালীতে গঠিত। 'চাদপোল' ব্যতীত এই নগরে আরও ছয়টী ফটক আছে। সকলগুলিই এইরূপ সুরক্ষিত ও সুদৃঢ়।

অম্বররাজ্যের নূতন রাজধানী জয়পুর, রাজপুতনার একটি বিশেষসমৃদ্ধিশালী জনপদ। মহারাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ এই নগরী নির্ম্মিত করিয়া যান। সমস্তভারতে এরূপ পরিপাটী ও সজ্জিতসহর দৃষ্ট হয় না। আবর্জ্জনারহিত রাস্তাগুলি উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব্বপশ্চিমে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত হইয়া যেন একটী দাবাখেলার ঘর অঙ্কিত করিয়াছে। যেখানে যেখানে বৃহৎ বৃহৎ রাজপথগুলি পরস্পর পরস্পরকে কর্ত্তন করিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই সেই স্থানেই এক একটী চকের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদেরই বা শোভা কত!—মধ্যে প্রস্তরগঠিত কৃত্রিমসরোবর; তন্মধ্যে বৃহৎ উৎস স্থাপিত হইয়াছে। চারিদিকের গ্যাসালোক-

স্তম্ভগুলি হইতে রশ্মিমালা আসিয়া সন্ধ্যার সময় এই সকল জলাধারের স্বচ্ছসলিলে মুক্তারাশির সৃষ্টি করে। ইহারই চতুর্দ্দিকে পণ্যবিক্রেতাগণ নানারূপ শাকসবজী, ফলমূল ও পোষাক-পরিচ্ছদ লইয়া উপবিষ্ট। জনসমাগমে অহরহঃ এই স্থানগুলি উল্লাসোন্মত্তাকার ধারণ করে।

জয়পুরের মত এমত শৃঙ্খলাবদ্ধ বাড়ীঘর বুঝি আর কোথাও নাই। লালপ্রস্তরের নানারূপচিত্রিত ঘরবাড়ীগুলি কে যেন যত্নপূর্ব্বক সারি সারি সাজাইয়া রাখিয়াছে। রাস্তার দুইপাশে প্রশস্ত ও সুদৃঢ় ফুটপাথ্। কলিকাতার ফুটপাথ্‌গুলি ইহাদের নিকট পরাজয় মানে। ইহাদের ও রাস্তার মাঝখানে অসংখ্য প্রদীপস্তম্ভ। জয়পুরে অনেক বড় বড় সুসজ্জিত দোকান আছে—অনেকগুলি কলিকাতার শ্বেতাঙ্গবণিকদিগের বিপণিশ্রেণীর তুল্য।

সহরের মধ্যস্থলে সমগ্রনগরের প্রায় একষষ্ঠাংশ লইয়া বৃহৎ রাজপুরী। ইহাতে যে বিচিত্র অট্টালিকাসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহার তুলনা জগতে নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সহজে এই রাজবাড়ী পথিকের দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রাচীরের পর প্রাচীরবেষ্টিত রাজপ্রাসাদাবলি বহুসংখ্যক অট্টালিকার পশ্চাৎ লুক্কায়িত হইয়াছে। এখানকার তাবৎ বাড়ীঘরগুলিই এমন মনোরম ও সুসজ্জিত যে, ইহাদের সহিত সেই সকল অট্টালিকার বিশেষ কোন বিভিন্নতা প্রথমদর্শনে দৃষ্ট হয় না। তবে যাহারা আর একটু অগ্রসর হইয়া মোড়পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক হাওয়ামহলের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইবেন, তাহারা কতকটা ধরিয়া লইতে পারিবেন বটে।

জয়পুর রাজ্যের বর্ত্তমান আয়, প্রায় এককোটী টাকা; কিন্তু অসংখ্য জায়গীরে ও দেবমন্দিরাদির ব্যয়পোষণার্থ মহারাজকে প্রতি বৎসর প্রায় ইহার অর্দ্ধাংশই ব্যয় করিয়া ফেলিতে হয়। জয়পুরের মহারাজের ন্যায় প্রজাবৎসল ও বিদ্যানুরাগী-পুরুষ ক্বচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রজার মঙ্গলার্থ তিনি বহুসংখ্যক মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিয়া, রাজ্যে অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত জয়পুরে একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ ও একটী উৎকৃষ্টআর্টস্কুলও স্থাপিত হইয়াছে। মহারাজের অধীনে ২৯টী সুরক্ষিত পার্ব্বত্যদুর্গ আছে; এবং ৯৫৭৯ জন পদাতিক, ১৩৫১৮ জন অশ্বারোহী ও ৭১৬ জন গোলন্দাজসেনা সর্ব্বদা রক্ষিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক কামানও আছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে করস্বরূপ বৎসর বৎসর চারি লক্ষ টাকা প্রদান করিতে হয়। এই নগরেএকটী টাকশাল আছে; তথায় স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রাদি সর্ব্বদা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

জয়পুর একটী বাণিজ্যপ্রধান স্থান। দিল্লী, আগ্রা ও রাজপুতনা হইতে এখানে বহু জিনিস আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। স্বর্ণ, রৌপ্য ও পাথরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের জন্য এই স্থান চিরপ্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত এনেমেলের কাজও বিস্তর হইয়া থাকে।

আমি ফটক অতিক্রম করিয়া সহরে পড়িলাম। প্রবেশমাত্রই হঠাৎ জয়পুরের সৌন্দর্য্যরাশি আমার নয়নপথে পতিত হইল। বরাবর রাজপথ চলিয়া গিয়াছে—দুইধারে দোকানশ্রেণী। অট্টালিকাগুলির সেই সুসজ্জিত আরক্তছবি দেখিয়া, ক্ষণকাল কেমন স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। রাস্তার দুইপার্শ্বের ফুটপাথ্ ধরিয়া,

অসংখ্য জনস্রোত চলিয়াছে। স্ত্রীপুরুষ ভেদ নাই; সকলেই আপন আপন উদ্দেশে সাজগোজ করিয়া বহির্গত হইতেছে। আমি এই জনতাস্রোতের মধ্য দিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। এই বিপণিসারিশোভিত রাস্তার নামও—চাঁদপোল বাজার।

সহরটী খুব বিস্তৃত নহে। দীর্ঘে দুই মাইল, প্রস্থে এক মাইলের অনধিক। কিন্তু সর্ব্বত্র অট্টালিকামণ্ডিত বলিয়া বহুলোক বাস করিতে পারে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইহার লোকসংখ্যা দেড় লক্ষেরও উপর ছিল।

জয়পুরের রাজপথগুলির মত এমন বিস্তীর্ণ ও প্রশস্ত সড়ক বুঝি আর কোথাও নাই। রাজধানী কলিকাতা নগরীতেও এমন রাস্তা কচিৎ দৃষ্ট হয়। কিছুদূর অগ্রসর হইতেই, আর একটী প্রশস্তরাস্তার নিকট উপনীত হইলাম। ইহার নাম কিষণবাজার রোড। দুটী রাস্তা পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া, একটী স্কোয়ারের সৃষ্টি করিয়াছে। উৎসসলিল-পরিপূরিত সরসীকূলে বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হইয়া কেনাবেচা করিতেছে। যেন এখানে কাহারও কিছু দুঃখ নাই—সকলেই এক প্রফুল্ল ভাবে মজিয়া রহিয়াছে।

ইহার নিকটে রাস্তার কোণে মহারাজার পাব্লিকলাইব্রেরী। এখানে সকলেই প্রবেশ করিয়া পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারেন,—কাহারও কিছু বাধা নাই। বহুসংখ্যক ইংরেজী, উর্দ্দু ও সংস্কৃত গ্রন্থাদি সংগৃহীত আছে। ইংরেজী ও আরবী গ্রন্থাদির জন্য, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এখান হইতে বরাবর ডানদিকে ঘুরিয়া, আমি আজমীরগেটে

উপনীত হইলাম। এইস্থানের সন্নিকটে একটী চিড়িয়াখানায় বহুসংখ্যক ভীষণব্যাঘ্র পালিত হইয়া থাকে। এরূপ বৃহৎ ও ভয়ানক ব্যাঘ্র আমাদের আলিপুরে একটিও নাই। আমি এখান হইতে পুনঃ স্কোয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, চাঁদপোলবাজারের বরাবর সম্মুখদিকে চলিতে লাগিলাম। কিছুদূর যাইতেই বামদিকে একটি উচ্চমিনার দৃষ্ট হইল। রাজপ্রাসাদমধ্যস্থ "স্বর্গশূল" মিনারের কথা পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলাম; এখন এই উচ্চস্তম্ভদর্শনপূর্ব্বক সন্দেহ হইল—বুঝি রাজবাড়ীর সমীপবর্ত্তী হইয়াছি। একটু এদিক ওদিক চাহিতেই, সম্মুখে "ত্রিপুলিয়া" নামক অত্যুচ্চ ফটক দেখিতে পাইলাম। উৎসুকহৃদয়ে আমি এই পথেই প্রবিষ্ট হইলাম। কিছুদূর যাইতে, দ্বিতীয় একটি গেট দৃষ্ট হইল। শাস্ত্রীপ্রহরীগণ এইস্থানে দ্বার রক্ষা করিতেছে। ইহার পরই একটি প্রাঙ্গণের সম্মুখে রাজপ্রাসাদের চারু ফটক। বহুসংখ্যক দ্বাররক্ষক দ্বারে উপবিষ্ট আছে; 'পাস' দেখাইতে না পারিলে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। সেদিন আমার সঙ্গে 'পাস' ছিল না; কাজেই ঢুকিতে পারিলাম না। এখান হইতেও রাজবাড়ীর শোভা তেমন কিছুই দেখিবার যো নাই। সমস্তটা পুরীই প্রাচীরবেষ্টিত। ফটকের দুইপার্শ্ব দিয়া বাহির দিকে দুইটীরাস্তা চলিয়া গিয়াছে। একটি বাঁ দিক দিয়া, বরাবর রাজবাড়ীর দপ্তরখানায় ঢুকিয়াছে; দ্বিতীয়টী ডানদিক দিয়া, মানমন্দির, মহারাজার আস্তাবল ও কাছারীখানা হইয়া, পুনঃ ডানদিক ঘুরিয়া হাওয়ামহলের নিকট আর একটি প্রশস্তরাজবর্ত্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই মিলনস্থানে "শ্রীদেউরি-কা-দরজা" নামক আর একটি ফটক, বাহির হইতে রাজপুরীকে রক্ষা করিতেছে।

জয়পুরের মানমন্দির, দিল্লী, মথুরা, উজ্জয়িনী ও বেনারসের মানমন্দিরচতুষ্টয় হইতে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ। এখানে এখনও অনেক পুরাতন যন্ত্রাদি অভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান আছে; কিন্তু অধিকাংশেরই ব্যবহার অজ্ঞাত। প্রাচীনকালে হিন্দুগণ জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে কিরূপ পারদর্শী ছিলেন, এই সকল মানমন্দিরগুলিই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল। জয়পুরপ্রতিষ্ঠাতা মহারাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ নিজেই একজন অসাধারণ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, পর্ত্তুগালের রাজা ইমানুয়েলের নিকট তিনি বৈদেশিকজ্যোতিষতত্ত্বশিক্ষার্থ লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে মতে, পর্ত্তুগালরাজও একজন তদ্দেশীয় জ্যোতিষকারকে জয়পুরে প্রেরণ করেন।*

কাছারীর চক্‌মিলান অট্টালিকাটী বেশ প্রশস্ত এবং লোহিত-প্রস্তরনির্ম্মিত। এখানে রাজ্যের দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব-বিষয়ক মীমাংসাদি হইয়া থাকে; বহুসংখ্যক হাকিম, কেরাণী, উকীল, প্যায়দা কাজে ব্যস্ত আছে। মধ্যের বিস্তীর্ণ আঙ্গিনায় ২।৩টী ছোট ছোট ঘর; ইহাদেরই বাঁ পাশে প্রাসাদে ঢুকিবার আর একটি দরজা ও অদূরেই ঘণ্টাঘর দেখিতে পাইলাম।

হাওয়ামহলের ন্যায় অদ্ভুত হর্ম্ম্য জগতে আর নাই। তলের উপর তল সন্নিবিষ্ট করিয়া, মন্দিরাকারে ক্রমশঃ ছোট করিয়া তোলা হইয়াছে। প্রতিতলে অসংখ্য বহিঃপ্রসারিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর,—তাহাতে দরজাগুলি সারি সারি শোভা পাইতেছে। এই

*The King of Portugal despatched Xavier-de-Silva, who communicated to the Rajput the tables of 'Dela Hire'. —*G. W. Forrest.*

উন্মুক্ত দ্বারপথে যখন সম্মুখস্থ প্রশস্ত ঢালু রাস্তার মুক্ত বায়ুস্রোত প্রবেশ করে, তখন 'হাওয়ামহল', নামের প্রকৃত স্বার্থকতা প্রতিপাদিত হয়। বাহির হইতে ইহার যে শোভা, নিকটে আসিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে বুঝি তাহা টিকিয়া উঠে না; তাই দূর হইতেই হাওয়ামহলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হয়। নানা দেশীয় পরিব্রাজকগণ শতসহস্রকণ্ঠে ইহার অপূর্ব্ব রচনাকৌশলের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; Reynolds Ball, ইহাকে 'A vision of daring and dainty loveliness' বলিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক বিস্ময়প্রকাশ করিয়াছেন।

সম্মুখস্থ রাস্তাটী যেমনি সুপ্রশস্ত, তেমনি পরিপাটী। নীচ হইতে উন্নতরাজপুরে অশ্বাদির আরোহণের জন্য, এই রাস্তা বহুদূর হইতে ক্রমে ঢালু করিয়া তোলা হইয়াছে; মধ্যস্থলটী প্রস্তরে দৃঢ়বণ্ডিত। এই উন্মুক্তস্থলে চিরমলয়ানিল খেলা করিয়া থাকে। উহার শীতলপ্রবাহে ক্লান্তি দূর করিতে করিতে হাওয়ামহল দর্শন করিলাম। সড়কের বিপরীতপার্শ্বে মহারাজার বিস্তীর্ণ কলেজ ও সংস্কৃতপাঠাগার। হাওয়ামহলের নিকটেই হালফেসনের আর একটি বহুদূরবিস্তৃত প্রাসাদাট্টালিকা দৃষ্ট হয়। প্রাচীনপ্রণালীগঠিত সহস্র সহস্র লোহিতসৌধের ভিতর এই পীতবর্ণোজ্জ্বল দালানের শোভা অপূর্ব্ব।

'শ্রীদেউরি-কা-দরজার' বামদিকে একটু অগ্রসর হইলেই, নাটকঘর ও হাতীখানা।

আমি এই সকল দেখিয়া, আগ্রাগেট পথে সহর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, রামনিবাস উপবনে আসিয়া দর্শন দিলাম। এরূপ সুন্দর উপবন ভারতে অতি বিরল। নানারূপ পুষ্প-

পত্রঘাসদূর্ব্বাদিশোভিত এই নন্দনকানন বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হইয়া থাকে। কোথাও কুঞ্জবন, কোথাও সমতল নবদূর্ব্বাদলমণ্ডিত ময়দান, কোথাও কৃত্রিম সরিৎ, কোথাও জলস্রোতের উপর ক্ষুদ্র সেতু এবং কোথাও বা কৃত্রিমপ্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। এককোণে মেওসাহেবের প্রতিমূর্ত্তি; মধ্যস্থলে সুদৃশ্য, সুরুচিসঙ্গত, নানারূপ মূল্যবান্ প্রস্তরগঠিত অপূর্ব্ব নয়নরঞ্জনপ্রাসাদ—এলবার্টহল। ইহার সম্মুখস্থ বারাণ্ডায়, জয়পুররাজেন্দ্রবর্গের তৈলচিত্র ও অন্যান্য নানারূপ ছবি অঙ্কিত আছে। তন্মধ্যে, 'আলেকজেন্দার কর্ত্তৃক দরিয়াসের পরাজয়,' 'হনুমানের লঙ্কাদহন' ও 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' প্রভৃতির দৃশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেয়ালের উপর এই চিত্রগুলি দেখিলে মোহিত হইয়া যাইতে হয়। সম্মুখের সুসজ্জিত ঘরের পশ্চাতেই জয়পুর মিউজিয়ম। এখানে জয়পুরের শিল্পজাত নানারূপ জিনিসপত্র ও অন্যান্য অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত সামগ্রী সংগৃহীত আছে। আর্টস্কুলের ছেলেদের নির্ম্মিত স্বর্ণরৌপ্য-পাত্রাদির অপূর্ব্বকারুকার্য্য, শ্বেতপ্রস্তরের অতিসূক্ষ্মকাজবিশিষ্ট ছোট ছোট দেবদেবীপ্রতিমা এবং ধাতুনির্ম্মিত নানারূপ পুতুল ও অস্ত্রশস্ত্রাদি, বিশেষ দর্শনযোগ্য। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক দ্রষ্টব্য জিনিস এইখানে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। কলিকাতামিউজিয়াম হইতে আকারে অনেক ছোট হইলেও, গুণে এইস্থান বিশেষ নিকৃষ্ট নহে। পশ্চিমে অতঃপর আমি এরূপ উন্নতশ্রেণীর মিউজিয়ম কোথাও দেখিতে পাই নাই।

সন্ধ্যার পর ষ্টেসনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সামান্য আহারাদির

গুর শয্যাগ্রহণ করিলাম। ঘরগুলি অপরিষ্কার, অর্দ্ধভগ্ন ও অপরিসর হওয়াতে, আমার মনে কিরূপ একটা অস্বাচ্ছন্দ্যভাবের উদ্রেক হইতেছিল। কপাটের নিম্নদিয়া বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসও কিছু কিছু ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল। যাহা হউক, অতিরিক্ত পরিশ্রমভায়ে অচিরাৎ ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক, হাত মুখ প্রক্ষালন করিয়া রাজবাড়ী ও অম্বর দেখিবার জন্ত পাসসংগ্রহার্থ ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। জয়পুরে বহুতর বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে বাস করিয়া থাকেন। মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া কেরাণী পর্য্যন্ত তাহাদের স্থান হইয়াছে। বঙ্গদেশনিবাসী শ্রীযুক্ত সংসারচন্দ্র সেন মহাশয়, বর্ত্তমানে জয়পুরের মন্ত্রীত্বপদে অধিষ্ঠিত। ইতি-পূর্ব্বে কান্তিবাবু নামক আরও একজন বঙ্গের কৃতিসন্তান এই সম্মানজনক রাজকার্য্য নিরতিশয় নিরপেক্ষভাবে ও সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত করিয়া গিয়াছেন। সংসারবাবুর নিকট উপস্থিত হই-লেই 'পাস' পাওয়া যাইবে, এমন বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইলাম। সংসারবাবু অতি সদাশয় এবং গুণবান্ ব্যক্তি। তাঁহার আতিথ্যসংকারের কথা তদ্দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে; সর্ব্বদা কত কত আগন্তুকব্যক্তি তাঁহার আলয়ে আশ্রয় পাইতেছে, এবং কার্য্যসমাপনান্তে স্থানান্তরে প্রস্থান করি-তেছে।

সংসারবাবুর মনোরম অট্টালিকা সহরের বাহিরে একটী মুক্ত স্থানে অবস্থিত। অনেক সাহেব সুবোর বাড়ী এবং হোটেল প্রভৃতিও এই দিকেই স্থাপিত। সংসারবাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন, সচরাচর বাহির হন না। আমি উপস্থিত হইতেই মন্ত্রীমহাশয়ের

কনিষ্ঠভ্রাতৃদ্বয় মহেন্দ্রবাবু ও পূর্ণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। বাঙ্গালী দেখিয়া তাঁহারা আমাকে যত্নপূর্ব্বক উপবেশন করাইলেন, ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যতটা অপরিচিতের ন্যায় 'পাস' গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইব ভাবিয়াছিলাম, ততটা ঘটিয়া উঠিল না। তাঁহারা কিছুতেই ছাড়িবার পাত্র নহেন; কেন আসিয়াছি, কোথায় আসিয়াছি, তাঁহাদের নিকট প্রথমেই উপস্থিত হইলাম না কেন, ইত্যাদি প্রশ্ন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া ধরিয়া বসিলেন,—'আপনি এখনি আসবাবপত্র লইয়া হেথায় চলিয়া আসুন।'

যাহা হউক, তাঁহাদিগকে আমার এতাধিক কষ্ট দিবার ইচ্ছা ছিল না; বিশেষ সেইদিনই আমাকে জয়পুর পরিত্যাগ করিতে হইবে; আমি সবিনয়ে সেই কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলাম, "সেজন্য আপনারা চিন্তিত হইবেন না; পরিব্রাজকের এমত কষ্ট ভোগ করিতে হয়; অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে একখানা পাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।" অগত্যা অনেক কথার পর তাঁহারা তাহাই করিলেন। সংসারবাবুর ছেলে অবিনাশবাবু দপ্তরে বড় চাকুরী করেন; তিনি আহারাদি করিয়া কাছারীতে যাইতে ছিলেন,—তাঁহারা তাঁহাকে আমার বিষয় জ্ঞাত করাইলেন। অবিনাশবাবু কহিলেন, "তবে চলুন—আমার গাড়ী প্রস্তুত। রাজবাড়ী দর্শনপূর্ব্বক ফিরিয়া আসিয়া এইখানেই আহারাদি করিবেন।"

এই সহৃদয়, স্বদেশবৎসল, গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের কথা এবার আর আমি অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। আহারের কথা স্বীকার করিয়াই, তাঁহার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া

কিছু কিছু আলাপ পরিচয় হইল। শেষকালে তিনি উপদেশ দিলেন, 'যখন আসিয়াছেন, তখন যেন কয়েকদিন না থাকিয়া চলিয়া না যান।' আমার অপেক্ষা করিবার সময় ছিল না; তথাপি তাঁহাকে স্পষ্ট কিছুই উত্তর দিতে পারিলাম না। মনেমনে কেবল কয়েকবার মাত্র তাঁহার এই স্বদেশপ্রীতির উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক চুপ করিয়া রহিলাম।

রাজবাড়ীর নিকটে পৌছিয়া, একটা গোল বাঁধিল। শুনিলাম, উন্মুক্তমস্তকে রাজপ্রাসাদাভ্যন্দরে প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। আমি বাঙ্গালী—আমার নিকট টুপি কিম্বা উষ্ণীষ কিছুই ছিল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ কিছু উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। অবশেষ সঙ্গের আলোয়ানটী দ্বারাই একটী উষ্ণীষ রচনা করিয়া, মস্তকে পরিধান করিলাম। পশমীবস্ত্র, স্ফীত হইয়া সমস্তটা মস্তককে একটা রজকের বস্ত্রপুটুলিতে পরিণত করিল। কিন্তু উপায় কি—এই অদ্ভুতবেশ লইয়াই আমাকে রাজবাটী দর্শন করিতে হইবে।

দপ্তরে উপস্থিত হইয়া দেখি, একজন বাঙ্গালীবাবু কতকগুলি চাপরাশীপরিবৃত হইয়া লিখনকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। আমি এইখান হইতে একখানা 'পাস'গ্রহণ করিয়া, একজন চাপরাশীসঙ্গে ভিতরমহলে প্রবেশ করিলাম। লোকটা পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল।

প্রথমেই আমরা একটী আঙ্গিনার ভিতর প্রবেশ করিয়া, একটী রুদ্ধ ফটকের সম্মুখীন হইলাম। এই ফটক-পথে অন্দরমহলে প্রবেশ করা যায়। কিন্তু ইহা চিররুদ্ধ; কেহ কখনও এ দরজা উত্তীর্ণ হইতে পারে না। অদ্ভুতশিল্পচাতুর্য্যময় এ

ফটক দেখিবার সামগ্রী বটে। ইহারই পার্শ্বে একটী দেয়ালে, 'হাওয়ামহাল' 'রামনিবাস উপবন' ও মহারাজপ্রভৃতির সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত আছে। বাস্তব হইতে চিত্রে ইহাদের শোভা কিছু বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। এখান হইতে আমরা মহারাজের মন্ত্রনাভবন, দেওয়ানী আম ও দেওয়ানীখাসে উপস্থিত হইলাম। সুন্দর সুন্দর মার্ব্বেলস্তম্ভশোভিত দেওয়ানী আমে অসংখ্য বহুমূল্য স্প্রীংনির্ম্মিত চেয়ার সারি সারি সজ্জিত রহিয়াছে।

মহারাজের বাসভবন 'সপ্ততল চন্দ্রমহল' একটী অলৌকিক প্রস্তরালয়। বহুদূর হইতে ইহার গগনভেদীচূড়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অসংখ্য অর্থরাশি ব্যয় করিয়া এই নয়নতৃপ্তিকর ও মনোমুগ্ধকর অট্টালিকা বিস্তৃতভূমিখণ্ডের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার পশ্চাতেই মনোহর উদ্যান। নানারূপ লতাকুঞ্জাদি-শোভিত এই উদ্যানে মহারাজ পদচারণা করিয়া থাকেন। এই উপবনের অপরপার্শ্বেই শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর প্রসিদ্ধ মন্দির। মহারাজ এই কুলদেবতাকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা বিবিধ উপচারে পূজা দেন। এই দেবালয়ের সমগ্রভার একজন বাঙ্গালী পুরোহিতের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। পুরোহিত মহাশয় বেশ শিক্ষিত ও অমায়িক লোক; স্বদেশীয়পর্য্যটক দেখিয়া, অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার সঙ্গে গল্প সল্প করিলেন।

প্রধান ফটকের সম্মুখে প্রিন্টিং হাউস। কিন্তু ইহাকে এখন একটি সুন্দর বৈঠকখানাঘরে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'হাওয়ামহল' 'স্বর্গশূল মিনার' প্রভৃতিও রাজবাটী-সংলগ্ন; কিন্তু তাহাদের ভিতর আমাদের প্রবেশাধিকার নাই।

আমি বাহির হইয়া আসিয়া পুনঃ দপ্তরে প্রবেশ করিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই অবিনাশবাবু আসিয়া কহিলেন, "গাড়ী প্রস্তুত রহিয়াছে, আপনি আহারার্থ গমন করুন।" দুজন লোক সঙ্গে; বাসায় পৌঁছিয়া আহারাদি সমাপন করিলাম। তার পর অম্বর যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে হইল। 'পাস' সঙ্গেই ছিল; মহেন্দ্রবাবু একজন ভৃত্যকে একা ডাকিতে আদেশ করিলেন। অম্বরের পার্ব্বত্যপথে বড় গাড়ী চলিবার সুবিধা নাই। পর্য্যটকগণ হস্তিপৃষ্ঠে অথবা একাযোগে এইস্থানে গমন করিয়া থাকেন। কাজেই আমাকেও একার আশ্রয়ই গ্রহণ করিতে হইল।

বেলা দেড়টার সময় আমার দ্বিচক্ররথ আমেরফটক অতিক্রমপূর্ব্বক প্রান্তর বহিয়া অম্বরাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। এতদ্দেশবাসিগণ অম্বরকে আমের কহে, অথবা আমরাই বুঝি আমেরকে অম্বর কহি। তাই অম্বরপথাভিমুখী ফটকের নাম 'আমের-কা-দরজা'।

জয়পুর হইতে অম্বর পাঁচমাইলপথ দূরবর্ত্তী। রাস্তার উভয় পার্শ্বেই পর্ব্বতমালা। প্রায় চারিমাইলপথ অতিক্রম করিয়া, আমাদের গাড়ী ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উত্থিত হইতে লাগিল। উভয়পার্শ্বে অত্যুচ্চপর্ব্বতশিখরমালা, তদুপরি কেল্লা নির্ম্মিত হইয়াছে। পর্ব্বতগাত্রে অদ্ভুত কৌশলে প্রস্তরখণ্ড যোজনা করিয়া, কেমন সুন্দর সুন্দর সিঁড়ি নির্ম্মিত হইয়াছে। দূর হইতে বোধ হইতেছিল, যেন কেহ একটি চিত্রের উপর আঁকিয়া বাঁকিয়া রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিতেই আমরা অম্বরের স্বভাবসৌন্দর্য্যোদ্ভাসিত পার্ব্বত্যদুর্গ হ্রদের জলে প্রতিফলিত দেখিতে পাইলাম।

অম্বর।

মানসিংহের রাজধানী চিরসৌন্দর্য্যময়ী অম্বর এখনও প্রাকৃতিকশোভায় অনন্ত শোভাময়ী। একটি তুঙ্গশৈলশিখর বিশালবপুবিস্তার করিয়া আকাশ ঢাকিয়া রাখিয়াছে, আর তাহারই পদমূলে উচ্চটিলার উপর সমতলভূখণ্ডে অম্বরদুর্গের প্রাসাদাবলী হ্রদবারি পরিবেষ্টিত হইয়া, সরোবর প্রস্ফুটিত শতদলবৎ ফুটিয়া রহিয়াছে। হ্রদের অপরপার্শ্বে আরও নিম্নে উপত্যকাভূমির উপর ভগ্নমন্দিরাদিপরিবৃত প্রাচীনসহর অম্বর অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

এই প্রকৃতির লীলাভূমি মনোরমস্থল প্রত্যক্ষ করিলে, স্বতঃই একটী প্রশ্ন মনে উঠে যে, এই প্রিয়দর্শন পার্ব্বত্যসুষমারাশি পরিত্যাগ করিয়া জয়সিংহ কোন্ প্রাণে, কোন্ প্রয়োজনে জয়-পুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন? কোনও সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক বিস্ময়সহকারে বলিয়া গিয়াছেন, "যিনি অম্বর পরি-ত্যাগ করিয়া জয়পুর গঠিত করিয়াছেন, তাঁহার অসাধ্যকাজ জগতে কিছুই নাই।"

পুরাকালে সুপ্রসিদ্ধ মীনবংশীয় নরপতিগণ অম্বরে রাজত্ব করিতেন। অম্বাদেবীর নামে উৎসর্গীকৃত বলিয়া এই নগরীর নাম অম্বর হইয়াছে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে দুর্গম গিরিপথে স্থাপিত, তাই মীনবংশীয়গণ ইহাকে ঘাটরাণী বলিয়া উল্লেখ করিতেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে এইস্থান তাঁহাদিগের হস্তচ্যুত হইলে, নিকটবর্ত্তী ধুন্দর-জনপদনিবাসী কচ্ছ্ রাজগণ এইস্থানে রাজ্য স্থাপিত করিলেন। সেই অবধি অম্বররাজ্য রাজপুতগণের করায়ত্ত আছে।

অম্বরের রাজভবন মহারাজ মানসিংহ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে তদীয় পৌত্র জয়সিংহ (মির্জ্জারাজা) কর্ত্তৃক ইহার সৌন্দর্য্যসৌষ্ঠব বিশেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীর, জয়মন্দিরাদি কতিপয় রম্যপ্রাসাদ, ও তালকুম্ভোরাহ্রদ তিনিই নির্ম্মাণ করিয়া যান এবং উপবনাদিদ্বারা রাজধানী সুশোভিত করেন।

মির্জ্জা রাজা জয়সিংহের ত্রিশবৎসর পর, জয়পুরপ্রতিষ্ঠাতা দ্বিতীয় জয়সিংহ অম্বরের রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার বিষয় ইতিপূর্ব্বেই কতক কতক বিবৃত হইয়াছে। সমসাময়িক অন্যান্য রাজন্যবর্গের উপর তদীয় বিশেষত্ব স্থাপন করিবার জন্য মোগলসম্রাট্ তাঁহাকে 'সোয়াই' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত জয়পুর-রাজগণ এই সম্মানজনক উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন। 'সোয়াই' অর্থে এই বুঝায় যে, প্রত্যেক রাজাকে এক ধরিয়া তিনি তাঁহাদের উপর একপোয়া অধিক, —অর্থাৎ সোয়া।

আমরা পর্ব্বতমূলে উপস্থিত হইয়া দুর্গপ্রবেশার্থ অগ্রসর হইলাম। হ্রদের তীরে ইউরোপীয়পর্য্যটকদিগের নিমিত্ত একটী বাঙ্গলা নির্ম্মিত হইয়াছে। এইখান হইতে অম্বরের প্রকৃত শোভা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। দুর্গের তিন দিকেই হ্রদের স্বচ্ছবারি টলমল করিতেছে। তাহাতে প্রাসাদাবলীর প্রিয়চ্ছবি প্রতিফলিত হইয়া, কেমন মনোরম দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছে—যেন কোন ভুবনমোহিনী রূপসী, বিস্তৃত মুকুরখণ্ডে আপনার বিশ্বমনোমোহিনী মুরতিখানি চিত্রিত দেখিয়া, আপনাআপনি মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন। প্রাসাদমূলে মনোরম কাননগুলির শ্যামলসৌন্দর্য্য পথিকের নয়নমনপরিতৃপ্তিকর। সকলের উপর প্রশান্ত

গিরিদুর্গ জয়গড়কেল্লা অত্যুচ্চপর্ব্বতশৃঙ্গে, বিমানস্পর্শী মায়াপুরী-বৎ প্রতীয়মান হইতেছে। দেখিতে দেখিতে, আমরা দুর্গারোহণ করিতে লাগিলাম।

অম্বরদুর্গের বাহিরের শোভা যেমন অতুলনীয়, আভ্যন্তরিক সাজসজ্জাও তেমনি দুর্লভ। অপূর্ব্ব প্রাসাদশালিনী এই বিচিত্র রাজপুরী দর্শন করিলে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, ঐশ্বর্য্য-সম্পদে ও সৌন্দর্য্যে কোনকালে এই স্থান দিল্লী ও আগ্রার রঙ্গমহলের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। জয়মন্দির, যশোমন্দির, সোহাগমন্দির প্রভৃতি রম্যাবাসগুলি দর্শন করিলে, এই কথার যাথার্থ্য অনুভূত হয়। কথিত আছে, ইহার তৎকালীন সম্পদের কথা শ্রবণ করিয়া, বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মনেও ঈর্ষা ও লালসা-প্রবৃত্তির সঞ্চার হইয়াছিল। রাজা মির্জ্জা, আপনার অদ্ভুত বুদ্ধিবলে মূল্যবান্ কারুকার্য্যগুলি সাদাপ্রলেপাবৃত্ত করিয়া, এই বিপদ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। দেওয়ানীআমের বিচিত্রশিল্পখচিত স্তম্ভসারি আজও শ্বেতপ্লাষ্টারমণ্ডিতই রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যে যে স্থানে প্লাষ্টারগুলি একটু একটু ভগ্ন হইয়াছে, তথায়ই ভিতরের কারুকার্য্যগুলি বাহির হইয়া গিয়াছে।

দুর্গ প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে উচ্চগৃহাদিবেষ্টিত সুপ্রশস্ত মুক্ত-ভূমি দেখিতে পাইলাম। এখান হইতে সিঁড়িপথে অন্য একটী উচ্চপ্রাঙ্গণ আরোহণ করিয়া, আমাদিগকে দেওয়ানীআমে পৌঁছিতে হইল। দিল্লী ও আগ্রার আমদরবারের ন্যায়, ভারতের অদৃষ্টলিপির সঙ্গে, অম্বরদেওয়ানীআমের তাদৃশ ঘনিষ্ট সম্পর্ক না থাকিলেও, সৌন্দর্য্যগরিমায় ইহার স্থান নীচে নহে। চারিপার্শ্বে অপূর্ব্বকারুকার্য্যখচিত লোহিতপ্রস্তরের স্তম্ভগুলির

প্রাচীরমণ্ডিত ধবলমূর্ত্তি এবং মধ্যস্থলে ষোলটী মার্ব্বলস্তম্ভের ঈষদ্‌নীলাভ উজ্জ্বলশোভা অম্বরশিল্পিগণের স্থাপত্যনৈপুণ্যের বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে।

দেওয়ানীআমের পার্শ্বেই বর্ত্তমান মহারাজার আধুনিক ক্রীড়ানিকেতন—বিলিয়ার্ডমণ্ডপ। ইহার গবাক্ষপথে নিম্নস্থ উপত্যকাভূমির চারুশোভা দৃষ্ট হইয়া থাকে। হ্রদের জলে পরিত্যক্ত, মলিনাম্বরা অম্বরনগরীর প্রতিমূর্ত্তি এবং উপবনাদির ছবি প্রতিফলিত হইতেছে। এই ঘরের সম্মুখেই আর একটী অনুন্নত দীর্ঘঘরে, সারি সারি অনতিউচ্চ মর্ম্মরস্তম্ভশ্রেণী, দেখিতে বড়ই মনোরম!

দেওয়ানীআমের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণের পরেই, চারিদিকে সুরক্ষিত উচ্চপ্রাচীরবদ্ধ আরও কিছু উন্নতভূমির উপর—অন্দর-মহল। একটী মাত্র অনতিবৃহৎ সুদৃঢ় ও সুচিত্রিত ফটকপথে এই পুরীতে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। এই ফটকের নাম—গণেশ-পোল। বহুকারুকার্য্যমণ্ডিতদ্বারের পিত্তলকবাটের উপর সিদ্ধি-দাতা গণেশের একটী প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

মার্ব্বেলনির্ম্মিত সিঁড়িপথে আমরা এই ফটক অতিক্রম করিলাম। প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে বৃক্ষলতাদিশোভিত ক্ষুদ্র উদ্যানভূমি দৃষ্ট হইল। এই উদ্যানের চতুর্দ্দিকে অন্দরমহলের বিচিত্রসৌধাবলি—আ মরি। মরি!—কি রূপের ছটায়ই ফুটিয়া রহিয়াছে! না জানি, কোন্ দেবতুল্য শিল্পী এই অপূর্ব্ব প্রাসাদ-নিচয় গঠন করিয়াছিলেন। আগ্রার ও দিল্লীর রঙ্গমহলে যে মণিমাণিক্য ও অর্থরাশি ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে, অম্বরের রাজ-প্রাসাদে সে সব কিছুই নাই; কিন্তু তথাপি ইহার সৌন্দর্য্যপ্রভা

তেমনি উজ্জ্বল, তেমনিই মনোমুগ্ধকর! রাজপুতনার শিল্পিগণের অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয়, এই ব্যয়সংক্ষিপ্ততাতেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সামান্য মুকুরখণ্ডগুলির অপূর্ব্ব সন্নিবেশে এবং ভাস্করের অদ্ভুতখচিতালঙ্কারে যখন এই চারুঅট্টালিকাগুলি রাজপুতনার কামিনীকুসুমচয়ের উজ্জ্বল জ্যোতির্মিশ্রণে হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, তখন এইখানে কি অলোকসামান্য সুষমারাশিই বিকসিত হইত, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! কিন্তু সেই একদিন, আর আজই একদিন! সেই অলৌকিক সৌন্দর্য্যবিভা এখন কোথায়? হায়, কে বলিয়া দিবে কোথায়? নীরবে ফুটিয়া, নীরবে হাসিয়া, নীরব-সৌন্দর্য্যে কত কত পুষ্পরাশি এখানে ঝরিয়া পড়িয়াছে—তাহার চিহ্নমাত্রও কি দেখিতে পাইতেছ? প্রাণ গিয়াছে, দেহ রহিয়াছে; চাঁদ গিয়াছে, আকাশ আছে; ফুল ঝরিয়াছে, কিন্তু বৃক্ষ বাঁচিয়াছে;—আমি অতীতের চসমাচক্ষে সামান্য প্রস্তরখণ্ডের মধ্যেও কত কি দেখিতে লাগিলাম।

উদ্যানের বাঁ'দিকে দেওয়ানীখাস বা জয়মন্দির। এই গৃহে সর্ব্বশুদ্ধ তিনটী প্রকোষ্ঠ। সকলগুলিরই ছাদ ও ভিতরের দেওয়াল আয়নাখণ্ডসংযোগে এমন সুশোভিত যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রাচীন কারুকার্য্যগুলি একরূপ মলিন হইয়া যাইতেছিল; সৌভাগ্যবশতঃ, বর্ত্তমান যুবরাজের আগমনোপলক্ষে বহু অর্থব্যয়ে একাংশ সুসংস্কৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। বাহিরের বারাণ্ডায় তিন দিকেই মার্ব্বেলস্তম্ভ; উহারাও দেখিতে মনোহর বটে। জয়মন্দিরের বাঁ'দিকে তমসাবৃত চারু স্নানাগার। অন্ধকারময় সিঁড়িপথে নীচে নামিয়া এইখানে পৌঁছিতে হয়। স্থানটী গোলাকার এবং চারিদিকে

প্রকোষ্ঠসম্বলিত ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে আলোক প্রবেশ করিয়া মর্ম্মরোজ্জ্বল মেজেতে প্রতিফলিত হইতেছে। স্নানকুণ্ডের দুই পার্শ্বে দুইটী পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্ঠে সেকালে গরম ও শীতল পানীয় রক্ষিত হইত, এবং স্নানান্তে অপরিষ্কৃত এবং অব্যবহার্য্য বারিরাশি নিকটবর্ত্তী আর একটী পাত্রে অপসারিত হইয়া যাইত।

এখান হইতে সোপানাবলি আরোহণ করিয়া, ক্রমশঃ উপরে উঠিলে দেওয়ানীখাসের উপর,—যশোমন্দির। এইখানে দুইটী মাত্র ঘর—একটী বড়, একটী ছোট। ভিতরের প্রাচীরগুলি সমস্তই জয়মন্দিরের ন্যায় মুকুরখণ্ডে, সেই একই প্রণালীতে সজ্জিত। বাহিরের দেওয়ালগুলি শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত ; মধ্যে মধ্যে ছিদ্রযুক্ত বড় বড় প্রস্তরজাল সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গৃহের উপরে দুই পার্শ্বে দুইটী গম্বুজ, মধ্যস্থলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ক্ষুদ্র গৃহ। নিম্নে মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত অলিন্দ। এইখান হইতে ঊর্দ্ধে জয়গড়-কিল্লার দৃশ্য অতি চমৎকার।

এই তলেই গণেশ-পোলের উপরে সোহাগমন্দির। ইহার বাহিরের দেওয়ালগুলি সুন্দর চিত্রিত। এই গৃহে বসিয়া এক-কালে দুর্গের পৌরস্ত্রীবর্গ তিনটী শ্বেতপ্রস্তরজালের ছিদ্রপথে বাহিরে দেওয়ানীআমের কার্য্যাবলি দর্শন করিতেন। গৃহের দুইপার্শ্বে আরও দুইটী ছোট ছোট, অপরিসর ঘর, এবং তাহাদেরই উপরে দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম্বুজ শোভা পাইতেছে। ইহাদের ভিতরেও দুইটী ছিদ্রযুক্ত প্রস্তর জানালা দৃষ্ট হয়—কিন্তু তাহারা মর্ম্মরনির্ম্মিত নহে। দেওয়ালগুলি কারুকার্য্যময়, শুভ্র—যেন লাল প্রস্তরের উপর সাদা চুণকাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এইখান হইতে নীচে নামিয়া, বরাবর একটী গুপ্তরাস্তায় মহিলাদিগের আবাসভবনে পৌঁছিতে পারা যায়। এই দীর্ঘ রাস্তার উপরে, নীচে ও পার্শ্বে সর্ব্বত্রই সুদৃঢ় প্রাচীর—জনপ্রাণীর দৃষ্টিমাত্র প্রবিষ্ট হইবার সাধ্য নাই। উদ্যানের ডান দিকে, দেওয়ানীখাসের বিপরীত পার্শ্বে, নীচতলে এই অন্তঃপুর মহল—সুখ-মন্দির। ইহার সম্মুখভাগ অত্যুচ্চ প্রাচীরাবদ্ধ। আলো আসিবার জন্য প্রস্তরের ভিতর খিড়খিড়ি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাহারা এমনি সুকৌশল-নির্ম্মিত যে, বাহির হইতে ছিদ্রপথে ভিতরের কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

এই মহল দুই খণ্ডে বিভক্ত; উভয় স্থানই তুল্য সজ্জিত। প্রথমেই একটী সুসজ্জিত গৃহের সম্মুখে ক্ষুদ্র আঙ্গিনা। গৃহাভ্যন্তরটি নানাকারুকার্য্যময় এবং কিয়দংশ শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত; মধ্যে মধ্যে আয়নাখণ্ডও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার পরেই রাজ্ঞী-দিগের আবাসগৃহ—সুখনিবাস। সুখনিবাস প্রকৃতই সুখনিবাস বটে—এমন চারুগঠিত বাসভবন এককালে কি মনোরমই না ছিল! এইখানে, গৃহ ও আঙ্গিনা উভয়ই ছাদযুক্ত এবং চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। মেজের ভিতর দিয়া কৃষ্ণরেখাযুক্ত উৎকৃষ্ট জয়পুর-মার্ব্বেলের পয়োনালী প্রবাহিত হইতেছে। প্রস্রবণ ও [illegible]ের জল দেয়ালসংলগ্ন সঙ্কীর্ণছিদ্রপথে অপূর্ব্ব-কৌশলে এইখানে আনীত হইত, এবং পুরবাসিনীগণ এই স্বচ্ছবারিরাশিতে হস্ত-মুখাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক আরসী-ক্রোড়ে আপনাপন প্রতিমূর্ত্তিখানি লক্ষ্য করিয়া, হাস্যমুখরিতবদনে চারিদিকে কি সুখের তরঙ্গই তুলিয়া দিত!

এখান হইতে একটি ফটকপথে, গণেশপোলের দিকে কিয়-

দূর অগ্রসর হইলেই বাম পার্শ্বে, অপরিসর ক্ষুদ্রকক্ষে কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ ভৌগলিক চিত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেওয়ালের গাত্রে অদ্ভুত-কৌশলে, উজ্জয়িনী, মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, বারাণসী ও পাটনার তাৎকালীন প্রতিকৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল চিত্রের সহিত তাহাদের আধুনিক অবস্থার কিছুমাত্র সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হইল না।

এইখান হইতে আমরা অন্দরমহল পরিত্যাগপূর্ব্বক অম্বরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী প্রসিদ্ধা শিলাদেবীর মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম। বাঙ্গালীপর্য্যটকমাত্রেরই এই স্থান দর্শন করা একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ, এই শিলাদেবীই একদিন বাঙ্গালার কোন প্রবলপ্রতাপ ভূম্যাধিকারীর অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে বাস করিতেছিলেন। এতদিন এই মাতৃমূর্ত্তি প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী বলিয়া পরিচিত হইত; কিন্তু অল্পদিন হইল, কোন খ্যাতনামা লেখক অনেক ঐতিহাসিক গবেষণার পর, সে ভ্রম অপনোদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। জয়পুরের ইতিবৃত্ত পাঠেও আরও অনেক প্রমাণ সংযোগে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইনিই বারভূঁইয়ার অন্যতম, বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদরায় ও কেদাররায়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী;—প্রতাপাদিত্যের যশোহরেশ্বরী নহেন। রাজা কেদাররায়কে পরাজিত করিয়া, মানসিংহ এই শিলামূর্ত্তি অম্বরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে, পূর্ব্বে এখানে প্রতিদিন একটী করিয়া নরবলি হইত; এখন তৎপরিবর্ত্তে ছাগবলি হইয়া থাকে।—এজন্য অনেক সাহেবসুবোও এস্থান দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। ভয়ঙ্করার এই দৃঢ়প্রাচীরবদ্ধ ভয়ঙ্কর মন্দির দর্শনকরতঃ, আমি অম্বর দর্শনকাণ্ড সমাপিত করিলাম।

জয়পুরে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইল। পাছে থাকিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি হয়, এই ভয়ে আমার মহানুভব আশ্রদাতাদিগের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই ষ্টেসনে চলিয়া আসিলাম। কেবল সংবাদ দিবার জন্য ভৃত্যদিগকে বলিয়া আসিলাম,—'বলিও, আমি চলিয়া যাইতেছি।' যদি কখনও সময় পাই, তবে ভরসা আছে, তাঁহাদের নিকট এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

সেইদিনই রাত্রি দশটার গাড়ীতে আজমীরাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

আজমীর।

শেষরাত্রি ৫টার সময় দুর্দ্দান্ত শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আজমীরে অবতরণ করিলাম। আজমীর একটী প্রসিদ্ধ স্থান। সমগ্র রাজপুতনার ব্রিটীশ হেডকোয়ার্টার বলিয়া, এখানে অনেক সাহেবসুবো বাস করিয়া থাকেন। ষ্টেসনে নামিয়াই ইহার সমৃদ্ধির কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। একজন ডাক্তার আসিয়া প্রথমে আমাদিগকে নাড়ীস্পর্শপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন,—আমরা কোন সংক্রামক রোগাক্রান্ত কি না; তারপর সহরে ঢুকিতে পাইলাম।

রাজকীয় সংস্রব ব্যতীত এই সহরের সম্পদের আরও কয়টী কারণ আছে। হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ের নিকটই এই স্থান বড়ই পবিত্র। প্রতিদিন বহুসংখ্যক যাত্রিক ভারতের নানাদেশ হইতে এখানে আগমন করিয়া থাকে। এইখানকার প্রসিদ্ধ দারগা—মৈনুদ্দীনচিস্তির সমাধি—সমগ্র ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের

একটী প্রধান তীর্থস্থান। হিন্দু ও মুসলমানগণ উভয়েই ইহাকে অতি ভক্তির চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে। হিন্দু-দেবালয়ের ন্যায় এখানেও, বহুসংখ্যক মুসলমান পাণ্ডা নিযুক্ত আছে। আমরা বাহিরে আসিতেই, তাহাদের একজন ছুটিয়া আসিয়া আমার হাতে একটী পুষ্প প্রদান করিল। এই পুষ্পপ্রদানের অর্থ এই যে,—'তুমি আজ আমার যাত্রিক হইলে; আজমীরের দরগায় অন্যের সহিত প্রবেশের তোমার অধিকার নাই; দেনা-পাওনা যাহা কিছু সকলেরই মালিক আমি—অন্যে নহে।'

হিন্দুদের পবিত্রতীর্থ পুষ্কর-হ্রদ আজমীরের অতি নিকটে অবস্থিত—সাতমাইল মাত্র ব্যবধান। পাহাড়পথে হাঁটিয়া অথবা একারোহণে তথায় যাইতে হয়। এজন্য এইখানে বহুতর হিন্দু-পাণ্ডার সমাগম হইয়া থাকে। আমি এই উভয়বিধ পাণ্ডার হস্ত হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইয়া, নিকটবর্ত্তী সরাইয়ে আশ্রয় লইলাম। আজমীরের সরাইগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দিল্লী ও আগ্রা ব্যতীত যাত্রিকদের জন্য এমন সুবিধা আর কোথাও দেখি নাই। ইহারা মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘর নহে—ইষ্টক বা প্রস্তরগঠিত প্রশস্ত অট্টালিকা। প্রত্যেক যাত্রিকের জন্যই একএকটী কোঠা নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহাদের ভাড়াও অতি কম,দুই আনা হইতে, চারি আনা মাত্র। ঘরে জিনিসপত্র রাখিয়া, তালা-চাবি মারিয়া বাহির হইয়া যাও, কিছুমাত্র আশঙ্কার কারণ থাকিবে না।

আমি প্রবেশ করিতেই,একজন ভৃত্য আসিয়া ল্যাম্পে প্রদীপ জ্বালিয়া দিল, ও চারপায়ার উপর বিছানা রচনা করিল।

কুলিকে বিদায় করিয়া, আমি রাত্রিটুকু চক্ষু মুদিয়া কোনরূপে কর্ত্তন করিলাম।

নিদ্রাভঙ্গে বাহির হইয়া দেখি, সমস্ত সহরটী সূর্য্যকিরণ-সম্পাতে হাসিয়া উঠিয়াছে। আজমীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এ সময়ে যেমন পূর্ণপ্রকটিত হয়, তেমন বুঝি আর কখনই নহে। চারিদিকে অভ্রভেদী পাহাড়; তাহাদের শ্যামলশিখরগুলি অরুণ-করে হৈমকান্তি ধারণ করিয়াছে। আর মধ্যস্থলে অসংখ্য ধবল-হর্ম্ম্যরাজি যেন নিবিড়-কাননে অযুতপুষ্পবৎ প্রস্ফুটিত হইয়া আছে; অদূরে তারাগড়ের ঢালু অঙ্কে বাড়ীঘরগুলি কেমন ঝুলিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। দুর হইতে এ দৃশ্য বড়ই চমৎকার! উপরে পর্ব্বতশিখরে, চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরাজের প্রকাণ্ড দুর্গ আজও বিদ্যমান। আজমীরের এ স্বভাবিক অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি বৃটিশের সুবন্দোবস্তে আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। সমস্তটা সহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য দালানগুলি নয়নতৃপ্তিকর। প্রাচীর দ্বারা নগরী বেশ সুরক্ষিত; পাঁচটী উন্নত ফটকের ভিতর দিয়া সহরে প্রবেশ করিতে হয় এই নগর খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে চৌহানবংশীয় অজয়পাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহার প্রাচীন নাম—ইন্দ্রকোট।

আজমীরে যে কোন কালে হিন্দুপ্রতাপ সুদৃঢ় ছিল, তাহার প্রমাণ এখনও কিছু কিছু পাওয়া যাইয়া থাকে। নগরের ইতস্ততঃ অসংখ্য হিন্দুমন্দির ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে। পরবর্ত্তী মুসলমান বিজয়ীগণের হস্তে আকার অনেক পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহাদিগকে চিনিয়া লইতে কোনই কষ্ট হয় না। 'আড়াইদিন্‌কা ঝম্‌প্রা' এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যদিও এই মন্দির এখন

অনেকটা মসজিদের আকার ধারণ করিয়াছে, তথাপি ভিতরের কারুকার্য্যগুলি দর্শন করিলে, ইহার হিন্দুআদর্শ স্পষ্টই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এটা যে পূর্ব্বে হিন্দু-দেবমন্দির ছিল, সে কথা মুসলমানগণও, স্বীকার করিয়া থাকেন। দরগার যে পাণ্ডার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল, সে কহিল, এই মন্দির পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। প্রতিদিন ইহাতে ১৮০টী ঘণ্টা একসঙ্গে ধ্বনিত হইত। পরে মুসলমানগণের হস্তে পতিত হইয়া, মসজিদাকার ধারণ করিয়াছে। হায়, সেই একদিন, আর আজই একদিন! দেখিলাম, মন্দিরদ্বারে—অথবা মসজিদ-দ্বারে, দরগার পরলোকগত পীরকর্ত্তৃক যে সকল কোরাণোদ্ধৃত আরবী অক্ষর অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা এখনও স্পষ্ট বিদ্যমান আছে। মন্দিরের ভিতর বত্রিশটী চমৎকারকারুকার্য্যময় উচ্চস্তম্ভে ছাদখানি রক্ষিত। সে ছাদেরই বা শোভা কত। প্রবেশপথে সম্মুখের আর একটী ঘরে অতি সুন্দর সুন্দর খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তিসকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা সকলই যে হিন্দুরাজত্বের প্রাচীন নিদর্শনমাত্র, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই মন্দিরের অনতিদূরেই মৈনুদ্দীনচিস্তির প্রসিদ্ধ দরগা। ইহা অতি বৃহৎ ও সমৃদ্ধিশালী মন্দির। আকবর, সাহজাহান ও আরঙ্গজেব প্রত্যেকেই এইস্থানে বহু অর্থব্যয়ে মনোরম অট্টালিকাশ্রেণী নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে আকবর ও সাহজাহাননির্ম্মিত মন্দির দুইটী শ্বেতপ্রস্তরগঠিত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বর্ত্তমান নিজামবাহাদুরনির্ম্মিত ঝাড়লণ্ঠনশোভিত প্রস্তরাট্টালিকা সম্মুখের আঙ্গিনার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। ইহারও সম্পদ কম নহে। এই আঙ্গিনায় ঢুকিবার পথে ফটকের উপর দুইটী

সুবৃহৎ নহবত স্থাপিত হইয়াছে। কথিত হয়, ইহারা পূর্ব্বে চিতোরনগরদ্বারে শোভা পাইত; পরে আকবর কর্ত্তৃক আনীত হইয়া এইস্থানে রক্ষিত হইয়াছে। আকবর সাহ যে এই স্থানকে অতিশয় ভক্তিসহকারে দর্শন করিতেন, সে কথা 'ফতেপুর শিক্‌রি' পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হইয়াছে; অতএব এ কথা একবারে অমূলক নাও হইতে পারে। ইহার নিকটেই একস্থানে, দুইটী বৃহৎ চুলার উপর দুইটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহনির্ম্মিত পাত্র বসান রহিয়াছে। পাণ্ডা গল্প করিল, এই দুইটি পাত্রে প্রতিদিন ১২০/ ও ৬০/ মণ চাউল সিদ্ধ করা হয়, এবং শত শত লোককে এতদ্বারা পোষণ করা হইয়া থাকে। ফেন নিঃসরণের জন্য হাঁড়ি দুইটীর তলদেশে দুইটী ছিদ্র আছে। রাঁধিবার সময় এই ছিদ্রগুলি স্ক্রু দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আমার কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া ততটা কিছু অনুমানে আসিল না! আমি আন্দাজ করিলাম, ১মটীতে ৪০/মণ ও দ্বিতীয়টীতে জোর ২০/ মন চাউল সিদ্ধ হইতে পারে।

এই আঙ্গিনার পরেই অন্য একটি সুবৃহৎ প্রাঙ্গণের পার্শ্বে নানাকারুকার্য্যময় প্রসিদ্ধ সমাধিমন্দির; ইহারই দুই পার্শ্বে সাহজাহান ও আওরঙ্গজেব নির্ম্মিত মন্দিরদ্বয়। দরগার ভিতরে অসংখ্য ধনরত্ন ব্যয়িত হইয়াছে। নানাদেশীয় মুসলমান ভূপতিগণ অকাতরে অর্থরাশি ব্যয় করিয়া, ইহাকে স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছেন। সমাধিস্থলের চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট রৌপ্যনির্ম্মিত রেলিং; উপরে জরির কাজ করা বহুমূল্য চন্দ্রাতপ; কপাটগুলি সমস্তই রৌপ্যমণ্ডিত। এতদ্ব্যতীত আরও অসংখ্য উৎকৃষ্ট পাথর চারিদিকের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। শুনিলাম,

আফগানিস্থানের আমীর বাহাদুর এইস্থান দর্শন করিতে আসিয়া, সহস্রমুদ্রা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করিলে পর, আর একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড সংঘটিত হইল। সে কাহিনী পাঠকের নিকট বেশ কৌতুকজনক বোধ হইবে। পাণ্ডারা আমার নিকট হইতে দর্শনী পাইবার জন্য নানারূপ জেদ করিতেছিল, আমিও দুইটী পয়সা মাত্র বাহির করিয়া, তাহাদের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু যেই আমি মুদ্রা দুইটি পকেট হইতে বাহির করিয়া বেদীর উপর স্থাপিত করিয়াছি, অমনি পাণ্ডাগণ সমস্বরে হৈ হৈ রবে আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল। আমি চাহিয়া দেখি—একটি পয়সা ও একটি আধুলি! আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলাম একি হইল! আমি কি অনবধানতাবশতঃ পয়সার সহিত আধুলি রাখিয়া ছিলাম; অথবা এই মহাপুরুষের মৃতদেহকণাস্পর্শেই তাম্রমুদ্রা রৌপ্যে পরিণত হইল!

এতদ্ব্যতীত আজমীরে, রাজকুমারগণের মেও কলেজ, ও ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী ঘণ্টাস্তম্ভ প্রভৃতি কতকগুলি আধুনিকগৃহ দর্শনোপযোগী। মেও কলেজের সম্মুখ হইতে আজমীরের শোভা অপূর্ব্ব। সমস্তটা সহর যেন পর্ব্বতগাত্রে ঝুলিয়া আছে। এইদিকের রাস্তাঘাট বড়ই পরিপাটী। স্থানে স্থানে ইউরোপীয় বণিকদের দোকানপাটগুলি নানাসাজে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। এখানে বাসা ভাড়া ও আহার্য্য জিনিসাদি বড়ই সস্তা। পরিশ্রমের মূল্যও অতি কম—১॥৹ কি ২৲ দুই টাকা বেতনে যথেষ্ট ভৃত্য মিলিয়া থাকে; দুইপয়সা কি তিন পয়সা ব্যয়ে একটি কুলিকে বেশ দুইমাইলপথ লইয়া যাওয়া যায়। স্থানও বেশ

স্বাস্থ্যকর বটে। সহরের জল, কলে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী "অনাসাগর" নামক হ্রদের জল অতি পরিষ্কার। যদি কখন কোন বাঙ্গালী অল্পব্যয়ে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে চান, তবে এই পাহাড়বেষ্টিতনগরের প্রকৃতিসুষমারাশির ভিতর আসিয়া বাস করিতে ভুলিবেন না।

পুষ্কর-তীর্থ।

সেইদিনই দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে, একাযোগে পুষ্কর পৌঁছিলাম। পুষ্কর-হ্রদের জলে প্রজাপতি ব্রহ্মা অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপিত করিয়াছিলেন, সেই জন্য ইহা হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান হইয়াছে। যাত্রিগণকে হ্রদের জলে স্নান করিয়া, পিতৃপুরুষের তর্পণাদি করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, হনুমান ও সাবিত্রী, এই পাঁচটী মোক্ষদেবতাও দর্শন করা চাই।

আজমীরে আগ্রাগেট হইতে বহির্গত হইয়া, আমাদিগকে পুষ্করের পথ ধরিতে হইল। গেটের বাহিরেই অনতিদূরে "অনাসাগর" নামক সুন্দর বিস্তৃত হ্রদ। পর্ব্বতনিম্নে উপত্যকাবা... এই হ্রদ যে অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, ...হার তুলনা নাই। শ্যামলপ্রান্তরবক্ষে ইহার স্বচ্ছ ও নির্ম্মল-বারি যেন পদ্মপত্রাবস্থিত সলিলবৎ টলমল করিতেছে।

প্রায় চারি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, আমাদিগকে একটী অত্যুচ্চ পাহাড় উত্তীর্ণ হইতে হইল। গাড়ীর উপর বসিয়া কেমনে যে এই গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিব, তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া আমার বড় কৌতুহল জন্মিতেছিল। জয়পুরে, অম্বরপথে আমাকে

যে ক্ষুদ্র চড়াই পার হইতে হইয়াছিল, ইহার তুলনায় তাহা অতি ক্ষুদ্র। প্রস্তরস্তূপময় এই পাহাড়ের পাষাণ-হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, রাস্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলাম। রাস্তা কখন পর্ব্বতের পার্শ্ব বহিয়া গিয়াছে, কখনও বা বক্ষঃ ভেদ করিয়া চলিয়াছে। আমাদের গাড়ী কখনও ভিতরে ঢুকিয়া লুকোচুরি খেলিতে লাগিল, কখনও বাহির হইয়া পর্ব্বতাকে চিত্রিত হইল। উভয় পার্শ্বে অদ্ভুতকৌশলে স্তূপাকার প্রস্তরগুলি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাস্তা বেশ ঢালু, কিন্তু তথাপি এই উচ্চপথারোহণ-ব্যাপারটা নীচু হইতে কেমন অসম্ভব অসম্ভব বোধ হইতে-ছিল। আমাদের অগ্রগামী গাড়ীগুলি এক একবার এক একটী মোড় অতিক্রমপূর্ব্বক প্রায় আমাদের মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল, আমরাও মুহূর্ত্ত পরেই তথায় উপনীত হইতে লাগি-লাম। তখন আনন্দে ও বিস্ময়ে বড়ই আমোদ বোধ হইল। ক্রমাগত উপরে উঠিতে উঠিতে অশ্ব বড় নিস্তেজ হইয়া গিয়া-ছিল; শকটচালক নামিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। একজন পাণ্ডা আজমীর হইতেই আমার সঙ্গ লইয়া-ছিল, (পাঠকের নিকট ইহা কিছুই বিস্ময়কর মনে হইবে না) সেও হাঁটিয়া চলিল। যখন আমরা এইরূপে পর্ব্বতচূড়ে আরোহণ করি-লাম, তখন দিনমণির কিরণ-জালে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছে। তাহাতে, মরি! মরি!—কি দৃশ্যই প্রকটিত হইল। বহুদূরদূরান্তর পর্য্যন্ত চক্ষু চাহিয়া দেখিলাম—কেবল উচ্চনীচ শ্যামলধরিত্রী-বক্ষে অনন্তসৌন্দর্য্যরাশি! যতদূর চক্ষু যায়, কেবলই গিরিশৃঙ্গ-মালা—কোথাও সবুজ, কোথাও নীল, কোথাও অতি নীল,

কোথাও বা ধূসরবর্ণ শোভা ধারণ করিয়া আছে। নীচে, সম্মুখে ছোট ছোট টিলাগুলি সাগরবক্ষে তরঙ্গমালার ন্যায় স্ফীত হইয়া রহিয়াছে। তারপর, আমাদের গাড়ী নামিতে লাগিল। টিলাগুলি এবং বৃক্ষাদিও ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করিতে লাগিল; আমার দৃষ্টির প্রসারণও খর্ব্ব হইয়া আসিল। স্থানে স্থানে প্রস্তররাশি উপর হইতে আমাদের পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; গাড়ী একটু এদিক ওদিক হইবার যো নাই,—নড়িতেই বোধ হইতেছিল, বুঝি দারুণ সংঘর্ষে চুরমার হইয়া গেল, অথবা স্থানচ্যুত হইয়া উপত্যকামূলে গড়াইয়া পড়িল। পাহাড়ের স্বভাবনির্ম্মিত প্রস্তরগহ্বরগুলি বেশ মনোরম,—আবাসস্থানরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সূর্য্যতাপে বা ঝড়বৃষ্টিতে কোনই আশঙ্কা নাই। দেখিতে দেখিতে নীচে নামিয়া আসিলাম।

নামিয়া আরও প্রায় দুইমাইলপথ অতিক্রম করিতে হইল। প্রতিমুহূর্ত্তে মনে হইতেছিল, এই বুঝি পুষ্করের প্রিয়-ছবি এখনি নয়নসমক্ষে চিত্রিত হইবে; উন্নত শৈলশৃঙ্খলমূলে বুঝি একটা নীলশোভাময়ী সরসীবক্ষ অচিরাৎ ফুটিয়া উঠিবে। কিন্তু স্থানটী এমনি লুকোচুরি খাইয়া আছে যে, নিকটে যাইয়াও আমি সহসা কিছু ধরিতে পারিলাম না।

পুষ্করের চতুর্দ্দিকের শোভা আরও মনোরম। যতদূর চক্ষু যায়, কেবল পর্ব্বতশিখর মাত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই সকল পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত উপত্যকাভূমি প্রকৃতিরাণীর সৌন্দর্য্য-বিস্তারে এক অনৈসর্গিক শোভা ধারণ করিয়াছে। মাঝে মাঝে স্বচ্ছবারিপরিপূরিত সরোবরের নীলবক্ষে অসংখ্য পর্ব্বতচূড়ার কালছায়া অঙ্কিত হইয়াছে। মানবের কোলাহলপরিশূন্য ও

হিংসাদ্বেষবর্জ্জিত এই স্থান তপশ্চারণরত ঋষিগণের তপোবন-তুল্য শান্তিময়; যেন জগতের পাপতাপ ইহার নীরব নিঝুম অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না, যেন সংসারের কর্ত্তব্যভ্রষ্ট জীবকুলকে পবিত্রতা শিক্ষা দিবার জন্যই কোন স্বর্গীয় সুধাময়চিত্রের একটু-মাত্র টুক্‌রা নমুনাস্বরূপ এইখানে রক্ষিত হইয়াছে। আমার বোধ হইল, বুঝি এইখানে আসিলে, মানব সত্য সত্যই মায়ার বন্ধন ভুলিয়া যাইবে।

পুষ্করে পৌঁছিয়া কিন্তু আমার যাহা কিছু আশাভরসা ছিল, সব এককালে নিভিয়া গেল। কোথায় বা সেই চারু হ্রদ, কোথায় বা পর্ব্বতশোভা, কোথায় বা আমার কল্পনার মধুময়-চিত্র! যাহা দেখিলাম, সকলই সেই তীর্থস্থানের একঘেয়ে 'হা হা' 'খা খা' ভাব, আর ক্রমাগত ইষ্টক ও প্রস্তরস্তূপরাশি। ধূলিমণ্ডিত রাস্তা, আহার্য্যদ্রব্য ও পুষ্পপত্রাদিপরিপূর্ণ দোকানশ্রেণী, আর এখানে সেখানে যাত্রিক ও পাণ্ডার পাল;—সবই ত সেই। হ্রদও বুঝি 'হ্রদ' নামের উপযুক্ত নয়—ক্ষুদ্র,স্বল্পবারিপূর্ণ,শুষ্কপ্রায়। চারি-ধারে কেবল দালান, কোঠা ও দেবালয়, আর ভগ্ন স্তূপরাশি। ঘাটে ঘাটে সোপানাবলি বিস্তৃত আছে—কিন্তু অধিকাংশই ভগ্ন। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইটুকু জলেই বড় বড় কুম্ভীর বাস করে। বহুসংখ্যক যাত্রিগণ নির্ভয়ে স্নান করিতেছে, অথচ সচরাচর কাহাকেও আক্রমণ করে না। আমি স্নান করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে দেখিতে পাই নাই—দেখিলে হয়ত ততটা নির্ভয়ে জলে নামিতে সাহস হইত না; কার্য্যাদি সমাপন পূর্ব্বক যখন আমরা তীর বহিয়া দেবদর্শনে চলিলাম,তখন পাণ্ডা-ঠাকুর আমাকে ঐ সকল হিংস্র জীবের অস্তিত্ব দেখাইয়া দিলেন।

এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ মৎস্যও জলে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। যাত্রিগণ কিছু খাবার ফেলিয়া দিলেই, 'চর চর' করিয়া লাফাইয়া উঠে ; তখন বড়ই আমোদ বোধ হয়।

ব্রহ্মার যজ্ঞ-ভূমি বলিয়া, ব্রহ্মার মন্দিরই এইস্থানে সর্ব্বপ্রধান। একটী উচ্চবেদীর উপর এই প্রাচীরবেষ্টিত মন্দির স্থাপিত। সিঁড়ি বহিয়া সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে হইল। ফটকের উপর বহুসংখ্যক হংসমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে ; মন্দিরের ভিতরে চতুর্ম্মুখ প্রজাপতি উচ্চাসনে উপবিষ্ট—তাঁহার দুই পার্শ্বে তদীয় চারিপুত্রের প্রতিমূর্ত্তিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দেবালয়ের সম্মুখের গোলাকৃতি ছাদে অনেক সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য দৃষ্ট হয়। ইহার সম্মুখেই দুই পাশে দুইটী শ্বেতপ্রস্তরের হস্তিমূর্ত্তি।

এখান হইতে আমরা বিষ্ণুমন্দির ও শিবমন্দির দর্শনে যাত্রা করিলাম। বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণুর বরাহরূপ রক্ষিত হইয়াছে মহাদেবের ঘরটী মৃত্তিকাগর্ভস্থিত ও ভয়ানক অন্ধকারাচ্ছন্ন। একটী সঙ্কীর্ণপথে প্রদীপহস্তে এইস্থানে উপস্থিত হইতে হয়। সিদ্ধিদাতা গণেশেরও একটী মূর্ত্তি এস্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তারপর, আমি অন্য একটী মন্দিরে হনুমানজীর দর্শনলাভ করিয়া, পুষ্করের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। সাবিত্রীদেবীর মন্দির দেড়ক্রোশ দূরে পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। এতাধিক পরিশ্রমের পর হাঁটিয়া এই সুদূর বন্ধুরপথ অতিক্রম করিবার সামর্থ্য হইল না—কাজেই সাবিত্রীদর্শনাশা পরিত্যাগ করিতে হইল। পাণ্ডামহাশয়ের সঙ্গে প্রথমাবস্থায় কিঞ্চিৎ বাগ্‌যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল ; কিন্তু পরে তিনি বেশ হাসিমুখে ও সন্তুষ্টচিত্তেই বিদায় দিলেন। অপরাহ্নে আজমীর পৌঁছিলাম।

সেইদিনই রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় চিতোরাভিমুখে রওয়ানা হওয়া গেল।

চিতোর।

রাত্রিশেষে সাড়ে চারি ঘটিকার সময় চিতোরগড় ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। ভয়ঙ্কর শীত—একটা সুয়েটারের উপর আলষ্টার পরিয়াছি, তথাপি 'হি হি' করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। তখনও অন্ধকার আছে; চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কেবল মধ্যে মধ্যে নৈশান্ধকারে রেল-ওয়ের দু' একটা লেম্প মিটি মিটি জ্বলিতেছে, আর দূরে কোন অজ্ঞানিতস্থলে জম্বুক-রব ধ্বনিত হইতেছে। দু' একটা কুকুরও দু'একবার 'খেউ খেউ' রবে সাড়া দিয়া আবার চুপ করিয়া যাই-তেছে। আমি কি করিব, কোথায় যাইব, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া 'এদিক, ওদিক' করিতে লাগিলাম।

সঙ্গে অন্য জিনিসপত্র ছিল না—সকলই আজমীরে রাখিয়া আসিয়াছি, এই যা কি সুবিধা। ওভারব্রিজ পার হইয়া অন্য প্লাটফরমে ঢুকিবার সময় একজন তদ্দেশীয় টিকিট-কালেক্টারকে ইংরেজীতে সম্বোধন করিলাম, "মহাশয়, বলিতে পারেন, এখানে কোথায় সরাই আছে?" তিনি টিকিট লইতে লইতে মাত্র কহি-লেন "সহরে ঢুকুন—সন্ধান পাইবেন।"

এখন কালেক্টরপ্রবরের মোটা বুদ্ধিতে এইটুকু যোগাইল না যে, যদি সহরই চিনিয়া লইতে পারিব, তবে আর সরাইয়ের দুঃখু ছিল কি? সে জন্য তাহার শরণাপন্ন হইতে যাইব কেন? যাহা

হউক রেল আফিসের কর্ম্মচারী, কাজের লোক ত বটে? যা' বলিয়াছেন, তাই ঢের—আমি দ্বিতীয় লোকের তল্লাসে প্রস্থান করিলাম।

দ্বিতীয় প্লাটফরমে, গমনোন্মুখ উদয়পুরের গাড়ী বুক ফুলাইয়া 'ফুস্ ফুস্' করিতেছে। এই গাড়ী দিনের ভিতর একবার মাত্র উদয়পুর-চিতোরে যাতায়াত করে; সুতরাং দুদিন না থাকিলে পর্য্যাটকদিগের উদয়পুরদর্শনসৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে না। আমার দুর্ভাগ্য; সময়ের অভাবে আমাকে সে স্থান পরিভ্রমণের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া লোকের ছুটাছুটি ভাব দেখিতে লাগিলাম। আমার আশেপাশে বহুলোক আসিতেছে,যাইতেছে; কিন্তু কেহই আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করিতেছে না; যদিবা করিতেছে, হয়ত একটু অবাক্‌দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়াই পরক্ষণে প্রস্থান করিতেছে। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুঝিতে পারিতেছে না, অথবা ব্যস্ততাপ্রযুক্ত উত্তর দিবার অবসর নাই—তাড়াতাড়ি 'হু হু' করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এই অপরিচিত মুখগুলি আমার নিকট কেমন যেন স্নেহসহানুভূতিপরিবর্জ্জিত শুষ্ক শুষ্ক বলিয়া বোধ হইতেছিল। যাহা হউক, শেষকালে অতিকষ্টে এপর্য্যন্ত সার উদ্ধার করিতে পারিলাম যে—সহর দূর বটে, অন্যূন দুই মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে। এখন, এই নিশাশেষে তমসাবৃত দীর্ঘপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্তও নহে, সম্ভবপরও নহে। অগত্যা বাহির হইয়া মোসাফিরখানারই মুক্তমেজেতে পড়িয়া কোনরূপে বাকি রাত্রিটুকু কাটাইয়া দেওয়া গেল। এই বিজন প্রান্তরস্থিত শূন্য

ষ্টেসনগৃহে একা একা শীতার্ত্ত পথিকের রাত্রিযাপন কিপ্রকার সুখকর ব্যাপার, পাঠককে আর তাহার বিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না। তবে মনে একটা দুর্দ্দমনীয় উৎসাহ ছিল; তাহার প্রকোপে যতটা সম্ভব কষ্টটাকে ম্লান করিয়া দিয়াছিলাম। তাই, কোনরূপে রাত্রিটুকু ভোর হইয়া গেল।

রজনী পোহাইল। ক্রমে ক্রমে চারিদিক হইতে আঁধারের যবনিকাটুকু অপসারিত হইয়া গেল। তখন পূর্ব্বদিকে, উষার নবীনকিরণবক্ষে, ভগ্নদুর্গকিরীটিনী চিতোরগড়ের গগনস্পর্শিনী প্রতিমাখানি ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিল। আমি চাহিয়া চাহিয়া, চাহিয়া এই চির ঈপ্সিত, চিরবাঞ্ছিত ছবি হৃদয় ভরিয়া দেখিতে লাগিলাম; মন্দিরের ও স্তম্ভের শিখরমালাগুলি দুর্গপ্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, আলোকচ্ছটায় কোন মহিমময়ী রাজ্ঞীর মুকুটের মণিময়চূড়াবৎ জ্বলিতেছিল; সে দৃশ্য কৌতূহল-পরবশ অধীরনেত্র পরিব্রাজকের নিকট, কি কল্পনাময় আবরণ বিস্তার করিয়া দেয়, তাহা কে বুঝিবে!

পর্ব্বত ও ষ্টেসনের মাঝখানে একটী প্রান্তর; তৎপরেই দুর্গ-দ্বার। পর্ব্বতবক্ষচিহ্নিত দৃঢ়প্রাচীরবদ্ধ দীর্ঘসিঁড়ি এখান হইতে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। আমার বোধ হইল, যেন জোর অর্দ্ধমাইলের পথ হইবে; ষ্টেসনের নিকটেই, একটী মেটে-ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া, একটী বৃদ্ধ লুচি ভাজিতেছিল; সে কহিল—তিন মাইল হইবে। সম্মুখে পাহাড় থাকিলে মধ্যে মধ্যে এরূপ দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে বটে;—আমি সোজা পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম।

দেখিলাম, ময়রার কথা ঠিক। দুই মাইল অতিক্রম করিয়া

আসিয়া, আমি একটী ক্ষুদ্রস্রোতস্বতীতটে উপস্থিত হইলাম। স্রোতস্বতী ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহা উত্তীর্ণ হওয়া তেমন সহজ ব্যাপার নহে। এমন নদীও আর দেখি নাই; নদীতীর, নদী-তল সর্ব্বত্র প্রস্তরময়—মাটির সংস্রবমাত্র কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাহাতে আবার একরূপ জলশূন্য। উচ্চনীচ তরঙ্গায়িত প্রস্তর-বক্ষের স্থানে স্থানে জলরাশি সঞ্চিত হইয়াছে; যেন বৃষ্টিতে জলা-বদ্ধ হইয়াছে। মাঝে মাঝে উন্নত, পিচ্ছিল ও কোণবিশিষ্ট শ্বেত ও ধূসরবর্ণের প্রস্তরস্তূপগুলি, মস্তক উত্তোলন করিয়া উকিঝুকি মারিতেছে; কিন্তু একটী সরিৎপ্রবাহে সবগুলি জলপূর্ণগর্ত্তই সংযুক্ত—সবগুলিতেই স্রোত খেলিতেছে। চারুমর্ম্মরবক্ষে স্বচ্ছ-বারির এই ক্ষীণস্রোত টলমল করিয়া প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু ভালরূপ দৃষ্টিসঞ্চালিত না করিলে, বিশেষ প্রত্যক্ষীভূত হই-তেছে না।

এই ক্ষুদ্র গিরিতটিনী উত্তীর্ণ হইতে যাইয়া, আমাকে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইল। প্রস্তরস্তূপের মস্তকে মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া লাফাইয়া যাইবার সময়, পা পিছলাইয়া যাইতেছিল এবং প্রস্তরখণ্ডে সংঘর্ষিত হইয়া বিষম লাগিতেছিল। শত্রুপক্ষ হইতে চিতোররক্ষা পক্ষে এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীও যে একদিন প্রচুর সহায়তা করিত, তাহা যেন আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলাম। সমস্তটা পশ্চিমসীমা, এই দুরতিক্রমনীয়া নদীবেষ্টনে উত্তম সুর-ক্ষিত। উত্তরে কিয়দ্দূরে একটী সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার জীর্ণশীর্ণ কলেবর দূর হইতে কিছু কিছু দেখিতে পাইলাম।

যাহা হউক, কষ্টে সৃষ্টে কোনরূপে বৈতরণী অতিক্রম করি-

লায়। পার হইয়াই, সম্মুখে লোকালয়—কতকগুলি ভগ্নাট্টালিকাস্তূপ মেটেঘরের সমষ্টির ভিতর বিরাজ করিতেছে। এমন বিশ্রী সহরও গরীব লোকের বসতি বুঝি দুনিয়ায় এই নূতন! শৌর্য্যবীর্য্যৈশ্বর্য্যশালী মিবার-রাজধানীর এই আশ্চর্য্য আকাশ পাতাল পরিবর্ত্তনদৃশ্য দূরদেশাগত পথিকের নয়নসমক্ষে বড় সুখকরচিত্র নহে। লোকগুলি কৃষ্ণকায়, অশিক্ষিত ও শ্রমজীবী; অধিকাংশই অর্দ্ধভগ্ন প্রস্তরালয়ে বা মেটেঘরে বাস করিয়া থাকে। আমাকে দেখিয়া তাহারা কেমন এক অবাক্‌দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। দূরবঙ্গদেশাগত অদ্ভুতসাজসজ্জাভূষিত উন্মুক্তমস্তক 'বাবু' নামক পদার্থটা বোধ হয় তাহাদের মোটা সোটা অভিজ্ঞতার রাজ্যে বড়ই নূতন! আমিও যে তাহাদিগকে দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই, এমত নহে; তাহাদের আচার ব্যবহার ও চালচলতিগুলি আমার নিকট কতক পরিমাণে বিশেষ বোধ হইতেছিল। এতদ্ব্যতীত তাহাদের কথাগুলি যদি একবর্ণও আমার বোধগম্য হইত! মেয়ে লোকগুলি জুতা পায় দিয়া কলসীকক্ষে জল আনিতে যাইতেছে; পুরুষগুলি নগ্নপদে পাচনহস্তে গরুমহিষ লইয়া বাহির হইতেছে; কেহ কেহ বা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া উত্তাপ গ্রহণ করিতে করিতে গল্প করিতেছে. মুদীরা সামান্য সামান্য পণ্যদ্রব্য সাজাইয়া গুছাইয়া, দোকান খুলিয়া বসিয়াছে; আমি এই সকল দেখিতে দেখিতে বহু ভগ্নমন্দির, দেবালয় ও প্রাচীরাদি অতিক্রমপূর্ব্বক দুর্গমূলে উপস্থিত হইলাম. গেটের পার্শ্বেই একটী পুরাতনমসজিদাকার ভবনে একটা ক্ষুদ্র দপ্তরগৃহ; একজন অর্দ্ধশিক্ষিত লোক—অবশ্য তাহার নিজের হিসাবে নহে—

তথায় বসিয়া দুর্গপ্রবেশার্থীগণকে 'পাস' বিতরণ করিতেছিল; আমি সেখান হইতে তাহার আঁকা বাঁকা উর্দ্দুলেখাবিশিষ্ট একখানা গ্রহণপূর্ব্বক দুর্গপ্রবেশ করিলাম।

প্রায় ৫০০ পাঁচশত ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর, সাড়ে তিন মাইল দীর্ঘ, অর্দ্ধমাইল প্রস্থ, বিশাল চিতোরদুর্গ অবস্থিত। সুদীর্ঘ ১২১১৩ গজব্যাপী দুর্ভেদ্য প্রাচীর আজও কালের কঠোরাঘাতে ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া যায় নাই। দুর্গপথ সাতটি বজ্রতুল্য কঠিন সুদৃঢ়ফটকে উত্তম সুরক্ষিত; তাহাদের নাম ক্রমে,—পটল পোল, ভৈরব পোল, হনুমান পোল, গণেশ পোল, জরলা পোল, লক্ষ্মণ পোল ও রাম পোল। রামপোলের প্রাচীন কারুকার্য্যগুলি এখনও কিয়দংশ প্রাচীরগাত্রে মুদ্রিত রহিয়াছে।

প্রথম ফটক উত্তীর্ণ হইতেই একদল শান্ত্রীপ্রহরীর নিকট 'পাস' খানা প্রত্যর্পণ করিতে হইল। দুর্গটী এখনও রাণা উদয়পুরাধিপতির তত্ত্বাবধানেই রক্ষিত হইতেছে। ফটকের বাহিরে ও এই রাস্তার উভয়পার্শ্বে মহারাণা কতকগুলি সৈন্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং দুর্গস্থ জীর্ণশীর্ণ ইমারতগুলি কিছু কিছু মেরামত করিয়া দিয়াছেন। ঢালুপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রায় একমাইল পথ অতিক্রমপূর্ব্বক সর্ব্বশেষফটকের নিকট উপনীত হইয়াছে। অগ্রসর হইতে হইতে, সড়কের দুইধারে অনেক পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইলাম। কিন্তু দুর্গদ্বার অতিক্রম করিলে যে শ্মশানপট আমার নয়নসম্মুখে পতিত হইল, তাহার নিকট এ দৃশ্য কত তুচ্ছ, সে কথা আমি পাঠকের নিকট কোন্ ভাষায় বর্ণনা করিব? স্তূপের পর ভগ্নস্তূপরাশি দুর্গের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, যে মহা-

শ্মশানের বিকটছবি প্রকটিত করিয়াছে, আমার আবেগস্রোত সংযত করিয়া তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি—এমন ভাষা কোথায় ?

হায়, এই কি চিতোর? বীরত্বের চিরবাসস্থল, মহিমার অতলস্পর্শ আকর, সতীত্বের লীলাভূমি, রাজপুতনার চিরগৌরব-মুকুট, এই কি চিতোর? অযুতবীরকণ্ঠধ্বনিত, সহস্র সহস্র বর্ষা-তরবারিশিঞ্জিত, প্রাসাদোপবনসরোবরাদিচিত্রিত, এই কি চিতোর? পর্ব্বতবক্ষোদ্গত প্রস্রবণের মন্দ্রধ্বনিতে চিরমুখরিত, বামাগণের কলহাস্যে চিরপ্রফুল্লিত,—যেখানে দুন্দুভির বিজয়নাদে সতত রক্তস্রোত খরপ্রবাহিত হইত, যেখানে বীরত্বের সশব্দ পদক্ষেপে ভীরুতা, কাপুরুষতা দূরে পলায়ন করিত, এই কি সেই চিতোর? যেখানে প্রবঞ্চনা স্থান পাইত না, স্বদেশের সর্ব্বনাশ স্বদেশী করিত না, বিশ্বাসের অমর্য্যাদা ছিল না,—কেবল স্বদেশ-হিতৈষণার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত চিরস্ফুরিত হইত, সেই চিতোর এই? দুর্ভাগ্য চিতোর, তোমার কি দুর্দ্দশাই হইয়াছে! বিজয়ী আলা-উদ্দীন, বাহাদুর সা কিম্বা আকবরের প্রচণ্ডআক্রমণেও তোমার যত না অনিষ্ট হইয়াছিল, এক কালের নিঃশব্দাঘাতেই ততোধিক সংঘটিত হইয়াছে। একদিন তুমি অপরাজিত, অনবনতমস্তক বলিয়া জগতের সম্মুখে অহঙ্কার করিতে; এক সময়ে তোমার ন্যায় দুর্ভেদ্যদুর্গ বুঝি ভারতে আর দ্বিতীয় দৃষ্টিগোচর হইত না, কত কামানের গোলাগুলি, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা রব তোমার ওই বজ্রকঠিন-প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া পদমূলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তখন গর্ব্ব-স্ফীত হৃদয়ে এসকল তুমি কতই না উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করিয়াছ! কিন্তু আজ?—হায়, আজ তোমার এ অবস্থা কেন?

দেখিয়া শুনিয়া চক্ষে জল আসিতেছিল। ভাবিয়া দেখিলাম, সকলেরই ত এই অবস্থা! কালের এই দুর্দ্দমনীয় প্রতাপ, এই বিশ্ববিজয়িনী শক্তির পরিচয় ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নূতন নহে। পদে পদে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জগতে ত এই বিষয়ই অবগত হইয়া থাকি। তবে আজ ব্যথাটা এত নূতন করিয়া অনুভব করিলাম কেন? শিক্ষাটা কি আমার আজ হইল?

তাহা নহে। কথাটা এই, শ্রবণে ও দর্শনে একটু পার্থক্য আছে। শ্রবণ করিয়া যে জ্ঞান জন্মে, তাহা কতকটা নিষ্প্রভ, ও জড়পদার্থবৎ; আমাদের মানসিক গতিবিধির উপর তাহার ততটা আধিপত্য নাই; কিন্তু আমরা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া যে জ্ঞান উপার্জ্জন করি, তাহা দৃঢ় ও কতকটা সজীব; তাহার ক্ষমতা আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলির উপর বিশেষ প্রবল। তাই আজ ইতিহাসপরিচিত চিরশ্রুতচিতোরের এই ভগ্নদৃশ্য হৃদয় এত বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল।

এর ভিতর আরও একটা কথা আছে। যদি কালস্রোতে এই পুণ্যভূমির চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান না থাকিত, তবে বোধ হয় এতটা কষ্টানুভব হইত না। স্বভাবের নিয়মই এই। বস্তুর আস্বাদ না পাইলে তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মে না। চিতোর দেখিয়া আমি চিতোরের প্রাচীনসমৃদ্ধির কিছু কিছু আস্বাদ পাইয়াছিলাম, তাই আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। চিতোরের সেই গর্ব্বোন্নত মস্তক আজিও আকাশ স্পর্শ করিতেছে; সুদৃঢ় প্রাচীরমালা আজিও তেমনি দণ্ডায়মান; হ্রদবারিসুশোভিত স্তম্ভমালা সজ্জিত তরঙ্গায়িত বক্ষ আজিও জগতে সেইরূপই অতুলনীয়। চতুর্দ্দিকে মুক্তপ্রান্তর, তৎপশ্চাতে বহুদূরবিস্তৃত অনন্ত-

শোভাময়ী শৈলশিখরশ্রেণী, দেখিলে কাহার নয়নমন না পরিতৃপ্ত হয়? দুর্গপ্রাচীরমধ্যে এখনও কত কত সুদৃশ্য মন্দির ও অপূর্ব্বশিল্পখচিত গৃহাদি বিদ্যমান আছে, কে তাহার গণনা করে? কত দীঘি, কত পুষ্করিণী, কত ঝরণা, কত প্রস্রবণ পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহার হিসাব রাখে? কিন্তু সবই শূন্য, সকলই অসম্পূর্ণ; সমস্তটা পুরীর উপরেই যেন কি এক বিষাদময়ভাব ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; সকল সৌন্দর্য্য, সকল পুরাতনকাহিনীর উপরেই যেন কি একটা শ্মশানের ছায়া পতিত হইয়াছে। চারিদিকেই অভাবের একটা দারুণ তৃষা। যেদিকে চাও, কেবল এক ঘোরতমসাময় আবরণ ও অসম্পূর্ণ-ভাব সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে। অট্টালিকার স্তূপ পতিত আছে, কিন্তু তাহাদের সেই সাজসজ্জা ও মনোহারিণী শোভা নাই; বিস্তৃতপুরী আছে, কিন্তু সে রাস্তাঘাট বা শৃঙ্খলা নাই; কানন আছে, সে শ্যামলশোভা নাই—পুষ্প নাই; সরোবর আছে, ঘাট নাই, কোথাও বা জলও নাই; উর্ব্বরা ক্ষেত্র আছে, কিন্তু সে সুজলা সুফলা ভাব কৈ—শস্যরাশি কৈ? নাই, কিছুই নাই; সব অসম্পূর্ণ, সব শূন্য, সব শ্মশান,—চিতোর! চিতোর!! চিতোর!!! সব শ্মশান!

কখন্ কোন্ মহাপুরুষ চিতোরদুর্গ গঠিত করিয়া গিয়াছেন, সে তত্ত্ব আজিও ভালরূপ স্থিরীকৃত হয় নাই। মোটের উপর চিতোর যে একটী অতি প্রাচীন জনপদ, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ৭২৮ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয় বাপ্পারাও সর্ব্বপ্রথম এইস্থানে মিবার-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং সেকাল হইতেই চিতোরের ইতি-বৃত্ত একরূপ আরম্ভ হইয়াছে, বলিতে হইবে। মুসলমান রাজত্ব-

কালে, ইহার অদ্ভুত আত্মরক্ষা এবং মধ্যে মধ্যে ভাগ্যলক্ষ্মীপরিবর্ত্তনের কথা, এস্থলে কিছুই বর্ণিত হইবে না। সে গৌরবময় উজ্জ্বলকাহিনী ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা কে না অবগত আছেন! পাঠকপাঠিকা এজন্য ইতিহাসের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

পুরাকালে সমগ্র চিতোরনগরী এই দুর্গপ্রাচীরমধ্যে অবরুদ্ধ ছিল। বহুতর সুদৃশ্য সরোবর ও শস্যক্ষেত্রাদি নগরের শোভা বর্দ্ধন করিত। তাহাদের কতক কতক এখনও ভিতরে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইত বলিয়াই,বহুবৎসরব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের সময়েও অবরোধাবস্থায় দুর্গবাসিগণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন।

আমি যে পথে দুর্গারোহণ করিলাম, তদ্ব্যতীত উত্তর ও পূর্ব্বদিকে গিরি-আরোহণের আরও দুইটী স্বতন্ত্র পথ আছে। তাহাদের একটির নাম লাকোলা পোল ও দ্বিতীয়টীর নাম সুরজপোল। নিম্নস্থ ক্ষুদ্রসহরের বিপরীতপার্শ্বাবস্থিত বলিয়া, এবং আরোহণের কষ্টাধিক্যপ্রযুক্ত, তাহারা আজকাল একরূপ দুর্গম ও অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে।

দুর্গপ্রবেশ করিয়া, প্রথমেই আমরা কতকগুলি ছোট ছোট মেটেপ্রাচীরবিশিষ্ট কুঁড়েঘর দেখিতে পাইলাম। এখানেও কতকগুলি দরিদ্রব্যক্তি বাস করিয়া থাকে। তাহাদের ভিতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও দৃষ্ট হয়। আমি ইহাদেরই একজন ব্রাহ্মণকে গাইডরূপে নিযুক্ত করিলাম। রাজপুতনার চারণদিগের কথা সম্ভবতঃ অনেকেই অবগত আছেন। যদিও আমার ভাগ্যে তাহাদিগের দর্শনসৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই, তথাপি এই অশিক্ষিত ব্রাহ্মণটী

অনেকটা সে অভাব পূরণ করিল। সে অনেক পুরাকাহিনীর আবৃত্তি করিতে জানিত। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাহার ভাষা অতি দুর্বোধ্য—আমি কষ্টেসৃষ্টে কোনওরূপে সারোদ্ধার করিতে পারিয়াছিলাম।

এখান হইতে আরও কিছু ঊর্দ্ধে উঠিয়া,আমরা ভগ্নঅট্টালিকা-রাশির ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নানা বিচিত্র বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরখণ্ডগুলি চারিদিকে ধূলি-লুণ্ঠিত হইতেছে—যেন শ্মশানে অস্থিখণ্ডগুলি শৃগালমুখস্পৃষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। যে সকল গৃহ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহারা মাত্র অর্দ্ধদেহসম্পন্ন—বাহিরে লতাপাতাচিত্রাদি খোদিত আছে; ভিতরের দেওয়ালগুলিও চমৎকার চিত্রিত! আমরা রাণাকুম্ভের স্তূপীকৃতালয়, মীরাবাই-মন্দির ও তন্মধ্যস্থ ছোট পিত্তলমূর্ত্তি, জয়মল্ল-পুত্ত প্রাসাদ, রাণীদিগের স্নানকুণ্ড, সতীদাহকুণ্ড, জয়স্তম্ভ, কীর্ত্তি-স্তম্ভ, পদ্মিনী-মহাল, নীলকণ্ঠশিবের মন্দির, মাই-কা-মন্দির অদ্ভুতজীর মন্দির, ভীম-হ্রদ প্রভৃতি অনেকানেক প্রাচীনস্থল দর্শন করিলাম।

জয়মল্ল ও পুত্তের প্রাসাদে, তাঁহাদের শিলামূর্ত্তিদ্বয় স্থাপিত হইয়াছে। চিতোরবাসিগণ এই মূর্ত্তিদ্বয়কে দেবতা ভাবিয়া পূজা করে। এই অট্টালিকার বহির্দৃশ্য অতি চমৎকার; দুইটী বর্ত্তুলাকার চূড়া গম্বুজাকারে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, বহুদূর হইতে মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভিতরের ঘরগুলি তেমন বিশেষ বিস্তৃত নহে। মিবার-বীরগণ কিরূপ আড়ম্বর-শূন্য জীবন যাপন করিতেন, এই মন্দিরই তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

চিতোরে আজ কাল যাহা কিছু দর্শনীয়বস্তু আছে, তন্মধ্যে

জয়স্তম্ভ ও কীর্ত্তিস্তম্ভই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কীর্ত্তিস্তম্ভের ন্যায় প্রাচীন কীর্ত্তি চিতোরে আর নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার চতুর্দ্দিকেই বহুসংখ্যক জৈনপ্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহামতি টড্ সাহেব, অনেক পরিশ্রমের পর ইহারই একখণ্ড প্রস্তরলিপিতে, ৮৯৬ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছেন। ৭৫½ ফিট উচ্চ এই প্রাচীন স্তম্ভ সপ্ততলবিশিষ্ট, এবং আকারে জয়স্তম্ভ হইতে অনেক ছোট হইলেও, একটী উন্নত স্থানে স্থাপিত বলিয়া, উচ্চতায় তাহার প্রায় সমকক্ষ। দুর্গমধ্যে এতাধিক উন্নত স্থান আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্তম্ভের অগ্রভাগের ও মূলের ব্যাস ক্রমে ১৫ ও ৩০ ফিট হইবে।

কীর্ত্তিস্তম্ভ অপেক্ষা জয়স্তম্ভ আকারে অনেক বড়। ইহার অদ্ভুত শিল্পচাতুর্য্য ভারতের প্রাচীনস্থাপত্যোৎকর্ষের এক চরম আদর্শ। উৎকৃষ্ট ধবলপ্রস্তরের প্রাচীরগুলি, ভিতরে ও বাহিরে, অসংখ্য লতাপাতা ও দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তিতে সুমণ্ডিত—সূচ্যগ্রভাগ কোথায়ও শূন্য পড়িয়া নাই। ভিতরের সিঁড়িপথে ক্রমে ক্রমে ইহার নয়টী তলে আরোহণ করা যায়। সিঁড়ির দুই পাশে এবং প্রতিতলে, ভাস্করের চূড়ান্তকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। সর্ব্বোচ্চতলে আরোহণ করিয়া, আমরা কতকগুলি অস্পষ্ট ও আমার অবোধগম্যভাষাযুক্ত প্রস্তরফলক দেখিতে পাইলাম। বলা বাহুল্য, যোগ্যতার অভাবে সেগুলি পাঠ করিয়া, কৌতূহল চরিতার্থ করিতে সমর্থ হই নাই।

১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণা কুম্ভ, মালবাধিপতির ও গুজরাটভূপতির এক যুক্তসেনাবাহিনী পরাজিত করেন। এই বিজয়-

কাহিনী চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে, ১২২ ফিট উচ্চ এই মনোরম স্তম্ভ তৎকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ইহার চূড়ার ও গোড়ার পরিধি ক্রমান্বয়ে সত্তর ও একশত চল্লিশ ফিট।

পদ্মিনীকুণ্ডের তীরে—পদ্মিনীপ্রাসাদ। প্রাসাদতল হইতে একসারি সুন্দর সিঁড়ি গুপ্তভাবে নামিয়া, সরোবরে জলস্পর্শ করিতেছে। এইখানেই একদিন একটী স্বর্গীয় পারিজাত পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া, এক অপূর্ব্বসৌরভে দিল্লীর রঙ্গমহাল পর্য্যন্ত আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল। হায়! সে পুষ্প আজ কই? এই ক্ষুদ্রপুরীর প্রতি ধূলিরেণুকাতে আজ তাহার কিঞ্চিন্মাত্র সুবাসও কি মিলিত রহে নাই? সেই ভুবনমোহিনীর রূপের প্রভা এই-খানেইত একদিন চিরবিকীর্ণ হইত,—এইখানেই ত তাঁহার চরণযুগলের চারুছবি ধূলিরাশিতে অঙ্কিত ছিল। সে সব আজ কিছুই নাই কি? তাহার বিন্দুমাত্র চিহ্নও আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টিগোচর হয় না কি? হায়! হয় না কি?

পদ্মিনী প্রাসাদ পাঁচ মহলে বিভক্ত। ইহার প্রাচীন ইমারত-গুলি একরূপ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। মহারাণা জীর্ণশীর্ণ অট্টালিকাগুলি মেরামত করিয়া, সমস্তটা পুরীকে আবার নূতন করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। সুতরাং দেখিয়া তেমন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। সরোবরের ভিতরেও একটী নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

দুর্গের মধ্যে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। তন্মধ্যে মাই-কা-মন্দির নামক একটী উত্তম প্রাচীনদেবালয়ে শক্তিমূর্ত্তি স্থাপিত। এতদ্দেশীয়গণ এই মন্দিরকে অতিশয় ভক্তি ও ভয়ের চক্ষে দর্শন করিয়া থাকে। ইহার উন্নত চূড়া জয়স্তম্ভ, কীর্ত্তিস্তম্ভ ও জয়মল্ল-

পুত্তপ্রাসাদের মত ষ্টেসনের নিকট হইতে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

অদ্ভুতজীর মন্দিরে অদ্ভুতজীর প্রতিমূর্ত্তি বাস্তবিকই অদ্ভুত। এমন বিশাল ও ভীমাকৃতি প্রস্তরমূর্ত্তি অন্যত্র কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না! গোয়ালিয়রের খোদিতমূর্ত্তিগুলির সঙ্গে ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

দুর্গের একপার্শ্বে একটী বৃহৎ সুগভীর কুণ্ডের নিকটে, একটী ক্ষুদ্রপ্রস্রবণ অনবরত সলিলরাশি উদ্গীরণ করিতেছে। ইহার নাম গোমুখী। গোমুখাকৃতি প্রস্তরখণ্ড হইতে জলরাশি উদ্গত হইয়া, নিম্নস্থ শিবমূর্ত্তির উপর পতিত হইতেছে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, পর্ব্বতবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া অবিরত কেবল 'তর তর' শব্দে কোথা হইতে সলিলস্রোত ছুটিয়া আসিয়া শিলামূর্ত্তির উপর পড়িতেছে, আর প্রতিহত হইয়া অমনি চারিদিকে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেছে। সে দৃশ্য কেমন শান্তিময় ও গম্ভীরভাবব্যঞ্জক! পর্ব্বত-পৃষ্ঠ হইতে বহুনিম্নে নীলবারিপূর্ণ, সোপানাবলিবদ্ধ—কুণ্ড। কথিত আছে, অন্তঃপুরকামিনীগণ এই স্থানে আসিয়া প্রতিদিন অবগাহন করিতেন। মহাল হইতে তাঁহাদিগকে একটী ভূগর্ভস্থিতপথে এই স্থানে আসিতে হইত। সে পথ এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পথের মুখে রুদ্ধদ্বার এখনও দণ্ডায়মান আছে;—আমরা দেখিয়া লই-লাম। দুর্গমৃত্তিকানিম্নে এরূপ আরও কতকগুলি গুপ্তপুরী পূর্ব্ব-কালে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু তাহারাও এখন দুর্গম ও ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

দুর্গের উত্তরদিকে মহারাণার বর্ত্তমান তোপখানা। এখানে

অনেকগুলি কামান সারি সারি সজ্জিত আছে। ইহাদের ভিতর দুইটী অতি প্রকাণ্ড।

দুর্গদ্বারের নিকটে দ্বিতীয় একটী অদ্ভুত কুণ্ড দৃষ্ট হয়। ইহার চারিদিকের পাড়গুলি বড়ই উচ্চ। একদিকে পাহাড়গাত্র এই উচ্চপাড় হইতে সলিলোপরি ঝুলিয়া পড়িয়াছে; আর কোথা হইতে টপ্ টপ্ শব্দে মেঘবর্ষণপ্রায় শত শত সলিলবিন্দু তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাহিয়া সরোবরে পতিত হইতেছে। যেন দর্পণখণ্ডে কোন শ্বেতাঙ্গিনী রমণী, আপনার অদ্ভুতাকৃতিখানা অবনতমস্তকে দর্শন করিয়া, বিমর্ষচিত্তে কেবলই অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। পাহাড়ের উপরে বহু বাড়ীঘর দৃষ্ট হইতেছে; কোথা হইতে যে সলিলরাশি বহির্গত হইতেছে, তাহা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

চিতোরের দক্ষিণাংশ আজকাল বনজঙ্গলপরিপূর্ণ হইয়া, সাধারণের অগম্য হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সকলের পক্ষে সেস্থানদর্শন ঘটিয়া উঠে না। বিশেষতঃ, দেখিবার মত তথায় যে কিছু আছে, তাহারও কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। অল্পসময়ে অনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে তথায় ভ্রমণ করা বিড়ম্বনামাত্র বিবেচনা করিয়া, বেলা এগারটার সময় দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম।

খরতর মধ্যাহ্নকিরণে পিপাসায় প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া আসিতেছিল;—পথে ক্ষুদ্রতটিনীর স্বচ্ছবক্ষ হইতে অঞ্জলি পূরিয়া জলপানপূর্ব্বক অনন্ত তৃপ্তিলাভ করিলাম। যখন ষ্টেসনে পদার্পণ করিলাম, তখনও আজমীরের গাড়ী আসিতে কিছু বিলম্ব আছে। দেখিলাম, ময়রাবেটা আপনার মেটে কুটীরের

বারাণ্ডায় বসিয়া, একমনে আটার লুচি ভাজিতেছে; পরিশ্রমে ও বেলাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, উদর দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল,—আমি তাহার ধূলিময় মেজেতেই পা ছড়াইয়া বসিয়া, ভোজনকার্য্য সমাপিত করিলাম।